দত্তা

শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩-১-১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ··· কলিকাতা-৬

তিন টাকা

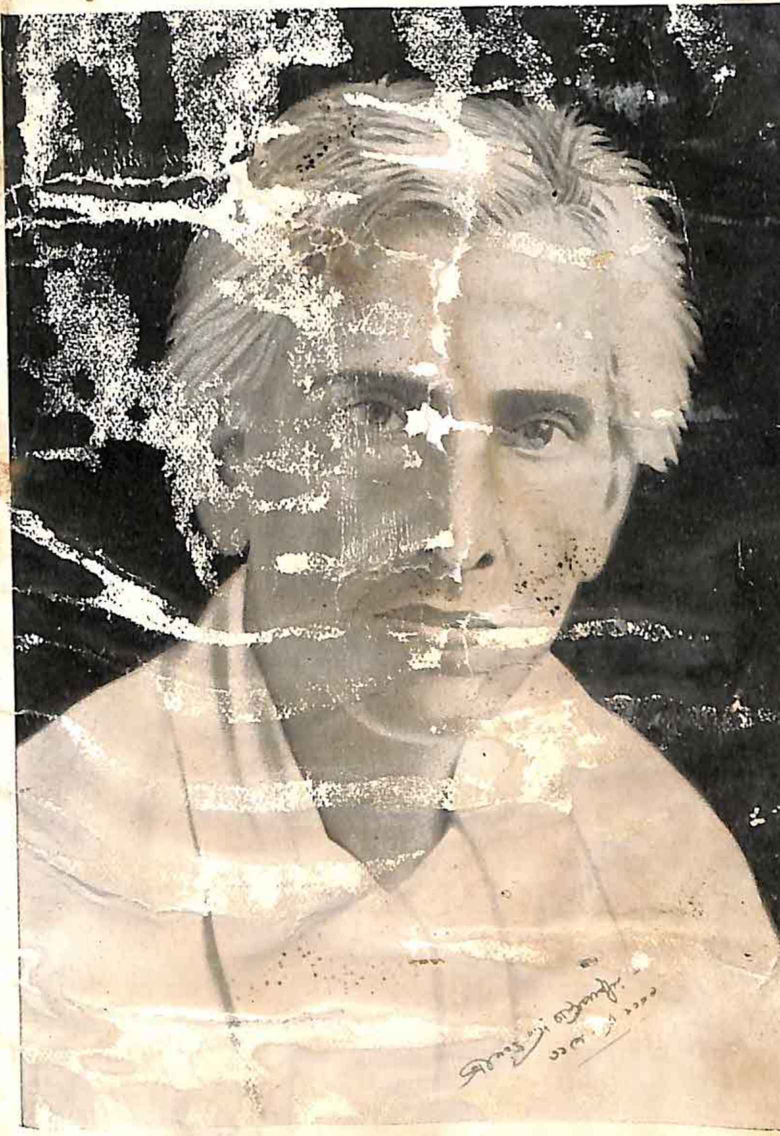
পঞ্চদশ মুদ্রণ

আশ্বিন—১৩৬০

পরম পূজনীয়া—

শ্রীমতী অনিলা দেবী

শ্রীচরণ-কমলেষু—



শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

দত্তা

[redacted]

[illegible] ব্রহ্মপুর স্কুলের হেডমাষ্টার [illegible] বিদ্যালয়ের রত্ন বলিয়া যে [illegible] করিতেন, তাহারা [illegible]খানি বিভিন্ন গ্রাম হইতে [illegible] ক্রোশ পথ [illegible]সিত। তিন জনের কি ভা[illegible]ই ছিল! এমন দিন [illegible] না, যেদিন এই তিনটি বন্ধুতে স্কুলের পথে [illegible] একত্র না হ[illegible] প্রবেশ করিত! তিন জনেরই বাড়ি [illegible] পশ্চিমে। [illegible]সিত সরস্বতীর পুল পার হইয়া দিঘড়া গ্রাম হইতে, এবং বনমা[illegible] [illegible]সবিহারী আসিত দুইখানি পাশা-পাশি গ্রাম কৃষ্ণপুর ও রাধাপুর হইতে। জগদীশ যেমন ছিল সব-চেয়ে মেধাবী, তাহার অবস্থাও ছিল সব-চেয়ে মন্দ। পিতা একজন ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত। যজমানি করিয়া, বিয়া-পৈতা দিয়াই সংসার চালাইতেন। [illegible] মালীরা সঙ্গতিপন্ন। তাহার পিতাকে লোকে কৃষ্ণপুরের জমিদার বলিত। রাসবিহারীদের অবস্থাও বেশ স্বচ্ছল। জমি-জমা, চাষ-বাস, পুকুর-বাগান, পাড়াগাঁয়ে যাহা থাকিলে সংসার দিব্য চলিয়া যায়—স[illegible] ছিল। এ সকল থাকা সত্ত্বেও যে ছেলে[illegible] কোন সহরে বাসা ভাড়া না করিয়া—ঝড় নাই, জল নাই, শীত-গ্রীষ্ম মাথায় পাতিয়া এতটা পথ হাঁটিয়া প্রত্যহ বাটী হইতে বিদ্যালয়ে যাতায়াত করিত তাহার কারণ, তখনকার দিনে কোন পিতামাতাই ছেলেদের এই ক্লেশ-স্বীকার-করাটাকে ক্লেশ বলিয়াই ভাবিতে পারিতেন না; বরঞ্চ মনে করিতেন, এইটুকু দুঃখ না করি[illegible] সরস্বতী [illegible] দিবেন না। তা কারণ যাই হোক, এমনি

করিয়াই ছেলে তিনটি এণ্ট্রান্স পাশ করিয়াছিল। বটতলায় বসিয়া ন্যাড়া বটকে সাক্ষী করিয়া তিন বন্ধুতে প্রতিদিন এই প্রতিজ্ঞা করিত, জীবনে কখনও তাহারা পৃথক হইবে না, কথনও বিবাহ করিবে না, এবং উকিল হইয়া তিন জনেই একটা বাড়িতে থাকিবে; টাকা রোজগার করিয়া সমস্ত টাকা একটা সিন্দুকে জমা করিবে, এবং তাই দিয়া দেশের কাজ করিবে।

এ ত গেল ছেলে-বেলার কল্পনা। কিন্তু যেটা কল্পনা নয়, সত্য, সেটা অবশেষে কিরূপ দাঁড়াইল, তাহাই সংক্ষেপে বলিতেছি, বন্ধুত্বের প্রথম পাকটা এলাইয়া গেল বি-এ ক্লাশে। কলিকাতায় কেশব সেনের তখন প্রচণ্ড প্রতাপ। বক্তৃতার বড় জোর। সে জোর পাড়াগাঁয়ের ছেলে তিনটি হঠাৎ সামলাইতে পারিল না—ভাসিয়া গেল। গেল বটে, কিন্তু বনমালী এবং রাসবিহারী যেরূপ প্রকাশ্যে দীক্ষাগ্রহণ করিয়া ব্রাহ্ম সমাজভুক্ত হইল, জগদীশ সেরূপ পারিল না—ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। সে সর্ব্বাপেক্ষা মেধাবী বটে, কিন্তু অত্যন্ত দুর্ব্বল-চিত্ত। তাহাতে তাঁহার ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত পিতা তখনও জীবিত ছিলেন। কিন্তু ও-দুটির সে বালাই ছিল না। কিছুকাল পূর্ব্বে পিতার পরলোক-প্রাপ্তিতে বনমালী তখন কৃষ্ণপুরের জমিদার, এবং রাসবিহারী তাহাদের রাধাপুরের সমস্ত বিষয়-আশয়ের একচ্ছত্র সম্রাট্। অতএব অনতিকাল পরেই এই দুটি বন্ধু ব্রাহ্ম-পরিবারে বিবাহ করিয়া বিদুষী ভার্য্যা লইয়া গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু দরিদ্র জগদীশের সে সুবিধা হইল না। তাহাকে যথাসময়ে আইন পাশ করিতে হইল, এবং এক গৃহস্থ-ব্রাহ্মণের এগারো বছরের কন্যাকে বিবাহ করিয়া অর্থোপার্জ্জনের নিমিত্ত এলাহাবাদে চলিয়া যাইতে হইল। কিন্তু যাঁহারা রহিলেন, তাঁহাদের যে কাজ কলিকাতায় নিতান্ত সহজ মনে হইয়াছিল, গ্রামে ফিরিয়া তাহাই একান্ত কঠিন

ঠেকিল। বৌমানুষ শ্বশুরবাড়ি আসিয়া ঘোম্‌টা দেয় না, জুতা-মোজা পরিয়া রাস্তায় বাহির হয়—তামাসা দেখিতে পাঁচখানা গ্রামের লোক ভিড় করিয়া আসিতে লাগিল, এবং গ্রাম জুড়িয়া এম্‌নি একটা কদর্য্য হৈ হৈ সুরু হইয়া গেল যে, একান্ত নিরুপায় না হইলে আর কেহ স্ত্রী লইয়া সেখানে বাস করিতে পারে না। বনমালীর উপায় ছিল; সুতরাং সে গ্রাম ছাড়িয়া কলিকাতায় আসিয়া বাস করিল; একমাত্র জমিদারীর উপর নির্ভর না করিয়া ব্যবসা সুরু করিয়া দিল। কিন্তু রাসবিহারীর অল্প আয়। কাজেই সে নিজের পিঠের উপর একটা এবং বিদুষী ভার্য্যার পিঠের উপর একটা কুলা চাপা দিয়া কোনমতে তাহার দেশের বাটীতেই 'একঘরে' হইয়া বসিয়া রহিল। অতএব তিন বন্ধুর একজন এলাহাবাদে একজন রাধাপুরে এবং আর একজন কলিকাতায় বাসা করায়, আজীবন অবিবাহিত থাকিয়া এক বাড়িতে বাস করিয়া, এক সিন্দুকে টাকা জমা করিয়া দেশ উদ্ধার করার প্রতিজ্ঞাটা আপাততঃ স্থগিত রহিল; এবং যে ন্যাড়া বটবৃক্ষ সাক্ষী ছিলেন, তিনি কাহারও বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ উত্থাপন না করিয়া নীরবে মনে মনে বোধ করি হাসিতে লাগিলেন। এইভাবে অনেক দিন গেল। ইতিমধ্যে তিন বন্ধুর কদাচিৎ কখনও দেখা হইত বটে, কিন্তু ছেলে-বেলার প্রণয়টা একেবারে তিরোহিত হইল না। জগদীশের ছেলে হইলে সে বনমালীকে সুসংবাদ দিয়া এলাহাবাদ হইতে লিখিল, তোমার মেয়ে হইলে, তাহাকে পুত্রবধূ করিয়া ছেলে-বেলায় যে পাপ করিয়াছি, তাহার কতক প্রায়শ্চিত্ত করিব। তোমার দয়াতেই আমি উকীল হইয়া সুখে আছি, এ-কথা কোন দিন ভুলি নাই।

বনমালী তাহার উত্তরে লিখিলেন, বেশ। তোমার ছেলের দীর্ঘ-জীবন কামনা করি। কিন্তু আমার মেয়ে হওয়ার কোন আশাই নাই। তবে যদি কোন দিন মঙ্গলময়ের আশীর্ব্বাদে সন্তান হয়, তোমাকে দিব।

চিঠি লিখিয়া বনমালী মনে মনে হাসিল। কারণ বছর-দুই পূর্ব্বে তাহার অপর বন্ধু রাসবিহারীর যখন ছেলে হয়, সেও ঠিক এই প্রার্থনাই করিয়াছিল। বাণিজ্যের কৃপায় সে এখন মস্ত-ধনী। সবাই তাহার মেয়েকে ঘরে আনিতে চায়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

দুমাস-ছমাসের কথা নয়, পঁচিশ বৎসরের কাহিনী বলিতেছি। বনমালী প্রাচীন হইয়াছেন। কয়েক বৎসর হইতে রোগে ভুগিয়া ভুগিয়া এইবার শয্যা আশ্রয় করিয়া টের পাইয়াছিলেন, আর বোধ হয় উঠিতে হইবে না। তিনি চিরদিনই ভগবৎপরায়ণ এবং ধর্ম্মভীরু। মরণে তাঁহার ভয় ছিল না। শুধু একমাত্র সন্তান বিজয়ার বিবাহ দিয়া যাইবার অবকাশ ঘটিল না মনে করিয়াই কিছু ক্ষুণ্ণ ছিলেন। সেদিন অপরাহ্ণ-কালে হঠাৎ বিজয়ার হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে লইয়া বলিয়াছিলেন, মা, আমার ছেলে নাই ব'লে আমি এতটুকু দুঃখ করি নে। তুই আমার সব। এখনো তোর আঠার বৎসর বয়স পূর্ণ হয় নি বটে, কিন্তু তোর এইটুকু মাথার উপর আমার এত বড় বিষয়টা রেখে যেতেও আমার এক বিন্দু ভয় হয় না। তোর মা নেই, ভাই নেই, একটা খুড়ো-জ্যাঠা পর্য্যন্ত নেই। তবু আমি নিশ্চয় জানি, আমার সমস্ত বজায় থাকবে। শুধু একটা অনুরোধ ক'রে যাই মা, জগদীশ যাই করুক আর যাই হোক্, সে আমার ছেলে-বেলার বন্ধু। দেনার দায়ে তার বাড়িঘর কখনো বিক্রী ক'রে নিস্ নে। তার একটি ছেলে আছে—তাকে চোখে দেখি নি, কিন্তু শুনেছি, সে বড় সৎ ছেলে। বাপের দোষে তাকে নিরাশ্রয় করিস্ নে মা, এই আমার শেষ অনুরোধ।

বিজয়া অশ্রু-রুদ্ধ কণ্ঠে কহিয়াছিল, বাবা, তোমার আদেশ আমি কোন

দিন অমান্য করব না। জগদীশবাবু যতদিন বাঁচবেন, তাঁকে তোমার মতই মান্য করব; কিন্তু তাঁর অবর্ত্তমানে, সমস্ত বিষয় মিছামিছি তাঁর ছেলেকে কেন ছেড়ে দেব? তাঁকে তুমিও কখনো চোখে দেখ নি, আমিও দেখি নি। আর যদি সত্যিই তিনি লেখাপড়া শিখে থাকেন অনায়াসেই ত পিতৃ-ঋণ শোধ করতে পারবেন।

বনমালী মেয়ের মুখের পানে চোখ তুলিয়া কহিয়াছিলেন, ঋণ ত কম নয় মা। ছেলেমানুষ, ও যদি না পারতে পারে?

মেয়ে জবাব দিয়াছিল, যে না পারে, সে কুসন্তান, বাবা তাকে প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়।

বনমালী তাঁহার এই সুশিক্ষিতা তেজস্বিনী কন্যাকে চিনিতেন। তাই আর পীড়াপীড়ি করেন নাই; শুধু একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিয়াছিলেন, সমস্ত কাজ-কর্ম্মে ভগবানকে মাথার উপর রেখে যা কর্ত্তব্য, তাই ক'রো মা? তোমাকে বিশেষ কোন অনুরোধ ক'রে আমি আবদ্ধ ক'রে যেতে চাই নে। বলিয়া ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া, পুনরায় একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিয়াছিলেন, জানিস্ মা বিজয়া, এই জগদীশ যখন একটা মানুষের মত মানুষ ছিল, তখন তুই না জন্মাতেই তোকে তার এই ছেলেটির নাম ক'রেই চেয়ে নিয়েছিল। আমিও মা কথা দিয়েছিলাম; বলিয়া তিনি যেন উৎসুক দৃষ্টিতেই চাহিয়াছিলেন।

তাঁহার এই কন্যাটি শিশু-কালেই মাতৃহীন হইয়াছিল বলিয়া তিনি তাহার পিতামাতা উভয়ের স্থান পূর্ণ করিয়াছিলেন। তাই বিজয়া পিতার কাছে মায়ের আব্দার করিতেও কোন দিন সঙ্কোচ বোধ করে নাই; কহিয়াছিল, বাবা, তুমি তাঁকে শুধু মুখের কথাই দিয়েছিলে, তোমার মনের কথা দাও নি।

কেন মা?

তা দিলে কি একবার তাঁকে চোখের দেখা দেখ্‌তেও চাইতে না?

বনমালী বলিয়াছিলেন, রাসবিহারীর কাছে যখন শুনেছিলাম, ছেলেটি না কি মায়ের মতই দুর্ব্বল—এমন কি, ডাক্তারেরা তার দীর্ঘজীবনের কোন আশাই করেন না, তখন তাকে কাছে পেয়েও একবার আনিয়ে দেখ্‌তে চাই নি। এই কলকাতা সহরেই কোন একটা বাসায় থেকে সে তখন বি-এ পড়ত। তার পরে নিজের নানান অসুখে-বিসুখে সে কথা আর ভাবি নি। কিন্তু এখন দেখছি, সেইটাই আমার মস্ত ক্ষতি হয়ে গেছে মা। তবু তোকে সত্যি বল্‌ছি বিজয়া, সে সময় জগদীশকে তোর সম্বন্ধে আমার মনের কথাই দিয়েছিলাম। কিছুক্ষণ থামিয়া বলিয়াছিলেন, আজ জগদীশকে সবাই জানে—একটা অকর্ম্মণ্য জুয়াড়ি, অপদার্থ মাতাল। কিন্তু এই জগদীশই একদিন আমাদের সকলের চেয়েই ভাল ছেলে ছিল। বিদ্যা বুদ্ধির জন্য বল্‌ছি না মা, সে অনেকেরই থাকে কিন্তু এমন প্রাণ দিয়ে ভালবাস্‌তে আমি কাউকে দেখি নি; এই ভালবাসাই তার কাল হয়েছে। তার অনেক দোষ আমি জানি, কিন্তু যখনি মনে পড়ে, স্ত্রীর মৃত্যুতে সে শোকে পাগল হয়ে গেছে, তখন তোর মায়ের কথা স্মরণ ক'রে আমি ত মা, তাকে মনে মনে শ্রদ্ধা না ক'রে পারি নে। তার স্ত্রী ছিলেন সতী-লক্ষ্মী। তিনি মৃত্যুকালে নরেনকে কাছে ডেকে শুধু বলেছিলেন, বাবা, শুধু এই আশীর্ব্বাদই ক'রে যাই, যেন ভগবানের ওপর তোমার অচল বিশ্বাস থাকে। শুনেছি না কি মায়ের এই শেষ আশীর্ব্বাদটুকু নিষ্ফল হয় নি। নরেন এইটুকু বয়সেই ভগবানকে তার মায়ের মতই ভালবাসতে শিখেছে। যে এ পেরেছে, সংসারে আর তার বাকি কি আছে মা?

বিজয়া প্রশ্ন করিয়াছিল, এইটাই কি সংসারে সব-চেয়ে বড় পারা বাবা?

মরণোন্মুখ বৃদ্ধের শুষ্ক চক্ষু সজল হইয়া উঠিয়াছিল। সহসা দুই হাত বাড়াইয়া মেয়েকে বুকের উপর টানিয়া লইয়া বলিয়াছিলেন, এইটিই সব-চেয়ে বড় পারা মা! সংসারের মধ্যে, সংসারের বাইরে—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এত বড় পারা আর কিছুই নেই বিজয়া! তুমি নিজে কোনদিন পার আর না পার মা, যে পারে, তার পায়ে যেন মাথা পাততে পার—আমিও মরণকালে তোমাকে এই আশীর্ব্বাদ করে যাই।

পিতৃ-বক্ষের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া সেদিন বিজয়ার মনে হইয়াছিল, কে যেন বড় মধুর উজ্জ্বলতর দৃষ্টি দিয়া তাহার পিতার বুকের ভিতর হইতে তাহার নিজের বুকের গভীর অন্তস্তল পর্য্যন্ত চাহিয়া দেখিতেছে। এই অভূতপূর্ব্ব পরমাশ্চর্য্য অনুভূতি সেদিন ক্ষণকালের জন্য তাহাকে আবিষ্ট করিয়া ফেলিয়াছিল। বনমালী কহিয়াছিলেন, ছেলেটির নাম নরেন; তার বাপের মুখে শুনেছি, সে ডাক্তার হয়েছে—কিন্তু ডাক্তারি করে না। এখন যদি এ দেশে সে থাকৃত, এই সময়ে একবার তাকে আনিয়ে চোখের দেখা দেখে নিতাম।

বিজয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, এখন তিনি কোথায় আছেন?

বনমালী বলিয়াছিলেন, তার মামার কাছে—বর্ম্মায়—জগদীশের এখন ত আর সব কথা গুছিয়ে বলবার ক্ষমতা নেই, তবু তার মুখের দু-একটা ভাসা ভাসা কথায় মনে হয়, যেন সে ছেলে তার মায়ের সমস্ত সদ্‌গুণই পেয়েছে। ভগবান করুন, যেখানে যেমন করেই থাক্ যেন বেঁচে থাকে।

সন্ধ্যা হইয়াছিল। ভৃত্য আলো দিতে আসিয়া, বিলাসবাবুর আগমন-সংবাদ জানাইয়া গেল, বনমালী বলিয়াছিলেন, তবে তুমি এখন নিচে যাও মা, আমি একটু বিশ্রাম করি।

বিজয়া পিতার শিয়রের বালিশগুলি গুছাইয়া দিয়া, পায়ের উপর শালখানি যথাস্থানে টানিয়া নিয়া, আলোটা চোখের উপর হইতে আড়াল

করিয়া দিয়া নিচে নামিয়া গেলে, পিতার জীর্ণ বক্ষ ভেদিয়া শুধু একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়িয়াছিল। সেদিন বিলাসের আগমন-সংবাদে কন্যার মুখের উপর যে আরক্ত আভাসটুকু দেখা দিয়াছিল, বৃদ্ধকে তাহা ব্যথাই দিয়াছিল।

বিলাসবিহারী রাসবিহারীর পুত্র। সে এই কলিকাতা সহরে থাকিয়া বহুদিন যাবৎ প্রথমে এফ-এ এবং পরে বি-এ পড়িতেছে। বনমালী সমাজ ত্যাগ করিয়া অবধি বড় একটা দেশে যাইতেন না। যদিচ ব্যবসায়ের শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দেশেও জমিদারী অনেক বাড়াইয়াছিলেন, কিন্তু সে সমস্ত তত্ত্বাবধানের ভার বাল্যবন্ধু রাসবিহারীর উপরেই ছিল। সেই সূত্রেই বিলাসের এ বাটীতে আসা-যাওয়া আরম্ভ হইয়া কিছুদিন হইতে অন্য যে কারণে পর্য্যবসিত হইয়াছিল, তাহা পরে প্রকাশ পাইবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মাস-দুই হইল বনমালীর মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার কলিকাতার এত বড় বাড়িতে বিজয়া এখন একা। তাহার দেশের বিষয়-সম্পত্তির দেখা-শুনা রাসবিহারীই করিতে লাগিলেন, এবং সেই সূত্রে তাহার একপ্রকার অভিভাবক হইয়াও বসিলেন। কিন্তু নিজে থাকেন গ্রামে, সেই জন্য পুত্র বিলাসবিহারীর উপরেই বিজয়ার সমস্ত খবরদারির ভার পড়িল। সে-ই তাহার প্রকৃত অভিভাবক হইয়া উঠিল।

তখন এই সময়টায়, প্রতি ব্রাহ্ম-পরিবারে 'সত্য', 'সুনীতি', 'সুরুচি' এই শব্দগুলা বেশ বড় করিয়াই শিখানো হইত। কারণ বিদেশে পড়িতে আসিয়া হিন্দু যুবকেরা যখন পিতামাতার বিরুদ্ধে, দেবদেবীর বিরুদ্ধে, প্রতিষ্ঠিত সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া এই সমাজের বাঁধানো খাতায় নাম লিখাইয়া বসিত, তখন এই শব্দগুলাই চাড়া দিয়া তাহাদের কাঁচা মাথা ঘাড়ের উপর সোজা করিয়া রাখিত—ঝুঁকিয়া ভাঙিয়া পড়িতে দিত

না। তাহারা কহিত, যাহা সত্য বলিয়া বুঝিবে, তাহাই করিবে। মায়ের অশ্রুজলই বল, আর বাপের দীর্ঘনিশ্বাসই বল, কিছুই দেখিবার শুনিবার প্রয়োজন নাই। ও-সব দুর্ব্বলতা সর্ব্বপ্রযত্নে পরিহার করিবে, নচেৎ আলোকের সন্ধান পাইবে না। কথাগুলা বিজয়াও শিখিয়াছিল।

আজ গ্রাম হইতে বিলাসবাবু বৃদ্ধ মাতাল জগদীশের মৃত্যু সংবাদ লইয়া আসিয়াছিল। বিজয়ার সে পিতৃবন্ধু বটে, কিন্তু বিলাসবাবু যখন বলিতে লাগিল, কেমন করিয়া জগদীশ মদ খাইয়া মাতাল হইয়া ছাদের উপর হইতে পড়িয়া মরিয়াছে, তখন ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের সুনীতি স্মরণ করিয়া বিজয়া এই দুর্ভাগ্য পিতৃ-সখার বিরুদ্ধে ঘৃণায় ওষ্ঠ বিকৃত করিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা বোধ করিল না। বিলাস বলিতে লাগিল, জগদীশ মুখুয্যে আমার বাবারও ছেলে-বেলার বন্ধু ছিল; কিন্তু তিনি তার মুখ পর্য্যন্ত দেখ্‌তেন না। টাকা ধার কর্‌তে দুবার এসেছিল, বাবা চাকর দিয়ে তাকে ফটকের বার ক'রে দিয়েছিলেন। তিনি সর্ব্বদা বলেন, এই সব দুর্নীতিপরায়ণ লোকগুলোকে প্রশ্রয় দিলে, মঙ্গলময় ভগবানের শ্রীচরণে অপরাধ করা হয়।

বিজয়া সায় দিয়া কহিল, অতি সত্য কথা।

বিলাস উৎসাহিত হইয়া বক্তৃতার ভঙ্গিতে বলিতে লাগিল, বন্ধুই হোক আর যেই হোক্ দুর্ব্বলতা-বশে কোনমতেই ব্রাহ্ম-সমাজের চরম আদর্শকে ক্ষুণ্ণ করা উচিত নয়। জগদীশের সমস্ত সম্পত্তি এখন ন্যায়তঃ আমাদের। তার ছেলে পিতৃ-ঋণ শোধ কর্‌তে পারে ভাল, না পারে, আইনমত আমাদের এই দণ্ডেই সমস্ত হাতে নেওয়া উচিত। বস্তুতঃ ছেড়ে দেবার আমাদের কোন অধিকার নেই। কারণ এই টাকায় আমরা অনেক সৎকার্য্য কর্‌তে পারি। সমাজের কোন ছেলেকে বিলাত পর্য্যন্ত পাঠাতে পারি; ধর্ম্ম-প্রচারে ব্যয় করতে পারি; কত কি করতে পারি। কেন তা না কর্‌ব বলুন? তা ছাড়া, জগদীশবাবু কিংবা তার ছেলে আমাদের

সমাজভুক্ত নয় যে, তার উপর কোন প্রকার দয়া করা আবশ্যক। আপনার সম্মতি পেলেই বাবা সমস্ত ঠিক ক'রে ফেল্‌বেন ব'লে আজ আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন।

বিজয়া মৃত পিতার শেষ কথাগুলা স্মরণ করিয়া ভাবিতে লাগিল—সহসা জবাব দিতে পারিল না। তাহাকে ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া বিলাস সজোরে, দৃঢ়কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, না, আপনাকে ইতস্ততঃ করতে আমি কোন মতেই দেব না। দ্বিধা, দুর্ব্বলতা—পাপ! শুধু পাপ কেন, মহাপাপ! আমি মনে মনে সঙ্কল্প করেছি, তার বাড়িটায় আপনার নাম ক'রে—যা কোথাও নেই, কোথাও হয় নি—আমি তাই করব। পাড়াগাঁয়ের মধ্যে ব্রাহ্ম-মন্দির প্রতিষ্ঠা ক'রে দেশের হতভাগ্য, মূর্খ লোকগুলোকে ধর্ম্মশিক্ষা দেব। আপনি একবার ভেবে দেখুন দেখি, এদের মূর্খতার জ্বালাতেই বিরক্ত হয়ে আপনার স্বর্গীয় পিতৃদেব দেশ ছেড়েছিলেন কি না! তাঁর কন্যা হয়ে আপনার উচিত নয়—এই নোব্‌ল প্রতিশোধ নিয়ে তাদেরই এই চরম উপকার করা! বলুন, আপনিই এ কথার উত্তর দিন!

বিজয়া বিচলিত হইয়া উঠিল। বিলাস দৃপ্তস্বরে বলিতে লাগিল, সমস্ত দেশের মধ্যে একটা কত বড় নাম, কত বড় সাড়া প'ড়ে যাবে, ভেবে দেখুন দেখি। হিন্দুদের স্বীকার করতেই হবে—সে ভার আমার উপর—যে, ব্রাহ্ম-সমাজে মানুষ আছে। হৃদয় আছে—স্বার্থত্যাগ আছে। যাঁকে তারা নির্য্যাতন ক'রে দেশ থেকে বিদায় ক'রে দিয়েছিল, সেই মহাত্মারই মহীয়সী কন্যা তাদের মঙ্গলের জন্যে এই বিপুল স্বার্থত্যাগ করেছেন। সমস্ত ভারতবর্ষময় একটা কি বিরাট্‌ মর‍্যাল এফেক্ট হবে, বলুন দেখি। বলিয়া বিলাসবিহারী সম্মুখের টেবিলের উপর একটা প্রচণ্ড চাপড় মারিল। শুনিতে শুনিতে বিজয়া মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল। বাস্তবিক

এত-বড় নামের লোভ সংবরণ করা আঠারো বছরের মেয়ের পক্ষে সম্ভব নয়। সে পূর্ণ সম্মতি প্রদান করিয়া কহিল, তাঁর ছেলের নাম শুনেচি নরেন। এখন সে কোথায় আছে, জানেন?

জানি। হতভাগ্য পিতার মৃত্যুর পরে সে বাড়ি এসে তার শ্রাদ্ধ ক'রে এখন দেশেই আছে।

আপনার সঙ্গে বোধ হয় আলাপ আছে।

আলাপ? ছিঃ! আপনি আমাকে কি মনে করেন বলুন দেখি! বলিয়া বিজয়াকে একেবারে অপ্রতিভ করিয়া দিয়া বিলাসবাবু একটুখানি হাসিয়া কহিল, আমি ত ভাব্‌তেই পারি নে যে, জগদীশ মুখুয্যের ছেলের সঙ্গে আমি আলাপ করছি। তবে সেদিন রাস্তায় হঠাৎ একটা পাগলের মত নূতন লোক দেখে আমি আশ্চর্য্য হয়েছিলাম। শুন্‌লাম সেই নরেন মুখুয্যে।

বিজয়া কৌতূহলী হইয়া কহিল, পাগলের মত? শুনেছি নাকি ডাক্তার?

বিলাসবাবু ঘৃণায় সর্ব্বাঙ্গ কুঞ্চিত করিয়া কহিল, ঠিক পাগলের মত। ডাক্তার? আমি বিশ্বাস করি নে। মাথায় বড় বড় চুল—যেমন লম্বা তেম্‌নি রোগা। বুকের প্রত্যেক পাঁজরাটি বোধ করি দূর থেকে গোণা যায়—এই ত চেহারা। তালপাতার সেপাই! ছোঃ—

বস্তুতঃ চেহারা লইয়া গর্ব্ব করিবার অধিকার তাহার ছিল। কারণ সে বেঁটে, মোটা এবং ভারি জোয়ান। তাহার বুকের পাঁজর বোমা মারিয়া নির্দ্দেশ করা যাইত না। সে আরও কি বলিতে যাইতেছিল বিজয়া বাধা দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা বিলাসবাবু, জগদীশবাবুর বাড়িটা যদি আমরা সত্যই দখল ক'রে নেই, গ্রামের মধ্যে কি একটা বিশ্রী গোলমাল উঠ্‌বে না?

বিলাস জোর দিয়া বলিয়া উঠিল, একেবারে না। আপনি পাঁচ সাতখানা গ্রামের মধ্যে এমন একজনও পাবেন না, যার ঐ মাতালটার ওপর বিন্দুমাত্র সহানুভূতি ছিল। আহা, বলে এমন লোক ও-অঞ্চলে নেই। একটু হাসিয়া কহিল, কিন্তু তাও যদি না হ'ত, আমি বেঁচে থাকা পর্য্যন্ত সে চিন্তা আপনার মনে রাখা উচিত নয়। কিন্তু আমি বলি, অন্ততঃ কিছুদিনের জন্যও আপনার একবার দেশে যাওয়া কর্ত্তব্য।

বিজয়া আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কেন? আমরা কখনই ত সেখানে যাই নে।

বিলাস উদ্দীপ্ত-কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, সেই জন্যই ত বলি, আপনার যাওয়া চাই-ই! প্রজাদের একবার তাদের মহারাণীকে দেখতে দিন। আমার ত নিশ্চয় মনে হয়, এ সৌভাগ্য থেকে তাদের বঞ্চিত করা মহাপাপ!

লজ্জায় বিজয়ার সমস্ত মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল; সে আনত মুখে কি একটা বলিবার উপক্রম করিতেই, বিলাস বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল, ইতস্ততঃ কর্‌বার এতে কিছু নেই। একবার ভেবে দেখুন দিকি, কত কাজ সেখানে আপনার কর্‌বার আছে! এ কথা আজ আপনার মুখের ওপরেই আমি বল্‌তে পারি যে, আপনার বাবা সমস্ত দেশের মালিক হয়েও যে কতকগুলো ক্ষেপা কুকুরের ভয়ে আর কখনো গ্রামে ফিরে গেলেন না, সে কি ভাল কাজ করেছিলেন? এই কি আমাদের ব্রাহ্ম সমাজের আদর্শ? এ যে সমাজের আদর্শ নয়, তাতে আর ভুল কি?

বিজয়া ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, কিন্তু বাবার মুখে শুনেছি, আমাদের দেশের বাড়ি ত বাস কর্‌বার উপযুক্ত নয়।

বিলাস বলিল, আপনি হুকুম দিন, একবার বলুন সেখানে যাবেন—আমি দশ দিনের মধ্যে তাকে বাসের উপযুক্ত ক'রে দেব। আমার উপর

নির্ভর করুন, যাতে সে বাড়ি আপনার মর্য্যাদা সম্পূর্ণ গ্রহণ করতে পারে, আমি প্রাণপণে তার বন্দোবস্ত ক'রে দেব। দেখুন, একটা কথা আমার বহুদিন থেকে বার বার মনে হয়—আপনাকে শুধু সাম্‌নে রেখে কি যে ক'রে তুল্‌তে পারি, তার বোধ করি সীমা-পরিসীমা নেই।

বিজয়াকে সম্মত করিয়া বিলাস প্রস্থান করিলে, সে সেইখানেই চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। যাহা তাহার দেশ, সেখানে সে জন্মাবধি কখনও যায় নাই বটে, কিন্তু মাঝে মাঝে পিতার মুখে তাহার কত বর্ণনাই না শুনিয়াছে। দেশের গল্প করিতে তাহার উৎসাহ ও আনন্দ ধরিত না। কিন্তু তখন সে সকল কাহিনী তাহার কিছুমাত্র মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারিত না; যেমন শুনিত তেমনি ভুলিত। কিন্তু আজ কোথা হইতে অকস্মাৎ ফিরিয়া আসিয়া সেই সব বিস্মৃত বিবরণ একেবারে আকার ধরিয়া তাহার চোখের উপর দেখা দিল। তাহার মনে হইতে লাগিল তাহাদের গ্রামের বাড়ি কলিকাতার এই অট্টালিকার মত বৃহৎ ও জমকালো নয় বটে, কিন্তু সেই ত তাহার সাতপুরুষের বাস্ত-ভিটা! সেখানে পিতামহ-পিতামহী, প্রপিতামহ-প্রপিতামহী, তাঁদের বাপ-মা এমন কত পুরুষের সুখে-দুঃখে উৎসবে-ব্যসনে যদি দিন কাটিয়া থাকে তবে তাহারই বা কাটিবে না কেন?

গলির সুমুখে হাজরাদের তেতলা বাড়ির আড়ালে সূর্য্য অদৃশ্য হইল। এই লইয়া তাহার পিতার সঙ্গে তাহার কত কথা হইয়া গেছে। তাহার মনে পড়িল, কত সন্ধ্যায় তিনি ওই ইজি-চেয়ারের উপর বসিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিয়াছিলেন, বিজয়া, আমার দেশের বাড়িতে কখনও এ-দুঃখ পাই নি। সেখানে কোন হাজরার তেতলা ছাদেই আমার শেষ সূর্য্যাস্ত-টুকুকে এমন ক'রে কোনদিন আড়াল করে দাঁড়ায় নি। তুই ত জানিস নে মা, কিন্তু আমার যে চোখ-দুটি এই বুকের ভেতর থেকে উঁকি মেরে

চেয়ে আছে, তারা স্পষ্ট দেখতে পারে, আমাদের ফুল-বাগানের ধারে ছোট্ট নদীটি এতক্ষণ সোনার জলে টল টল ক'রে উঠেচে ; আর তার পরপারে যতদূর দৃষ্টি যায়, মাঠের পর মাঠের শেষে এখনো সূর্য্যিঠাকুর যাই যাই করেও গ্রামের মায়া কাটিয়ে যেতে পারেন নি। ঐ ত মা, গলির মোড়ে দেখতে পাচ্চিস, দিনের কাজ শেষ ক'রে ঘরপানে মানুষের স্রোত বয়ে যাচ্চে ; কিন্তু ওই দশ-বারো হাত জমিটুকু ছাড়া তাদের সঙ্গে যাবার ত আর একটুও পথ নেই। এম্‌নি করে এই সন্ধ্যা-বেলায় সেখানেও উল্টা স্রোত ঘরপানে বয়ে যেতে দেখেছি ; কিন্তু তার প্রত্যেক গরু-বাছুরটির গোয়াল-ঘরের পরিচয় পর্য্যন্ত জান্‌তুম মা। বলিয়া অকস্মাৎ একটা অতি গভীর শ্বাস হৃদয়ের ভিতর হইতে মোচন করিয়া নীরব হইয়া থাকিতেন। যে গ্রাম একদিন তিনি ত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলেন এত সুখৈশ্বর্য্যের মধ্যেও যে তাহারই জন্য তাঁহার ভিতরটা কাঁদিতে থাকিত, ইহা যখন তখন বিজয়া টের পাইত। তথাপি একটা দিনের জন্যও সে ইহার কারণ চিন্তা করিয়া দেখে নাই ; কিন্তু আজ বিলাসবাবু সেই দিকে তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া চলিয়া গেলে, পরলোকগত পিতৃদেবের কথাগুলা স্মরণ করিতে করিতে তাঁহার প্রচ্ছন্ন বেদনার হেতু অকস্মাৎ এক মুহূর্ত্তেই তাহার মনের মধ্যে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। কলিকাতার এই বিপুল জনারণ্যের মধ্যেও তিনি যে একাকী কিরূপ দিন যাপন করিয়া গেছেন, আজ তাহা সে চোখের উপর দেখিতে পাইয়া একেবারে ভয় পাইয়া গেল ; এবং আশ্চর্য্য এই যে, যে গ্রাম, যে ভিটার সহিত তাহার জন্মাবধি পরিচয় নাই তাহাই আজ তাহাকে দুর্নিবার শক্তিতে টানিতে লাগিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বহুকাল পরিত্যক্ত জমিদার-বাটি বিলাসের তত্ত্বাবধানে মেরামত হইতে লাগিল; কলিকাতা হইতে অদৃষ্টপূর্ব্ব বিচিত্র আসবাব সকল গরুর গাড়ী বোঝাই হইয়া আসিতে লাগিল। জমিদারের একমাত্র কন্যা দেশে বাস করিতে আসিবেন, এই সংবাদ প্রচারিত হইবামাত্র শুধু কেবল কৃষ্ণপুরের নয়, রাধাপুর, ব্রজপুর, দিঘড়া প্রভৃতি আশেপাশের পাঁচ-সাতটা গ্রামের মধ্যে হৈ চৈ পড়িয়া গেল। এমনই ত ঘরের পাশে জমিদারের বাস চিরদিনই লোকের অপ্রিয়, তাহাতে জমিদারের না থাকাটাই প্রজাদের অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল। সুতরাং নূতন করিয়া তাঁহার বাস করিবার বাসনাটা সকলের কাছেই একটা অন্যায় উৎপাতের মত প্রতিভাত হইল। ম্যানেজার রাসবিহারীর প্রবল শাসনে তাহাদের দুঃখের অভাব ছিল না, আবার জমিদার-কন্যার প্রত্যাবর্ত্তনের শুভ-উপলক্ষে সে যে কোন্ উপদ্রবের সৃষ্টি করিবে তাহা হাটে-মাঠে-ঘাটে—সর্ব্বত্রই এক অশুভ আলোচনার বিষয় হইয়া উঠিল। পরলোকগত বৃদ্ধ জমিদার বনমালী যতদিন জীবিত ছিলেন, তখন দুঃখের মধ্যেও এই সুখটুকু ছিল যে, কোন গতিকে কলিকাতায় গিয়া একবার তাঁহার কাছে পড়িতে পারিলে, কাহাকেও নিষ্ফল হইয়া ফিরিতে হইত না! কিন্তু জমিদার-কন্যার বয়স অল্প, মাথা গরম; রাসবিহারীর পুত্রের সঙ্গে বিবাহের জনশ্রুতি গ্রামে অপ্রচারিত ছিল না—তিনি মেমসাহেব, ম্লেচ্ছ; সুতরাং অদূর ভবিষ্যতে রাসবিহারীর দৌরাত্ম্য কল্পনা করিয়া কাহারও মনে কিছুমাত্র সুখ রহিল না—পৈতাধারী ব্রাহ্মণেরও না, পৈতাহীন শূদ্রেরও না। এমনি, ভয়ে ভাবনায় বর্ষাটা গেল। শরতের প্রারম্ভেই এক মধুর প্রভাতে মস্ত দুই ওয়েলারবাহিত খোলা ফিটনে চড়িয়া তরুণী জমিদার-কন্যা শত নরনারীর সভয় কৌতূহল দৃষ্টির মাঝখান

দিয়া হুগলি ষ্টেশন হইতে পিতৃ-পিতামহের পুরাতন আবাস-স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

বাঙালীর মেয়ে—আঠারো-উনিশ বৎসর পার হইয়া গেছে, তথাপি বিবাহ হয় নাই—সে প্রকাশ্যে জুতা-মোজা পরে—খাদ্যাখাদ্য বিচার করে না—ইত্যাদি কুৎসা গ্রামের লোকেরা সঙ্গোপনে করিতে লাগিল, আবার জমিদারের নজর লইয়া একে একে, দুইয়ে দুইয়ে আসিয়া নানা প্রকারে আনন্দ ও মঙ্গল-কামনা জানাইয়াও যাইতে লাগিল। এমন করিয়া পাঁচ-ছয় দিন কাটিবার পরে, সেদিন সকাল-বেলা বিজয়া চা-পানের পর নিচের বসিবার ঘরে বিলাসবাবুর সহিত বিষয়-সম্পত্তি সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা কহিতেছিল, বেহারা আসিয়া জানাইল, একজন ভদ্রলোক দেখা করিতে চান্।

বিজয়া কহিল, এইখানে নিয়ে এসো।

এই কয়দিন ক্রমাগতই তাহার ইতর-ভদ্র প্রজারা নজর লইয়া যখন-তখন সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিল; সুতরাং প্রথমে সে বিশেষ কিছু মনে করে নাই। কিন্তু ক্ষণকাল পরে যে ভদ্রলোকটি বেহারার পিছনে ঘরে প্রবেশ করিল, তাহার প্রতি দৃষ্টিপাতমাত্রই বিজয়া বিস্মিত হইল। তাহার বয়স বোধ করি চব্বিশ-পঁচিশ হইবে। লোকটি দীর্ঘাঙ্গ, কিন্তু তদনুপাতে হৃষ্টপুষ্ট নয়, বরঞ্চ ক্ষীণকায়। বর্ণ উজ্জ্বল গৌর, গোঁফ-দাড়ি কামানো, পায়ে চটিজুতা, গায়ে জামা নাই, শুধু একখানি মোটা চাদরের ফাঁক দিয়া শুভ্র পৈতার গোছা দেখা যাইতেছিল। সে ক্ষুদ্র একটি নমস্কার করিয়া একখানা চেয়ার টানিয়া লইয়া উপবেশন করিল। ইতিপূর্ব্বে যে-কোন ভদ্রলোক সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছে, শুধু যে নজরের টাকা হাতে লইয়াই প্রবেশ করিয়াছে তাহা নয়, তাহারা কুণ্ঠিত হইয়া প্রবেশ করিয়াছে। কিন্তু এ

লোকটির আচরণে সঙ্কোচের লেশমাত্র নাই। তাহার আগমনে শুধু যে বিজয়াই বিস্মিত হইয়াছিল, তাহা নয়; বিলাসও কম আশ্চর্য্য হয় নাই। বিলাসের গ্রামান্তরে বাস হইলেও এ-দিকে সকল ভদ্র-লোককেই সে চিনিত কিন্তু এই যুবকটি তাহার সম্পূর্ণ অপরিচিত। আগন্তুক ভদ্রলোকটিই প্রথমে কথা কহিল। বলিল, আমার মামা পূর্ণ গাঙ্গুলিমশাই আপনার প্রতিবেশী, পাশের বাড়িটিই তাঁর। আমি শুনে অবাক্ হয়ে গেছি যে, তাঁর পিতৃ-পিতামহের কালের দুর্গাপূজা নাকি আপনি এবার বন্ধ ক'রে দিতে চান? এর মানে কি? বলিয়া সে বিজয়ার মুখের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিল। প্রশ্ন এবং তাহা জিজ্ঞাসা করার ধরণে বিজয়া আশ্চর্য্য এবং মনে মনে বিরক্ত হইল, কিন্তু কোন উত্তর দিল না।

তাহার উত্তর দিল বিলাস। সে রুক্ষ-স্বরে কহিল, আপনি কি তাই মামার হয়ে ঝগড়া করতে এসেছেন না কি? কিন্তু কার সঙ্গে কথা কচ্চেন, সেটা ভুলে যাবেন না।

আগন্তুক হাসিয়া একটুখানি জিভ কাটিয়া কহিল, সে আমি ভুলি নি, এবং ঝগড়া করতেও আসি নি। বরঞ্চ কথাটা আমার বিশ্বাস হয় নি বলেই ভাল ক'রে জেনে যেতে এসেছি।

বিলাস বিদ্রূপের ভঙ্গিতে কহিল, বিশ্বাস হয় নি কেন?

আগন্তুক কহিল, কেমন ক'রে হবে বলুন দেখি? নিরর্থক নিজের প্রতিবেশীর ধর্ম্ম-বিশ্বাসে আঘাত করবেন—এ বিশ্বাস না করাই ত স্বাভাবিক।

ধর্ম্মমত লইয়া তর্ক বিতর্ক বিলাসের কাছে ছেলে-বেলা হইতেই অতিশয় উপাদেয়। সে উৎসাহে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়া, প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপের কণ্ঠে কহিল, আপনার কাছে নিরর্থক বোধ হলেই যে কারও কাছে তার

অর্থ থাক্‌বে না, কিম্বা আপনি ধর্ম্ম বল্‌লেই সকলে তাকে শিরোধার্য্য ক'রে মেনে নেবে, তার কোন হেতু নেই। পুতুলপূজো আমাদের কাছে ধর্ম্ম নয়, এবং তার নিষেধ করাটাও আমরা অন্যায় ব'লে মনে করি নে।

আগন্তুক গভীর বিস্ময়ে বিজয়ার মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, আপনিও কি তাই বলেন নাকি ?

তাহার বিস্ময় বিজয়াকে যেন আঘাত করিল, কিন্তু সে ভাব গোপন করিয়া সে সহজ স্বরেই জবাব দিল, আমার কাছে কি আপনি এর বিরুদ্ধ মন্তব্য শোনবার আশা ক'রে এসেছিলেন ?

বিলাস সগর্ব্বে হাস্য করিয়া কহিল, বোধ হয়। কিন্তু উনি ত বিদেশী লোক—খুব সম্ভব আপনাদের কিছুই জানেন না।

আগন্তুক ক্ষণকাল নীরবে বিজয়ার মুখের প্রতি চাহিয়া থাকিয়া তাহাকেই কহিল, আমি বিদেশী না হলেও, এ গ্রামের লোক নয়—সে কথা ঠিক। তবুও আমি সত্যিই আপনার কাছে এ আশা করি নি। পুতুলপূজো কথাটা আপনার মুখ থেকে বার না হলেও, সাকার-নিরাকার উপাসনার পুরানো ঝগড়া আমি এখানে তুলব না। আপনারা যে ব্রাহ্ম-সমাজের, তা-ও আমি জানি। কিন্তু এ ত সে নয়। গ্রামের মধ্যে এই একটি পূজা। সমস্ত লোক সারা বৎসর এই তিনটি দিনের আশায় পথ চেয়ে ব'সে আছে। বলিয়া আর একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, গ্রাম আপনার—প্রজারা আপনার ছেলে-মেয়ের মত ; আপনার আসার সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের আনন্দ-উৎসব শতগুণ বেড়ে যাবে, এই আশাই ত সকলে করে। কিন্তু তা না হয়ে, এত বড় দুঃখ, এত বড় নিরানন্দ বিনা অপরাধে আপনার দুঃখী প্রজাদের মাথায় নিজে তুলে দেবেন, এ বিশ্বাস করা কি সহজ ? আমি ত বিশ্বাস কর্‌তে পারি নি।

বিজয়া সহসা উত্তর দিতে পারিল না। দুঃখী প্রজাদের নামে তাহার

কোমল চিত্ত ব্যথায় ভরিয়া উঠিল ক্ষণকালের জন্য কেহই কোন কথা কহিতে পারিল না, শুধু বিলাসবাবু বিজয়ার সেই নিঃশব্দ স্নেহার্দ্র-মুখের প্রতি চাহিয়া ভিতরে ভিতরে উষ্ণ এবং উদ্বিগ্ন হইয়া তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে বলিয়া উঠিল, আপনি অনেক কথা কইচেন। সাকার-নিরাকারের তর্ক আপনার সঙ্গে করব, এত অপর্য্যাপ্ত সময় আমাদের নেই। তা সে চুলোয় যাক্, আপনার মামা একটা কেন, একশটা পুতুল গড়িয়ে ঘরে ব'সে পূজো করতে পারেন, তাতে কোন আপত্তি নেই; শুধু কতকগুলো ঢাক-ঢোল-কাঁসি অহোরাত্র ওঁর কানের কাছে পিটে ওঁকে অসুস্থ ক'রে তোলাতেই আমাদের আপত্তি।

আগন্তুক একটুখানি হাসিয়া কহিল, অহোরাত্র ত বাজে না। তা সকল উৎসবেই একটু হৈ-চৈ গণ্ডগোল হয়, বলিয়া বিজয়াকে বিশেষ করিয়া উদ্দেশ করিয়া বলিল, অসুবিধে যদি কিছু হয়, না হয় হ'লই। আপনারা মায়ের জাত, এদের আনন্দের অত্যাচার-উপদ্রব আপনি সইবেন না ত কে সইবে?

বিজয়া তেম্‌নি নিরুত্তরেই বসিয়া রহিল। বিলাস শ্লেষের শুষ্ক হাসি হাসিয়া বলিল, আপনি ত কাজ আদায়ের ফন্দিতে ছেলে-মেয়ের উপমা দিলেন; শুন্‌তেও মন্দ লাগ্‌ল না। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, আপনি নিজেই যদি মুসলমান হয়ে মামার কানের কাছে মহরম সুরু ক'রে দিতেন, তাঁর সেটা ভাল বোধ হ'ত কি? তা সে যাই হোক্, বকাবকি করবার সময় নেই আমাদের, বাবা যে হুকুম দিয়েছেন, তাই হবে। কল্‌কাতা থেকে ওঁকে দেশে এনে, মিছামিছি একরাশ ঢাক-ঢোল-কাঁসর বাজিয়ে ওঁর কানের মাথা খেয়ে ফেল্‌তে আমরা দেব না—কিছুতেই না।

তাহার অভদ্র ব্যঙ্গ ও উষ্মার আতিশয্যে আগন্তুকের চোখের দৃষ্টি প্রখর হইয়া উঠিল। সে বিলাসের মুখের প্রতি চোখ তুলিয়া কহিল, আপনার

বাবা কে এবং তাঁর নিষেধ করবার কি অধিকার আমার জানা নেই ; কিন্তু আপনি যে মহরমের অদ্ভুত উপমা দিলেন, এটা হিন্দুর রোসনচৌকী না হয়ে সেই মুসলমানদের মহরমের কাড়া-নাকাড়ার বাদ্য হ'লে কি করতেন শুনি ? এ শুধু নিরীহ স্বজাতির প্রতি অত্যাচার বৈ ত নয়।

বিলাস অকস্মাৎ চৌকী ছাড়িয়া লাফাইয়া উঠিল। চোখ রাঙাইয়া ভীষণ-কণ্ঠে চেঁচাইয়া কহিল, বাবার সম্বন্ধে তুমি সাবধান হয়ে কথা কও ব'লে দিচ্চি, নইলে এখনি অন্য উপায়ে শিখিয়ে দেব, তিনি কে, এবং তাঁর কি অধিকার!

আগন্তুক আশ্চর্য্য হইয়া বিলাসের মুখের প্রতি চাহিল, কিন্তু ভয়ের চিহ্নমাত্র তাহার মুখে দেখা দিল না। দেখা দিল বিজয়ার মুখে। তাহার বাটীতে বসিয়া তাহারই এক অপরিচিত অতিথির প্রতি এই একান্ত অশিষ্ট আচরণে ক্রোধে লজ্জায় তাহার সমস্ত মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল। আগন্তুক মুহূর্ত্তকালমাত্র বিলাসের মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল ; পরক্ষণেই তাহাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিয়া দিয়া বিজয়ার প্রতি চোখ ফিরাইয়া কহিল, আমার মামা বড়লোক নন, তাঁর পূজার আয়োজন সামান্যই। তবুও এইটিই আপনার দরিদ্র প্রজাদের সমস্ত বছরের একমাত্র আনন্দ-উৎসব। হয় ত আপনার কিছু অসুবিধা হবে, কিন্তু তাদের মুখ চেয়ে কি এটুকু আপনি সহ্য ক'রে নিতে পারবেন না ?

বিলাস ক্রোধে উন্মত্তপ্রায় হইয়া সম্মুখের টেবিলের উপর প্রচণ্ড মুষ্ট্যাঘাত করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, না, পারবেন না, একশবার পারবেন না। কতকগুলো মূর্খ চাষার পাগলামি সহ্য করবার জন্যে কেউ জমিদারী করে না। তোমার আর কিছু বলবার না থাকে ত তুমি যাও—মিথ্যে আমাদের সময় নষ্ট ক'রো না! বলিয়া সে হাত দিয়া দরজা দেখাইয়া দিল।

তাহার উৎকট উত্তেজনায় ক্ষণকালের জন্য আগন্তুক ভদ্রলোকটি যেন হতবুদ্ধি হইয়া গেল। সহসা তাহার মুখে প্রত্যুত্তর যোগাইল না। কিন্তু পিতার কাছে বিজয়া নিষ্ফল শিক্ষা পায় নাই—সে শান্ত ধীর ভাবে বিলাসের মুখের প্রতি চাহিয়া কহিল, আপনার বাবা আমাকে মেয়ের মত ভালবাসেন বলেই এঁদের পূজো নিষেধ করেছেন; কিন্তু আমি বলি, হ'লই বা তিন-চার দিন একটু গোলমাল—

কথা শেষ করিতে না দিয়াই বিলাস তেম্‌নি উচ্চ-কণ্ঠে প্রতিবাদ করিয়া উঠিল—সে অসহ্য গণ্ডগোল! আপনি জানেন না বলেই—

বিজয়া হাসিমুখে বলিল, তা হোক্ গণ্ডগোল—তিন দিন বৈ ত নয়! আর আপনি আমার অসুবিধের ভাবনা ভাবচেন—কিন্তু কলকাতা হ'লে কি কর্‌তেন বলুন ত? সেখানে অষ্ট-প্রহর কেউ কানের পাশে তোপ দাগ্‌তে থাকলেও চুপ ক'রে সহ্য কর্‌তে হ'তো? বলিয়া আগন্তুক যুবকটির পানে চাহিয়া হাসিয়া কহিল, আপনার মামাকে জানাবেন, তিনি প্রতিবার যেমন করেন, এবারেও তেম্‌নি পূজো করুন, আমার বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই।

আগন্তুক এবং বিলাসবাবু উভয়েই বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া বিজয়ার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল।

আপনি তবে এখন আসুন, বলিয়া বিজয়া হাত তুলিয়া ক্ষুদ্র একটি নমস্কার করিল। অপরিচিত ভদ্রলোকটিও আপনাকে সংবরণ করিয়া লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং ধন্যবাদ ও প্রতি-নমস্কার করিয়া এবং বিলাসকেও একটি নমস্কার করিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল। অবশ্য ক্রুদ্ধ বিলাস আর একদিকে চক্ষু ফিরাইয়া তাহা অগ্রাহ্য করিল; কিন্তু দুজনের কেহই জানিতে পারিল না যে, এই অপরিচিত যুবকটিই তাহাদের সর্ব্বপ্রধান আসামী জগদীশের পুত্র নরেন্দ্রনাথ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সে চলিয়া গেলে, মিনিট-খানেক বিজয়া অন্যমনস্ক ও নীরব থাকিয়া সহসা সচকিত হইয়া মুখ তুলিতেই, নিতান্ত অকারণেই তাহার কপোলের উপর একটা ক্ষীণ আরক্ত আভা দেখা দিল। বিলাসের দৃষ্টি অন্যত্র নিবদ্ধ না থাকিলে, তাহার বিস্ময় ও অভিমানের হয় ত পরিসীমা থাকিত না। বিজয়া মৃদু হাসিয়া কহিল, আমাদের কথাটা যে শেষ হতেই পেলে না। তা হ'লে তালুকটা নেওয়াই আপনার বাবার মত?

বিলাস জানালার বাহিরে চাহিয়াছিল—সেই ভাবেই কহিল, হুঁ।

বিজয়া জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু এর মধ্যে কোন রকম গোলমাল নেই ত?

বিলাস বলিল, না।

বিজয়া পুনরায় প্রশ্ন করিল, আজ কি তিনি ও-বেলায় এদিকে আস্‌বেন?

বিলাস কহিল, বলতে পারি নে।

বিজয়া হাসিয়া কহিল, আপনি রাগ কর্‌লেন নাকি?

এবার বিলাস মুখ ফিরাইয়া গম্ভীরভাবে জবাব দিল, রাগ না করলেও পিতার অপমানে পুত্রের ক্ষুণ্ণ হওয়া বোধ করি অস্বাভাবিক নয়।

কথাটা বিজয়াকে আঘাত করিল; তবু সে হাসিমুখেই কহিল, কিন্তু এতে তাঁর মানহানি হয়েছে—এ ভুল ধারণা আপনার কি ক'রে জন্মাল? তিনি স্নেহ-বশে মনে করেছেন, আমার কষ্ট হবে, কিন্তু কষ্ট হবে না, এইটেই শুধু ভদ্রলোককে জানিয়ে দিলুম। এতে মান-অপমানের কথা ত কিছুই নেই বিলাসবাবু।

বিলাসের গাম্ভীর্য্যের মাত্রা তাহাতে বিন্দুমাত্র কমিল না; সে মাথা নাড়িয়া উত্তর দিল, ওটা কথাই নয়। বেশ, আপনার এষ্টেটের দায়িত্ব

নিজে নিতে চান্ নিন্ ; কিন্তু এর পরে বাবাকে আমায় সাবধান ক'রে দিতেই হবে, নইলে পুত্রের কর্ত্তব্যে আমার ত্রুটি হবে।

এই অচিন্ত্যনীয় রূঢ় প্রত্যুত্তরে বিজয়া বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া রহিল। এবং কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে থাকিয়া অত্যন্ত ব্যথার সহিত কহিল, বিলাসবাবু, এই সামান্য বিষয়টাকে যে আপনি এমন ক'রে নিয়ে এত গুরুতর ক'রে তুল্‌বেন, এ আমি মনেও করি নি! ভাল, আমার বোঝ্‌বার ভুলে যদি অন্যায়ই ক'রে থাকি, আমি অপরাধ স্বীকার কর্‌ছি, ভবিষ্যতে আর হবে না। বলিয়া বিজয়া বিলাসের মুখের প্রতি চাহিয়া একটা নিশ্বাস ফেলিল। সে ভাবিয়াছিল, ইহার পরে কাহারও কোন কথাই আর থাকিতে পারে না—দোষ-স্বীকারের সঙ্গে সঙ্গেই তাহার সমাপ্তি হইয়া যায়। কিন্তু এ সংবাদ তাহার জানা ছিল না যে, দুষ্ট ব্রণের মত এমন মানুষও আছে, যাহার বিষাক্ত ক্ষুধা একবার কাহারও ত্রুটির মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিলে আর কোন মতেই নিবৃত্ত হইতে চাহে না। তাই বিলাস যখন প্রত্যুত্তরে কহিল, তা হ'লে পূর্ণ গাঙ্গুলিকে জানিয়ে পাঠান যে, রাসবিহারীবাবু যে হুকুম দিয়েছেন, তার অন্যথা করা আপনার সাধ্য নয়, তখন বিজয়ার দৃষ্টির সম্মুখে এই লোকটির হিংস্র প্রকৃতিটা এক মুহূর্ত্তেই একেবারে উদ্ভাসিত হইয়া দেখা দিল। সে কিছুক্ষণ নিঃশব্দে চাহিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে কহিল, সেটা কি ঢের বেশি অন্যায় কাজ হবে না? আচ্ছা, আমি নিজেই না হয় চিঠি লিখে তাঁর অনুমতি নিচ্চি।

বিলাস বলিল, এখন অনুমতি নেওয়া-না-নেওয়া দুই-ই সমান। আপনি যদি তাঁকে সমস্ত গ্রামের মধ্যে অশ্রদ্ধার পাত্র ক'রে তুল্‌তে চান, আমাকেও তা হ'লে অত্যন্ত অপ্রিয় কর্ত্তব্য পালন কর্‌তে হবে।

বিজয়ার অন্তরটা অকস্মাৎ ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল; কিন্তু সে আত্মসংযম করিয়া ধীরভাবে প্রশ্ন করিল, এই কর্ত্তব্যটা কি শুনি?

বিলাস বলিল, আপনার জমিদারী-শাসনের মধ্যে তিনি যেন আর হাত না দেন।

আপনার নিষেধ তিনি শুন্‌বেন, আপনি মনে করেন?

অন্ততঃ সেই চেষ্টাই আমাকে কর্‌তে হবে।

বিজয়া ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া অন্য দিকে চাহিয়া, তেমনি শান্ত কণ্ঠেই জবাব দিল, বেশ, আপনি যা পারেন, কর্‌বেন; কিন্তু অপরের ধর্ম্ম-কর্ম্মে আমি বাধা দিতে পার্‌ব না।

তাহার কণ্ঠস্বরের মৃদুতা সত্ত্বেও তাহার ভিতরের ক্রোধ গোপন রহিল না। বিলাস তীব্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, আপনার বাবা কিন্তু এ কথা বল্‌তে সাহস কর্‌তেন না।

বিজয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়া চোখ তুলিয়া তাহার মুখের প্রতি চাহিল; কহিল, আমার বাবার কথা আপনার চেয়ে আমি ঢের বেশি জানি বিলাসবাবু! কিন্তু সে নিয়ে তর্ক ক'রে কি হবে? আমার স্নানের বেলা হ'ল, আমি উঠ্‌লুম। বলিয়া সে সমস্ত বাগবিতণ্ডা জোর করিয়া বন্ধ করিয়া দিয়া, উঠিয়া দাঁড়াইবামাত্রই ক্রোধোন্মত্ত বিলাসের মুখের উপর হইতে তাহার ধার-করা ভদ্রতার মুখোস একমুহূর্ত্তে খসিয়া পড়িল। সে নিজেও স্বভাবটাকে একেবারে অনাবৃত উলঙ্গ করিয়া দিয়া নিরতিশয় কটু-কণ্ঠে বলিয়া ফেলিল, মেয়েমানুষ জাতটাই এম্‌নি নেমকহারাম।

বিজয়া পা বাড়াইয়াছিল, বিদ্যুদ্বেগে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া পলকমাত্র এই বর্ব্বরটার মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া, নিঃশব্দে ধীরে ধীরে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল; এবং সঙ্গে সঙ্গেই বিলাস শুষ্ক হইয়া উঠিল।

সে যে পিতৃভক্তির আতিশয্যবশতই বিবাদ করিতেছিল, এ ভ্রম যেন কেহ না করেন। এ সকল লোকের স্বভাবই এই যে ছিদ্র পাইলেই তাহাকে নিরর্থক বড় করিয়া দুর্ব্বলকে পীড়া দিতে, ভীতকে আরও ভয়

দেখাইয়া ব্যাকুল করিয়া তুলিতেই আনন্দ অনুভব করে—তা সে যাই হোক, এবং হেতু যত অসংলগ্নই হোক্। কিন্তু বিজয়া যখন তিলার্দ্ধ অবনত না হইয়া তাহাকেই তুচ্ছ করিয়া দিয়া ঘৃণাভরে চলিয়া গেল, তখন এই গায়ে-পড়া কলহের সমস্ত ক্ষুদ্রতা তাহাকে তাহার নিজের কাছেও অত্যন্ত ছোট করিয়া ফেলিল। সে খানিকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া, মুখখানা কালি করিয়া আস্তে আস্তে বাড়ি চলিয়া গেল।

অপরাহ্ণ-কালে রাসবিহারী ছেলে সঙ্গে করিয়া দেখা করিতে আসিলেন। বলিলেন, কাজটা ভাল হয় নি মা। আমার হুকুমের বিরুদ্ধে হুকুম দেওয়ায় আমাকে ঢের বেশি অপ্রতিভ করা হয়েছে। তা যাক্, বিষয় যখন তোমার, তখন এ কথা নিয়ে আর অধিক ঘাঁটাঘাঁটি করতে চাই নে। কিন্তু বারংবার এ রকম ঘট্‌লে আত্মসম্মান বজায় রাখ্‌বার জন্যে আমাকে তফাৎ হতেই হবে, তা জানিয়ে রাখ্‌ছি।

বিজয়া কোন উত্তর দিল না; বরঞ্চ মৌনমুখে সে অপরাধটা একরকম স্বীকার করিয়া লইল। রাসবিহারী তখন কোমল হইয়া বিষয়-সংক্রান্ত অন্যান্য কথাবার্ত্তা তুলিলেন। নূতন তালুকটা খরিদ করিবার আলোচনা শেষ করিয়া বলিলেন, জগদীশের দরুণ বাড়িটা যখন তুমি সমাজকেই দান কর্‌লে মা, তখন আর বিলম্ব না ক'রে এই পূজোর ছুটিটা শেষ হলেই তার দখল নিতে হবে—কি বল?

বিজয়া ঘাড় নাড়িয়া কহিল, আপনি যা ভাল বুঝবেন, তাই হবে। টাকা পরিশোধ কর্‌বার মিয়াদ ত তাঁদের শেষ হয়ে গেছে।

রাসবিহারী কহিলেন, অনেক দিন। জগদীশ তার সমস্ত খুচরা ঋণ একত্র কর্‌বার জন্যে তোমার বাবার কাছে আট বছরের কড়ারে দশ হাজার টাকা কর্জ্জ নিয়ে কবালা লিখে দেয়। সর্ত্ত ছিল, এর মধ্যে শোধ দিতে পারে, ভালই; না পারে, তার বাড়ি-বাগান-পুকুর—তার সমস্ত

সম্পত্তিই আমাদের। তা আট বৎসর পার হয়ে এটা ত নয় বৎসর চল্‌ছে মা।

বিজয়া কিছুক্ষণ অধোমুখে নীরবে বসিয়া থাকিয়া মৃদুকণ্ঠে কহিল, শুন্‌তে পাই, তাঁর ছেলে এখানে আছেন; তাঁকে ডেকে আরো কিছুদিন সময় দিয়ে দেখ্‌লে হয় না, যদি কোন উপায় করতে পারেন?

রাসবিহারী মাথা নাড়িতে নাড়িতে কহিলেন, তা পারবে না—পারবে না। পার্‌লে—

পিতার কথাটা শেষ না হতেই বিলাস হঠাৎ গর্জ্জন করিয়া উঠিল। এতক্ষণ সে কোনরূপে ধৈর্য্য ধরিয়া ছিল, আর পারিল না। কর্কশ-স্বরে বলিয়া উঠিল, পার্‌লেই বা আমরা দেব কেন? টাকা নেবার সময় সে মাতালটার হুঁস ছিল না—কি সর্ত্ত কর্‌ছি? এ শোধ দেব কি ক'রে?

বিজয়া বিলাসের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করিয়াই রাসবিহারীর মুখের দিকে চাহিয়া শান্ত-দৃঢ়কণ্ঠে কহিল, তিনি আমার বাবার বন্ধু ছিলেন; তাঁর সম্বন্ধে সসম্মানে কথা কইতে বাবা আমাকে আদেশ ক'রে গেছেন।

বিলাস পুনরায় তর্জ্জন করিয়া উঠিল—হাজার ক'রে গেলেও সে যে একটা—

রাসবিহারী বাধা দিয়া উঠিলেন, তুমি চুপ কর না বিলাস।

বিলাস জবাব দিল, এ সব বাজে Sentiment আমি কিছুতে সইতে পারি নে—তা সে কেউ রাগই করুক, আর যাই করুক। আমি সত্য কথা বল্‌তে ভয় পাই নে, সত্য কাজ করতে পেছিয়ে দাঁড়াই নে।

রাসবিহারী উভয় পক্ষকেই শান্ত করিবার অভিপ্রায়ে হাসিবার মত মুখ করিয়া বার বার মাথা নাড়িতে নাড়িতে বলিতে লাগিলেন, তা বটে, তা বটে! আমাদের বংশের এই স্বভাবটা আমারও গেল না কি না!

বুঝ্‌লে না মা বিজয়া, আমি আর তোমার বাবা এই জন্যেই সমস্ত দেশের বিরুদ্ধে সত্য-ধর্ম্ম গ্রহণ কর্‌তে ভয় পাই নি।

বিজয়া কহিল, বাবা মৃত্যুর পূর্ব্বে আমাকে আদেশ করে গিয়েছিলেন, ঋণের দায়ে তাঁর বাল্যবন্ধুর বাড়িঘর যেন বিক্রী ক'রে না নিই। বলিতে বলিতেই তাহার চোখ ছল্ ছল্ করিয়া উঠিল। স্নেহময় পিতার যে অনুরোধ তাঁহার জীবিতকালে অসঙ্গত খেয়াল বলিয়াই বোধ হইয়াছিল, তাঁহার মৃত্যুর পরে আজ তাহাই দুরতিক্রম্য আদেশের মত তাহাকে বাধা দিতেছিল।

বিলাস কহিল, তবে তিনিই কেন সমস্ত দেনাটা নিজে ছেড়ে দিয়ে গেলেন না শুনি?

বিজয়া তাহার কোন উত্তর না দিয়া, রাসবিহারীর মুখের প্রতি চাহিয়া পুনরায় কহিল, জগদীশবাবুর পুত্রকে ডাকিয়ে পাঠিয়ে সমস্ত কথা জানানো হয়, এই আমার ইচ্ছে।

তিনি জবাব দিবার পূর্ব্বেই বিলাস নির্লজ্জের মত আবার বলিয়া উঠিল, আর সে যদি আরো দশ বৎসর সময় চায়? তাই দিতে হবে না কি? তা হ'লে দেশে সমাজ-প্রতিষ্ঠার আশা সাগরের অতল-গর্ভে বিসর্জ্জন দিতে হবে দেখছি।

বিজয়া ইহারও কোন উত্তর না দিয়া রাসবিহারীকেই লক্ষ্য করিয়া কহিল, আপনি একবার তাঁকে ডেকে পাঠিয়ে, এ বিষয়ে তাঁর কি ইচ্ছা জান্‌তে পার্‌বেন না কি?

রাসবিহারী অতিশয় ধূর্ত্ত লোক; তিনি ছেলের ঔদ্ধত্যের জন্য মনে মনে বিরক্ত হইলেও, বাহিরে তাহারই মতটাকে সমীচীন প্রমাণ করিবার জন্য একটুখানি ভূমিকাচ্ছলে শান্ত-ধীরভাবে কহিলেন, দেখ মা, তোমাদের মতান্তরের মধ্যে তৃতীয় ব্যক্তির কথা কওয়া উচিত নয়। কারণ কিসে

তোমাদের ভাল, সে আজ না হয় কাল তোমরাই স্থির ক'রে নিতে পারবে, এ বুড়োর মতামতের আবশ্যক হবে না; কিন্তু কথা যদি বল্‌তে হয় মা, বল্‌তেই হবে—এ-ক্ষেত্রে তোমারই ভুল হ'চ্ছে। জমিদারী চালাবার কাজে আমাকেও বিলাসের কাছে হার মানতে হয়—সে আমি অনেকবার দেখেছি। আচ্ছা, তুমিই বল দেখি, কার গরজ বেশি, তোমার না জগদীশের ছেলের? তার ঋণ পরিশোধের সাধ্যই যদি থাকবে, সে কি নিজে এসে একবার চেষ্টা ক'রে দেখত না? সে ত জানে, তুমি এসেছ। এখন আমরাই যদি উপযাচক হয়ে তাকে ডাকিয়ে পাঠাই, সে নিশ্চয়ই একটা বড় রকমের সময় নেবে, কিন্তু তাতে ফল শুধু এই হবে যে, সে টাকাও দিতে পার্‌বে না, তোমাদের সমাজ-প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্পও চিরদিনের জন্যে ডুবে যাবে। বেশ ক'রে ভেবে দেখ দেখি মা, এই কি ঠিক নয়?

বিজয়া নীরবে বসিয়া রহিল। তাহার মনের ভাব অনুমান করিয়া বৃদ্ধ রাসবিহারী ক্ষণকাল পরে কহিলেন, বেশ ত, তার অগোচরে ত কিছুই হ'তে পার্‌বে না। তখন নিজে যদি সে সময় চায়, তখন না হয় বিবেচনা ক'রেই দেখা যাবে। কি বল মা?

বিজয়া ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, আচ্ছা। কিন্তু তথাপি তাহার মুখের চেহারা দেখিয়া স্পষ্ট বুঝা গেল, সে মনে মনে এই প্রস্তাব অনুমোদন করে নাই। রাসবিহারী আজ বিজয়াকে চিনিলেন। তিনি নিশ্চয় বুঝিলেন, এ মেয়েটির বয়স কম কিন্তু সে যে তাহার পিতার বিষয়ের মালিক ইহা সে জানে, এবং তাহাকে মুঠোর ভিতরে আনিতেও সময় লাগিবে। সুতরাং একটা কথা লইয়াই বেশি টানা-হেচড়া সঙ্গত নয় বিবেচনা করিয়া সান্ধ্য-উপাসনার নাম করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন। বিজয়া প্রণাম করিয়া নিঃশব্দে আসন ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। তিনি আশীর্ব্বাদ

করিয়া বাহির হইয়া গেলেন। বিজয়া মুহূর্ত্তকাল মাত্র চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া কহিল, আমার অনেকগুলো চিঠি-পত্র লিখতে আছে—আপনার কি আমাকে কোন আবশ্যক আছে ?

বিলাস রূঢ়ভাবে জবাব দিল, কিছু না। আপনি যেতে পারেন।

আপনাকে চা পাঠিয়ে দিতে বল্‌ব কি ?

না, দরকার নেই।

আচ্ছা নমস্কার, বলিয়া বিজয়া দুই করতল একবার একত্র করিয়াই ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

দিঘড়ার স্বর্গীয় জগদীশবাবুর বাড়িটা সরস্বতীর পরপারে। ইহা গ্রামান্তরে হইলেও নদী তীরের কতকগুলি বাঁশঝাড়ের জন্যই বনমালী-বাবুর বাটীর ছাদ হইতে তাহা দেখা যাইত না। তখন শরৎকালের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে সরস্বতীর বর্ষা-বর্দ্ধিত জলটুকুও নিঃশেষ হইয়া আসিতেছিল, এবং তীরের উপর দিয়া কৃষকদের গমনাগমনের পথটিও পায়ে পায়ে শুকাইয়া কঠিন হইয়া উঠিতেছিল। এই পথের উপর দিয়া আজ অপরাহ্ণ-বেলায় বিজয়া বৃদ্ধ দরওয়ান কান্‌হাইয়া সিংকে সঙ্গে করিয়া বেড়াইতে বাহির হইয়াছিল। ও-পারের বাব্‌লা, বাঁশ, খেজুর প্রভৃতি গাছপালার পাতার ফাঁক দিয়া অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যের আরক্ত-আভা মাঝে মাঝে তাহার মুখের উপর আসিয়া পড়িতেছিল। সে অন্যমনস্ক-দৃষ্টিতে উভয় তীরের এটা-ওটা-সেটা দেখিতে দেখিতে বরাবর উত্তরমুখে চলিতে চলিতে হঠাৎ একস্থানে তাহার চোখ পড়িল—নদীর মধ্যে গোটা-কয়েক বাঁশ একত্র করিয়া পরপারের জন্য সেতু প্রস্তুত করা হইয়াছে। এইটি

ভাল করিয়া দেখিবার জন্য বিজয়া জলের ধারে আসিয়া দাঁড়াইতেই দেখিতে পাইল, অনতিদূরে বসিয়া একজন অত্যন্ত নিবিষ্ট চিত্তে মাছ ধরিতেছে। সাড়া পাইয়া লোকটি মুখ তুলিয়া নমস্কার করিল। ঠিক সেই সময়ে বিজয়ার মুখের উপর সূর্য্যরশ্মি আসিয়া পড়িল কি না, জানি না; কিন্তু চোখাচোখি হইবামাত্রই তাহার গৌরবর্ণ মুখখানি একেবারে যেন রাঙা হইয়া গেল। যে মাছ ধরিতেছিল, সে পূর্ণবাবুর সেই ভাগিনেয়টি, যে সেদিন মামার হইয়া তাহার কাছে দরবার করিতে আসিয়াছিল। বিজয়া প্রতি-নমস্কার করিতেই সে কাছে আসিয়া হাসি-মুখে কহিল, বিকেল-বেলায় একটুখানি বেড়াবার পক্ষে নদীর ধারটা মন্দ জায়গা নয় বটে, কিন্তু এই সময়টা ম্যালেরিয়ার ভয়ও কম নেই। এ বুঝি আপনাকে কেউ সাবধান ক'রে দেয় নি?

বিজয়া ঘাড় নাড়িয়া কহিল, না; এবং পরক্ষণেই আত্মসংবরণ করিয়া লইয়া মৃদু হাসিয়া বলিল, কিন্তু ম্যালেরিয়া ত লোক চিনে ধরে না। আমি ত বরং না জেনে এসেচি, আপনি যে জেনে-শুনে জলের ধারে ব'সে আছেন? কৈ দেখি, কি মাছ ধরলেন?

লোকটি হাসিয়া কহিল, পুঁটি মাছ। কিন্তু দুঘণ্টায় মাত্র দুটি পেয়েচি। মজুরি পোষায় নি। কিন্তু কি করি বলুন; আপনার মত আমিও প্রায় বিদেশী বল্‌লেই হয়। বাইরে বাইরে দিন কেটেছে, প্রায় কারুর সঙ্গেই তেমন আলাপ-পরিচয় নেই—কিন্তু বিকেলটা ত যা ক'রে হোক কাটাতে হবে?

বিজয়া ঘাড় নাড়িয়া সহাস্যে কহিল, আমারও প্রায় সেই দশা। আপনাদের বাড়ি বুঝি পূর্ণবাবুর বাড়ির কাছেই?

লোকটী কহিল, না। হাত দিয়া নদীর ওপারে দেখাইয়া বলিল, আমাদের বাড়ি ঐ দিঘড়ায়। এই বাঁশের পুল দিয়ে যেতে হয়।

গ্রামের নাম শুনিয়া বিজয়া জিজ্ঞাসা করিল, তা হ'লে বোধ হয় জগদীশবাবুর ছেলে নরেনবাবুকে আপনি চেনেন ?

লোকটি মাথা নাড়িবামাত্রই বিজয়া একান্ত কৌতূহল-বশে সহসা প্রশ্ন করিয়া ফেলিল, তিনি কি রকম লোক, আপনি বল্‌তে পারেন ?

কিন্তু বলিয়া ফেলিয়াই নিজের অভদ্র প্রশ্নে অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া উঠিল। এই লজ্জা লোকটির দৃষ্টি এড়াইল না। সে হাসিয়া বলিল, তার বাড়ি ত আপনি দেনার দায়ে কিনে নিয়েছেন ; এখন তার সম্বন্ধে অনুসন্ধান ক'রে আর ফল কি ? কি যে সদুদ্দেশ্যে নিলেন, সে কথাও এ অঞ্চলের সবাই শুনেছে।

বিজয়া জিজ্ঞাসা করিল, একেবারে নেওয়া হয়ে গেছে—এই বুঝি এদিকে রাষ্ট্র হয়ে গেছে !

লোকটি বলিল, হবারই কথা। জগদীশবাবুর সর্ব্বস্ব আপনার বাবার কাছে বিক্রী কবলায় বাঁধা ছিল। তাঁর ছেলের সাধ্য নেই, তত টাকা শোধ করেন—মিয়াদও শেষ হয়েছে—খবর সবাই জানে কি না।

বাড়িটি কেমন ?

মন্দ নয়, বেশ বড় বাড়ি। যে জন্যে নিচ্চেন, তার পক্ষে ভালই হবে। চলুন না, আর একটু এগিয়ে গেলেই দেখতে পাওয়া যাবে।

চলিতে চলিতে বিজয়া কহিল, আপনি যখন গ্রামের লোক, তখন নিশ্চয় সমস্ত জানেন। আচ্ছা, শুনেছি, নরেনবাবু বিলেত থেকে ভাল ক'রেই ডাক্তারি পাশ ক'রে এসেছেন। কোন ভাল জায়গায় প্র্যাক্‌টিস আরম্ভ ক'রে আরও কিছুদিন সময় নিয়েও কি বাপের ঋণটা শোধ করতে পারেন না ?

লোকটি ঘাড় নাড়িয়া কহিল, সম্ভব নয়। শুনেছি, চিকিৎসা করাই নাকি তার সঙ্কল্প নয়।

বিজয়া বিস্মিত হইয়া কহিল, তবে তাঁর সঙ্কল্পটাই বা কি শুনি ? এত খরচ-পত্র ক'রে বিলেত গিয়ে কষ্ট ক'রে ডাক্তারি শেখ্‌বার ফলটাই বা কি হ'তে পারে। লোকটি বোধ হয় একেবারেই অপদার্থ।

ভদ্রলোক একটুখানি হাসিয়া বলিল, অসম্ভব নয়। তবে শুনেছি নাকি নরেনবাবু নিজে চিকিৎসা ক'রে রোগ সারানোর চেয়ে, এমন কিছু একটা নাকি বার ক'রে যেতে চান যাতে ঢের—ঢের বেশি লোকের উপকার হবে। শুন্‌তে পাই, নানাপ্রকার যন্ত্র-পাতি নিয়ে দিনরাত পরিশ্রমও খুব করেন।

বিজয়া চকিত হইয়া কহিল, সে ত ঢের বড় কথা। কিন্তু তাঁর বাড়ি-ঘর-দোর গেলে কি ক'রে এ সব কর্‌বেন ? তখন ত রোজগার করা চাই। আচ্ছা, আপনি ত নিশ্চয় বল্‌তে পারেন, বিলেত যাওয়ার জন্যে এখানকার লোকে তাঁকে 'একঘরে' করে রেখেছে কি না।

ভদ্রলোক কহিল, সে ত নিশ্চয়ই। আমার মামা পূর্ণবাবু তারও ত একপ্রকার আত্মীয় তবুও পূজোর কদিন বাড়িতে ডাকতে সাহস করেন নি। কিন্তু তাতে তাঁর কিছুই আসে যায় না। নিজের কাজ-কর্ম্ম নিয়ে আছেন, সময় পেলে ছবি আঁকেন—বাড়ি থেকে বারই হন না। ঐ তাঁর বাড়ি, বলিয়া আঙুল দিয়া গাছ-পালায় ঘেরা একটা বৃহৎ অট্টালিকা দেখাইয়া দিল।

এই সময়ে বুড়া দরওয়ান পিছন হইতে ভাঙ্গা-বাঙ্‌লায় জানাইল যে, অনেকদূর আসিয়া পড়া হইয়াছে, বাটী ফিরিতে সন্ধ্যা হইয়া যাইবে।

লোকটি ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, হাঁ, কথায় কথায় অনেক পথ এসে পড়েছেন।

তাহাকেও সেই বাঁশের সেতু দিয়াই গ্রামে ঢুকিতে হইবে, সুতরাং ফিরিবার মুখেও সঙ্গে সঙ্গে আসিতে লাগিল। বিজয়া মনে মনে ক্ষণকাল কি যেন চিন্তা করিয়া কহিল, তা হ'লে তাঁর কোন আত্মীয়-কুটুম্বের ঘরেও আশ্রয় পাবার ভরসা নেই বলুন ?

লোকটি কহিল, একেবারেই না।

বিজয়া আবার কিছুক্ষণ চুপ করিয়া চলিয়া কহিল, তিনি যে কারও কাছে যেতে চান না, সে কথা ঠিক। নইলে এই মাসের শেষেই ত তাঁকে বাড়ি ছেড়ে দেওয়ার নোটিশ দেওয়া হয়েছে—আর কেউ হ'লে অন্ততঃ আমাদের সঙ্গেও একবার দেখা করার চেষ্টা করতেন।

লোকটি বলিল, হয় ত তার দরকার নেই—নয় ভাবেন, লাভ কি! আপনি ত আর সত্যিই তাঁকে বাড়িতে থাকতে দিতে পারবেন না!

বিজয়া কহিল, না পারলেও, আর কিছুকাল থাকতে দিতেও ত পারা যায়। দেনার দায় হাজার হলেও ত একজনকে তার বাড়ি-ছাড়া করতে সকলেরই কষ্ট হয়! কিন্তু আপনার কথাবার্ত্তার ভাবে বোধ হয় যেন তাঁর সঙ্গে আপনার পরিচয় আছে। কি বলেন, সত্যি নয়?

লোকটি শুধু হাসিল, কোন কথা কহিল না। পুলটির কাছেই তাহারা আসিয়া পড়িয়াছিল। সে ছোট ছিপটি কুড়াইয়া লইয়া কহিল, এই আমাদের গ্রামে ঢোকবার পথ। নমস্কার। বলিয়া হাত তুলিয়া নমস্কার করিয়া সেই বংশ-নির্ম্মিত পুলটির উপর দিয়া টলিতে টলিতে কোনমতে পার হইয়া সঙ্কীর্ণ বন্য-পথের ভিতরে অদৃশ্য হইয়া গেল।

বহুদিনের বৃদ্ধ ভৃত্য কানাই সিং বিজয়াকে শিশুকালে কোলে-পিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছিল, এবং সেই সঙ্গে সে দরওয়ানীর ন্যায্য অধিকারকেও বহুদূর অতিক্রম করিয়া গিয়াছিল। সে কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, এ বাবুটি কে মাইজী?

বিজয়া কিন্তু এতটাই বিমনা হইয়া পড়িয়াছিল যে, বুড়ার প্রশ্ন তাহার কানেই পৌছিল না। সেই প্রায়ান্ধকার নদীতটের সমস্ত নীরব মাধুর্য্যকে সে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া স্বপ্নাবিষ্টের মত শুধু এই কথা ভাবিতে ভাবিতেই পথ চলিতে লাগিল—লোকটি কে, এবং আবার কবে দেখা হইবে?

সপ্তম পরিচ্ছেদ

রাসবিহারী বলিলেন, আমরাই নোটিশ দিয়েছি, আবার আমরাই যদি তাকে রদ্ করতে যাই, আর পাঁচজন প্রজার কাছে সেটা কি-রকম দেখাবে, একবার দেখ দিকি মা।

বিজয়া কহিল, এই মর্ম্মে একখানা চিঠি লিখে কেন তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিন না। আমার নিশ্চয় বোধ হচ্চে, তিনি শুধু অপমানের ভয়েই এখানে আসতে সাহস করেন না।

রাসবিহারী জিজ্ঞাসা করিলেন, অপমান কিসের?

বিজয়া বলিল, তিনি নিশ্চয় ভেবেছেন, তাঁর প্রার্থনা আমরা মঞ্জুর করব না!

রাসবিহারী বিদ্রূপের ভাবে কহিলেন, মহা মানী লোক দেখচি। তাই অপমানটা ঘাড়ে নিয়ে আমাদের যেচে তাঁকে থাকতে দিতে হবে?

বিজয়া কাতর হইয়া কহিল, তাতেও দোষ নেই কাকাবাবু। অযাচিত দয়া করার মধ্যে কোন লজ্জা নেই।

রাসবিহারী কহিলেন, ভাল, লজ্জা না হয় নেই; কিন্তু আমরা যে সমাজ প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প করেচি, তার কি বল দেখি?

বিজয়া বলিল, তার অন্য কোন ব্যবস্থাও আমরা করতে পারব!

রাসবিহারী মনে মনে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া প্রকাশ্যে একটু হাসিয়া বলিলেন, তোমার বাবা যথেষ্ট টাকা রেখে গেছেন, তুমি অন্য ব্যবস্থাও করতে পার, সে আমি বুঝলুম; কিন্তু এই কথাটা আমাকে বুঝিয়ে দাও দেখি মা, যাকে আজ পর্য্যন্ত চোখেও দেখ নি, আমাদের সকলের অনুরোধ এড়িয়ে তার জন্যেই বা তোমার অত ব্যথা কেন? ভগবানের করুণায় তোমার আরও পাঁচজন প্রজা আছে, আরও দশজন খাতক

আছে ; তাদের সকলের জন্যেই কি এ ব্যবস্থা করতে পারবে, না, পারলেই তাতে মঙ্গল হবে—সে জবাব আমাকে দাও দেখি বিজয়া ?

বিজয়া কহিল, আপনাকে ত বলেচি, এটা বাবার শেষ অনুরোধ। তা ছাড়া আমি শুনেচি—

কি শুনেচ ?

বিদ্রূপের ভয়ে তাহার চিকিৎসা সম্বন্ধে তত্ত্বানুসন্ধানের কথাটা বিজয়া কহিল না, শুধু বলিল, আমি শুনেচি, তিনি 'একঘরে'। গৃহহীন করলে আত্মীয়-কুটুম্ব কারও বাড়িতেই তাঁর আশ্রয় পাবার পথ নেই। তা ছাড়া 'গৃহহীন' কথাটা মনে করলেই আমার ভারি কষ্ট হয় কাকাবাবু।

রাসবিহারী করুণায় গদগদ করিয়া বলিলেন, তোমার এইটুকু বয়সে যদি এই কষ্ট হয়, আমার এতখানি বয়সে সে কষ্ট কত বড় হ'তে পারে, একটু ভেবে দেখ দেখি ? আর আমার দীর্ঘ জীবনে এই কি প্রথম অপ্রিয় কর্ত্তব্যের সুমুখে দাঁড়িয়েছি বিজয়া ? না, তা নয়! কর্ত্তব্য চিরদিনই আমার কাছে কর্ত্তব্য! তার কাছে হৃদয়-বৃত্তির কোন দাবি-দাওয়া নেই। বনমালী যে কঠোর দায়িত্ব আমার উপরে ন্যস্ত ক'রে গেছেন, সে ভার আমাকে জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত বহন করতেই হবে —তাতে যত দুঃখ-কষ্টই না আমাকে ভোগ করতে হোক। হয় আমাকে সমস্ত দায়িত্ব থেকে সম্পূর্ণ অব্যাহতি দাও, নইলে কিছুতেই তোমার এ অসঙ্গত অনুরোধ আমি রাখতে পারব না।

বিজয়া অধোমুখে নীরবে বসিয়া রহিল। পিতার অপরাধে তাহার নিরপরাধ পুত্রকে গৃহ-ছাড়া করার সঙ্কল্প তাহার অন্তরের মধ্যে যে বেদনা দিতে লাগিল, বয়সের অনুপাত করিয়া এই বৃদ্ধ যে তাহার অষ্টগুণ অধিক ব্যথা সহ্য করিয়াও কর্ত্তব্য-পালনে বদ্ধ-পরিকর হইয়াছেন, তাহা সে মনের মধ্যেও ঠিকমত গ্রহণ করিতে পারিল না—বরঞ্চ এ যেন শুধু একজন

নিরুপায় হতভাগ্যের প্রতি প্রবলের একান্ত হৃদয়হীন নিষ্ঠুরতার মতই তাহাকে বাজিতে লাগিল। কিন্তু জোর করিয়া নিজের ইচ্ছা পরিচালনা করিবার সাহসও তাহার নাই। অথচ ইহাও তাহার অগোচর ছিল না যে, পল্লীগ্রামে সমারোহপূর্ব্বক ব্রাহ্ম-মন্দির প্রতিষ্ঠার খ্যাতিলাভের উচ্চা-কাঙ্ক্ষাতেই বৃদ্ধ পিতার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া বিলাসবিহারী এই জিদ্ এবং জবরদস্তি করিতেছে।

রাসবিহারী আর কিছু বলিলেন না। বিজয়াও খানিকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া নীরবে সম্মতি দিল বটে, কিন্তু ভিতরে ভিতরে তাহার পরদুঃখকাতর স্নেহকোমল নারীচিত্ত এই বৃদ্ধের প্রতি অশ্রদ্ধা ও তাহার পুত্রের প্রতি বিতৃষ্ণায় ভরিয়া উঠিল।

রাসবিহারী বিষয়ী লোক; এ কথা তাঁহার অবিদিত ছিল না যে, যে মালিক, তাহাকে তর্কের বেলায় ষোলো আনা পরাজয় করিয়া আদায়ের বেলায় আট আনার বেশি লোভ করিতে নাই। কারণ সে পাওনা শেষ পর্য্যন্ত পাকা হয় না। স্থতরাং দাক্ষিণ্য-প্রকাশের দ্বারা লাভবান হইবার যদি কোন সময় থাকে ত সে এই! বিজয়ার মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, মা, তোমার জিনিষ, তুমি দান করবে, আমি বাদ সাধব কেন? আমি স্থধু এই দেখাতে চেয়েছিলুম যে, বিলাস যা করতে চেয়েছিল, তা স্বার্থের জন্যেও নয়, রাগের জন্যেও নয়, শুধু কর্ত্তব্য বলেই চেয়েছিল। একদিন আমার বিষয়, তোমার বাবার বিষয়—সব এক হয়েই তোমাদের দুজনের হাতে পড়বে; সেদিন বুদ্ধি দেবার জন্যে এ বুড়োকেও খুঁজে পাবে না। সেদিন তোমাদের উভয়ের মতের অমিল না হয়, সেদিন তোমার স্বামীর প্রত্যেক কাজটিকে যাতে অভ্রান্ত ব'লে শ্রদ্ধা করতে পার, বিশ্বাস করতে পার—কেবল এই আমি চেয়েছি। নইলে দান করতে, দয়া করতে সেও জানে, আমিও জানি। কিন্তু সে দান অপাত্রে হ'লে যে

কিছুতে চল্‌বে না, এই শুধু তোমার কাছে আমার প্রমাণ করা। এখন বুঝলে মা, কেন আমরা জগদীশের ছেলেকে একবিন্দু দয়া করতে চাই নি, এবং কেন সে দয়া একেবারে অসম্ভব? বলিয়া বৃদ্ধ সস্নেহ হাস্যে বিজয়ার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। এই পরম সারগর্ভ ও অকাট্য যুক্তিযুক্ত উপদেশাবলীর বিরুদ্ধে তর্ক করা চলে না—বিজয়া নীরবেই বসিয়া রহিল। রাসবিহারী পুনশ্চ কহিলেন, এখন বুঝলে মা বিজয়া, বিলাস ছেলেমানুষ হ'লেও কতদূর পর্য্যন্ত ভবিষ্যৎ ভেবে কাজ করে? ঐ যে তোমাকে বল্‌লুম, আমি ত এই কাজেই চুল পাকালুম, কিন্তু জমিদারীর কাজে ওর চাল্ বুঝ্‌তে আমাকে মাঝে মাঝে স্তম্ভিত হয়ে চিন্তা করতে হয়।

বিজয়া শুধু ঘাড় নাড়িয়া সায় দিল, কথা কহিল না।

সাড়ে চারটে বাজে, বলিয়া রাসবিহারী লাঠিটি হাতে করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, এই সমাজ প্রতিষ্ঠার চিন্তায় বিলাস যে কি রকম উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছে, তা প্রকাশ ক'রে বলা যায় না। তার ধ্যান-জ্ঞান-ধারণা সমস্তই হয়েছে এখন ওই। এখন ঈশ্বরের চরণে কেবল প্রার্থনা আমার এই, যেন সে শুভদিনটি আমি চোখে দেখে যেতে পারি। বলিয়া তিনি দুই হাত যুক্ত করিয়া ব্রহ্মের উদ্দেশে বার বার নমস্কার করিলেন। দ্বারের কাছে আসিয়া তিনি সহসা দাঁড়াইয়া বলিয়া উঠিলেন, ছোক্‌রা একবার আমার কাছে এলেও না হয় যা হোক একটা বিবেচনা করবার চেষ্টা করতুম; কিন্তু তাও ত কখনও—অতি হতভাগা, অতি হতভাগা! বাপের স্বভাব একেবারে ষোলকলায় পেয়েছে দেখতে পাচ্চি, বলিতে বলিতে তিনি বাহির হইয়া গেলেন।

সেইখানে একভাবে বসিয়া বিজয়া কি যে ভাবিতে লাগিল, তাহার ঠিকানা নাই। অকস্মাৎ বাহিরের দিকে নজর পড়ায় যেই দেখিল, বেলা

পড়িয়া আসিতেছে, অমনি নদী-তীরের অস্বাস্থ্যকর বাতাস তাহাকে সজোরে টান্ দিয়া যেন আসন ছাড়িয়া তুলিয়া দিল, এবং আজিও সে বৃদ্ধ দরয়ানজীকে ডাকিয়া লইয়া বায়ুসেবনের ছলে বাহির হইয়া পড়িল।

ঠিক সেইখানে বসিয়া আজিও সেই লোকটি মাছ ধরিতেছিল। অনেকটা দূর হইতে বিজয়া তাহা দেখিতে পাইলেও কাছাকাছি আসিয়া যেন দেখিতেই পায় নাই, এমন ভাবে চলিয়া যাইতেছিল, সহসা কানাই সিং পিছন হইতে ডাক দিয়া উঠিল, সেলাম বাবুজী, শিকার মিলা?

কথাটা কানে যাইবামাত্রই তাহার মূল পর্য্যন্ত বিজয়ার আরক্ত হইয়া উঠিল। যাঁহারা মনে করেন যথার্থ বন্ধুত্বের জন্য অনেকদিন এবং অনেক কথাবার্তা হওয়া চাই-ই, তাঁহাদের এইখানে স্মরণ করাইয়া দেওয়া প্রয়োজন যে, না, তাহা অত্যাবশ্যক নহে। বিজয়া ফিরিয়া দাঁড়াইতেই লোকটি ছিপ রাখিয়া দিয়া নমস্কার করিয়া কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, এবং সহাস্যে কহিল, হাঁ, দেশের প্রতি আপনার সত্যিকারের টান্ আছে বটে। এমন কি, তার ম্যালেরিয়াটা পর্য্যন্ত না নিলে আপনার চল্‌ছে না দেখ্‌ছি।

বিজয়া হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করিল, আপনার নেওয়া হয়ে গেছে বোধ হয়? কিন্তু দেখে ত তা মনে হয় না।

লোকটি বলিল, ডাক্তারদের একটু সবুর ক'রে নিতে হয়। অমন কাড়াকাড়ি—

কথাটা শেষ না হইতেই বিজয়া প্রশ্ন করিল, আপনি ডাক্তার নাকি?

লোকটি অপ্রতিভ হইয়া সহসা উত্তর দিতে পারিল না। কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে সামলাইয়া লইয়া পরিহাসের ভঙ্গীতে কহিল, তা বই কি! একজন কতবড় ডাক্তারের প্রতিবেশী আমরা! সবাইকে দিয়ে-থুয়ে তবে ত আমাদের—কি বলেন?

বিজয়া তৎক্ষণাৎ কোন কথাই বলিল না; ক্ষণকাল চুপ করিয়া

থাকিয়া পরে কহিল, শুধু প্রতিবেশী নয়, তিনি যে আপনার একজন বন্ধু, সে আমি অনুমান করেছিলুম। আমার কথা তাঁকে গল্প করেছেন নাকি?

লোকটি হাসিয়া কহিল, আপনি তাঁকে একটা অপদার্থ হতভাগা মনে করেন, এ ত পুরোনো গল্প—সবাই করে। এ আর নূতন ক'রে বল্‌বার দরকার কি? তবে একদিন হয় ত সে আপনার সঙ্গে দেখা করতে যাবে।

বিজয়া মনে মনে অতিশয় লজ্জিত হইয়া কহিল, আমার সঙ্গে দেখা করায় তাঁর লাভ কি? কিন্তু তাঁর সম্বন্ধে ত আমি এ রকম কথা আপনাকে বলি নি!

না ব'লে থাকৃলেও বলাই ত উচিত ছিল।

উচিত ছিল কেন?

যার বাড়ি-ঘর-দোর বিকিয়ে যায়, তাকে সবাই হতভাগ্য বলে। আমরাও বলি। সুমুখে না পারি, আড়ালেও ত আমরা বল্‌তে পারি।

বিজয়া হাসিতে লাগিল, কহিল, আপনি ত তা হ'লে তার খুব ভাল বন্ধু!

লোকটি ঘাড় নাড়িয়া বলিল, সে ঠিক। এমন কি, তার হয়ে আমি নিজেই আপনাকে ধরতুম, যদি না জানতুম, আপনি সদুদ্দেশ্যেই তার বাড়িখানি গ্রহণ করচেন।

বিজয়া একটীবার মাত্র মুখ তুলিয়া চাহিল, কিন্তু এ সম্বন্ধে কোন কথা কহিল না।

কথায় কথায় আজ তাহারা আরও একটু অধিকদূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া গিয়াছিল। দেখা গেল, ও পারে একদল লোক সার বাঁধিয়া নরেনবাবুর বাটীর দিকে চলিয়াছে। তাহার মধ্যে পঞ্চাশ হইতে পোনর পর্য্যন্ত সকল বয়সের লোকই ছিল। লোকটি দেখাইয়া কহিল, ওরা কোথায় যাচ্চে জানেন? নরেনবাবুর ইস্কুলে পড়তে।

বিজয়া আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, তিনি এ ব্যবসাও করেন না-কি? কিন্তু যতদূর বুঝতে পারছি, বিনা পয়সায়—ঠিক না?

লোকটি হাসিমুখে কহিল, তাকে ঠিক চিনেচেন। অপদার্থ লোকের কোথাও আত্মগোপন করা চলে না। পরে অপেক্ষাকৃত গম্ভীর হইয়া কহিল, নরেন বলে, আমাদের দেশে সত্যিকার চাষী নেই। চাষ করা পৈতৃক পেশা; তাই সময়ে-অসময়ে জমিতে দুবার লাঙ্গল দিয়ে বীজ ছড়িয়ে আকাশের পানে হাঁ ক'রে চেয়ে ব'সে থাকে। একে চাষ করা বলে না, লটারি-খেলা বলে। কোন্ জমিতে কখন্ সার দিতে হয়, কাকে সার বলে, কাকে সত্যিকারের চাষ করা বলে—এ সব জানে না। বিলাতে থাক্‌তে ডাক্তারি পড়ার সঙ্গে এ বিদ্যাটাও সে শিখে এসেছিল। ভাল কথা, একদিন যাবেন তার ইস্কুল দেখ্‌তে? মাঠের মাঝখানে গাছের তলায় বাপ-ব্যাটা-ঠাকুর্দ্দায় মিলে যেখানে পাঠশালা বসে, সেখানে?

যাইবার জন্য বিজয়া তৎক্ষণাৎ উদ্যত হইয়া উঠিল, কিন্তু পরক্ষণেই কৌতূহল দমন করিয়া শুধু কহিল, না থাক্। জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা, অতবড় বাড়ি থাকতে তিনি গাছতলায় পাঠশালা বসান কেন?

লোকটি বলিল, এ সব শিক্ষা ত শুধু কেবল মুখের কথায় বই মুখস্থ করিয়ে দেওয়া যায় না! তাদের হাতে-নাতে চাষ করিয়ে দেখাতে হয় যে, এ জিনিষটা রীতিমত শিখে করলে দুগুণো, এমন কি, চার-পাঁচ-গুণো ফসলও পাওয়া যায়। তার জন্যে মাঠ দরকার, চাষ করা দরকার। কপাল ঠুকে মেঘের পানে চেয়ে হাত পেতে ব'সে থাকা দরকার নয়। এখন বুঝ্‌লেন, কেন তার পাঠশালা গাছতলায় বসে? একবার যদি তার ইস্কুলের মাঠের ফসল দেখেন, আপনার চোখ জুড়িয়ে যাবে, তা নিশ্চয় বল্‌তে পারি। এখনো ত বেলা আছে—আজই চলুন না—ঐ ত দেখা যাচ্ছে।

বিজয়ার মুখের ভাব ক্রমশঃ গম্ভীর এবং কঠিন হইয়া আসিতেছিল; কহিল, না, আজ থাক্।

লোকটি সহজেই বলিল, তবে থাক্। চলুন, খানিকটে আপনাকে এগিয়ে দিয়ে আসি, বলিয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিতে লাগিল। মিনিট পাঁচ-ছয় বিজয়া একটা কথাও কহিল না, ভিতরে ভিতরে কেমন যেন তাহার লজ্জা করিতে লাগিল—অথচ লজ্জার হেতুও সে ভাবিয়া পাইল না। লোকটি পুনরায় কথা কহিল, বলিল, আপনি ধর্ম্মের জন্যই যখন তার বাড়িটা নিচ্চেন—এই ক'বিঘে জমি যখন ভাল কাজেই লাগছে তখন এটা ত আপনি অনায়াসেই ছেড়ে দিতে পারেন? বলিয়া সে মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল।

কিন্তু প্রত্যুত্তরে বিজয়া গম্ভীর হইয়া কহিল, এই অনুরোধ করবার জন্যে তাঁর তরফ থেকে আপনার কোন অধিকার আছে? বলিয়া আড়-চোখে চাহিয়া দেখিল, লোকটির হাসি মুখের কোন ব্যতিক্রম ঘটিল না।

সে বলিল, এ অধিকার দেবার ওপর নির্ভর করে না, নেবার ওপর নির্ভর করে। যা ভাল কাজ, তার অধিকার মানুষ সঙ্গে সঙ্গেই ভগবানের কাছে পায়—মানুষের কাছে হাত পেতে নিতে হয় না। যে অনুগ্রহ প্রার্থনা করার জন্যে আপনি মনে মনে বিরক্ত হলেন, পেলে কারা পেতো জানেন? দেশের নিরন্ন কৃষকেরা। আমাদের শাস্ত্রে আছে, দরিদ্র ভগবানের একটা বিশেষ মূর্ত্তি। তাঁর সেবার অধিকার ত সকলেরই আছে। সে অধিকার নরেনের কাছে চাইতে যাব কেন বলুন, বলিয়া সে হাসিতে লাগিল।

বিজয়া চলিতে চলিতে বলিল, কিন্তু আপনার বন্ধু ত শুধু এই জন্যেই এখানে বসে থাকৃতে পারবেন না?

লোকটি কহিল, না। কিন্তু তিনি হয় ত আমার উপরে এ ভার দিয়ে যেতে পারেন।

বিজয়ার ওষ্ঠাধরে একটা চাপা হাসি খেলা করিয়া গেল ; কিন্তু অত্যন্ত গম্ভীর স্বরে বলিল, সে আমি অনুমান করেছিলুম।

লোকটি বলিল, করবারই কথা কি না। এ সকল কাজ আগে ছিল দেশের ভূস্বামীর। তাঁদের ব্রহ্মোত্তর দিতে হ'ত। এখন সে দায় নেই বটে, কিন্তু তার জের মেটে নি। তাই দু-চার বিঘে কেউ ঠকিয়ে নেবার চেষ্টা করলেই তাঁরা পূর্ব্ব-সংস্কারবশে টের পান। বলিয়া সে আবার হাসিতে লাগিল।

বিজয়া নিজেও এই হাসিতে যোগ দিতে গেল, কিন্তু পারিল না। এই সরল পরিহাস তাহার অন্তরের কোথায় গিয়া বিঁধিয়া রহিল। কিছুক্ষণ নিঃশব্দে চলিয়া হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল, আপনি নিজেও ত আপনার বন্ধুকে আশ্রয় দিতে পারেন?

কিন্তু আমি ত এখানে থাকি নে। বোধ হয় এক সপ্তাহ পরেই চ'লে যাবো।

বিজয়া অন্তরের মধ্যে যেন চম্‌কাইয়া উঠিল ; কহিল, কিন্তু বাড়ি যখন এখানে, তখন নিশ্চয়ই ঘন ঘন যাতায়াত করতে হয়?

লোকটি মাথা নাড়িয়া বলিল, না, আর বোধ হয় আমাকে আসতে হবে না।

বিজয়ার বুকের মধ্যে তোলপাড় করিতে লাগিল। সে মনে মনে বুঝিল, এ সম্বন্ধে অযথা প্রশ্ন করা আর কোন মতেই উচিত হইবে না; কিন্তু কিছুতেই কৌতূহল দমন করিতে পারিল না। ধীরে ধীরে কহিল, এখানে বাড়ির লোকের ভার নেবার লোক আপনার নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু—

লোকটি হাসিয়া বলিল, না, সে রকম লোক কেউ নেই।

তা হ'লে আপনার বাপ-মা—

আমার বাপ-মা, ভাই-বোন কেউ নেই ; এই যে, আপনার বাড়ির

স্বমুখে এসে পড়া গেছে। নমস্কার, আমি চল্‌লুম; বলিয়া সে থমকিয়া দাঁড়াইল।

বিজয়া আর তাহার মুখের পানে চাহিতে পারিল না; কিন্তু মৃদু কণ্ঠে কহিল, ভেতরে আস্‌বেন না?

না, ফিরে যেতে আমার অন্ধকার হয়ে যাবে; নমস্কার।

বিজয়া হাত তুলিয়া প্রতি-নমস্কার করিয়া অত্যন্ত সঙ্কোচের সহিত ধীরে ধীরে বলিল, আপনার বন্ধুকে একবার রাসবিহারীবাবুর কাছে যেতে বল্‌তে পারেন না?

লোকটি বিস্মিত হইয়া বলিল, তাঁর কাছে কেন?

তিনিই বাবার সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি দেখেন কি না।

সে আমি জানি। কিন্তু তাঁর কাছে যেতে কেন বল্‌ছেন?

বিজয়া এ প্রশ্নের আর কোন উত্তর দিতে পারিল না। লোকটি ক্ষণকাল স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া বোধ করি প্রতীক্ষা করিল। পরে কহিল, আমার ফিরতে রাত হয়ে যাবে—আমি আসি, বলিয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

বিজয়াদের বাটী-সংলগ্ন উদ্যানের এই দিকের অংশটা খুব বড়। সুদীর্ঘ আম-কাঁটাল গাছের তলায় তখন অন্ধকার ঘন হইয়া আসিতেছিল; বুড়া দরওয়ান কহিল, মাইজী একটু ঘুরে সদর রাস্তা দিয়ে গেলে ভাল হ'তো না?

এ সকল দিকে দৃষ্টিপাত করিবার মত মনের অবস্থা বিজয়ার ছিল না, সে শুধু একটা 'না' বলিয়াই তাড়াতাড়ি অন্ধকার বাগানের ভিতর দিয়া বাটীর দিকে অগ্রসর হইয়া গেল। যে দুইটা কথা তাহার মনকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল তাহার একটা

এই যে, এত কথাবার্ত্তার মধ্যেও শুধু নারীর পক্ষে ভদ্ররীতি-বিগর্হিত বলিয়াই ইহার নামটা পর্য্যন্ত জানা হইল না। দ্বিতীয়টি এই যে, দুদিন পরে ইনি কোথায় চলিয়া যাইবেন—প্রশ্নটা শতবার মুখে আসিয়া পড়িলেও, শতবারই কেবল লজ্জাতেই মুখে বাধিয়া গেল। ইহার সম্বন্ধে একটা বিষয় প্রথম হইতেই বিজয়ার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল যে, ইনি যেই হোন্ যথেষ্ট সুশিক্ষিত, এবং পল্লীগ্রাম জন্মস্থান হইলেও অনাত্মীয় ভদ্রমহিলার সহিত অসঙ্কোচে আলাপ করিবার শিক্ষা এবং অভ্যাস ইহার আছে। ব্রাহ্ম-সমাজভুক্ত না হইয়াও এ শিক্ষা যে তিনি কি করিয়া কোথায় পাইলেন, ভাবিতে ভাবিতে বাড়িতে পা দিতেই, পরেশের মা আসিয়া জানাইল যে বহুক্ষণ পর্য্যন্ত বিলাস-বাবু বাহিরের বসিবার ঘরে অপেক্ষা করিতেছেন। শুনিবামাত্রই তাহার মন শ্রান্তি ও বিরক্তিতে ভরিয়া উঠিল। এই লোকটি সেই সে দিন রাগ করিয়া গিয়াছিল, আর আসে নাই; কিন্তু আজ যে কারণেই আসিয়া থাক্, যে লোকটির চিন্তায় তাহার অন্তঃকরণ পরিপূর্ণ হইয়াছিল, তাহার কিছুই না জানিয়াও, উভয়ের মধ্যে অকস্মাৎ মনে মনে আকাশ-পাতাল ব্যবধান না করিয়া বিজয়া থাকিতে পারিল না। শ্রান্তকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, আমি বাড়ি এসেছি—তাঁকে জানান হয়েছে পরেশের মা?

পরেশের মা কহিল, না দিদিমণি, আমি এক্ষুণি পরেশকে খবর দিতে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

তিনি চা খাবেন কি না জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল?

ও মা, তা আর হয় নি? তিনি যে বলেছিলেন, তুমি ফিরে এলেই একসঙ্গে হবে।

বিলাসবাবুই যে এ বাটীর ভবিষ্যৎ কর্ত্তৃপক্ষ, এ সংবাদ আত্মীয়-

পরিজন কাহারও অবিদিত ছিল না, এবং সেই হিসাবে আদর-যত্নেরও ত্রুটি হইত না। বিজয়া আর কোন কথা না বলিয়া উপরে তাহার ঘরে চলিয়া গেল। প্রায় মিনিট-কুড়ি পরে সে নিচে আসিয়া খোলা দরজার বাহির হইতে দেখিতে পাইল, বিলাস বাতির সম্মুখে টেবিলের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া কি কতকগুলা কাগজপত্র দেখিতেছে। তাহার পদশব্দে সে মুখ তুলিয়া, ক্ষুদ্র একটি নমস্কার করিয়া, একেবারেই গম্ভীর হইয়া উঠিল। কহিল, তুমি নিশ্চয় ভেবেচ আমি রাগ ক'রে এতদিন আসি নি। যদিও রাগ আমি করি নি, কিন্তু কর্লেও যে সেটা আমার পক্ষে কিছুমাত্র অন্যায় হ'তো না, সে আজ আমি তোমার কাছে প্রমাণ কর্ব।

বিলাস এতদিন পর্য্যন্ত বিজয়াকে আপনি বলিয়া ডাকিত। আজিকার এই আকস্মিক তুমি সম্বোধনের কারণ কিছুমাত্র উপলব্ধি করিতে না পারিলেও যে বিজয়া আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল না, তাহা তাহার মুখ দেখিয়া অনুমান করা কঠিন নয়। কিন্তু সে কোন কথা না কহিয়া ধীরে ধীরে ঘরে ঢুকিয়া অনতিদূরে একটা চৌকি টানিয়া লইয়া উপবেশন করিল। বিলাস সেদিকে ভ্রূক্ষেপ মাত্র না করিয়া কহিল, আমি সমস্ত ঠিক-ঠাক ক'রে এইমাত্র কলকাতা থেকে আসিচি, এখন পর্য্যন্ত বাবার সঙ্গেও দেখা কর্তে পারি নি। তুমি স্বচ্ছন্দে চুপ ক'রে থাকতে পার, কিন্তু আমি ত পারি নে! আমার দায়িত্ব-বোধ আছে—একটা বিরাট কার্য্য মাথায় নিয়ে আমি কিছুতে স্থির থাকতে পারি নে। আমাদের ব্রাহ্ম-মন্দির প্রতিষ্ঠা এই বড়দিনের ছুটিতেই হবে—সমস্ত স্থির ক'রে এলুম; এমন কি, নিমন্ত্রণ করা পর্য্যন্ত বাকি রেখে আসি নি। উঃ—কাল সকাল থেকে কি ঘোরাটাই না আমাকে ঘুরে বেড়াতে হয়েছে। যাক্— ওদিকের সম্বন্ধে একরকম নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। কারা কারা আস্বেন,

তাও এই কাগজখানায় আমি টুকে এনেচি—একবার পড়ে দেখ, বলিয়া বিলাস আত্মপ্রসাদের প্রচণ্ড নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া স্মুখের কাগজখানা বিজয়ার দিকে ঠেলিয়া দিয়া চৌকিতে হেলান দিয়া বসিল।

তথাপি বিজয়া কথা কহিল না—নিমন্ত্রিতদিগের সম্বন্ধেও লেশমাত্র কৌতূহল প্রকাশ করিল না; যেমন বসিয়া ছিল, ঠিক তেমনি বসিয়া রহিল। এতক্ষণ বিলাসবিহারী বিজয়ার নীরবতা সম্বন্ধে ঈষৎ সচেতন হইয়া কহিল, ব্যাপার কি! এমন চুপচাপ যে!

বিজয়া ধীরে ধীরে কহিল, আমি ভাব্‌চি, আপনি যে নিমন্ত্রণ ক'রে এলেন, এখন তাঁদের কি বলা যায়?

তার মানে?

মন্দির প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে আমি এখনো কিছু স্থির ক'রে উঠতে পারি নি।

বিলাস সটান্ সোজা হইয়া বসিয়া কিছুক্ষণ তীব্র দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া কহিল, তার মানে কি? তুমি কি ভেবেছ, এই ছুটীর মধ্যে না কর্‌তে পারলে আর শীঘ্র করা যাবে? তাঁরা ত কেউ তোমার—ইয়ে নন যে তোমার যখন সুবিধে হবে, তখনই তাঁরা এসে হাজির হবেন? মন-স্থির হয় নি, তার অর্থ কি শুনি?

রাগে তাহার চোখ-দুটা যেন জ্বলিতে লাগিল। বিজয়া অধোমুখে বহুক্ষণ নিঃশব্দে বসিয়া থাকিয়া আস্তে আস্তে বলিল, আমি ভেবে দেখলুম, এখানে এই নিয়ে সমারোহ কর্‌বার দরকার নেই।

বিলাস দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিল, সমারোহ! সমারোহ করতে হবে, এমন কথা ত আমি বলি নি! বরঞ্চ যা স্বভাবতঃই শান্ত, গম্ভীর—তার কাজ নিঃশব্দে সমাধা কর্‌বার মত জ্ঞান আমার আছে। তোমাকে সে জন্যে চিন্তিত হ'তে হবে না।

বিজয়া তেম্‌নি মৃদুকণ্ঠে কহিল, এখানে ব্রাহ্ম-মন্দির প্রতিষ্ঠা করার কোন সার্থকতা নেই। সে হবে না।

বিলাস প্রথমটা এম্‌নি স্তম্ভিত হইয়া গেল যে, তাহার মুখ দিয়া সহসা কথা বাহির হইল না। পরে কহিল, আমি জান্‌তে চাই, তুমি যথার্থ ব্রাহ্ম-মহিলা কি না।

বিজয়া তীব্র আঘাতে যেন চমকিয়া মুখ তুলিয়া চাহিল, কিন্তু পর পলকে আপনাকে সংযত করিয়া লইয়া শুধু বলিল, আপনি বাড়ি থেকে শান্ত হয়ে ফিরে এলে তার পরে কথা হবে—এখন থাক্। বলিয়াই উঠিবার উপক্রম করিল। কিন্তু ভৃত্য চায়ের সরঞ্জাম লইয়া প্রবেশ করিতেছে দেখিয়া সে পুনবায় বসিয়া পড়িল। বিলাস সে দিকে দৃক্‌পাতমাত্র করিল না। ব্রাহ্ম-সমাজভুক্ত হইয়াও সে নিজের ব্যবহার সুসংযত বা ভদ্র করিতে শিখে নাই—সে চাকরটার সম্মুখেই উদ্ধতকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, আমরা তোমার সংস্রব একেবারে পরিত্যাগ করতে পারি জানো?

বিজয়া নীরবে চা প্রস্তুত করিতে লাগিল, কোন উত্তর দিল না। ভৃত্য প্রস্থান করিলে ধীরে ধীরে কহিল, সে আলোচনা আমি কাকাবাবুর সঙ্গে কর্‌ব—আপনার সঙ্গে নয়। বলিয়া একবাটি চা তাহার দিকে অগ্রসর করিয়া দিল।

বিলাস তাহা স্পর্শ না করিয়া সেই কথারই পুনরুক্তি করিয়া বলিল, আমরা তোমার সংস্পর্শ ত্যাগ কর্‌লে কি হয় জান?

বিজয়া বলিল, না। কিন্তু সে যাই হোক না, আপনার দায়িত্ববোধ যখন এত বেশি, তখন আমার অনিচ্ছায় যাদের নিমন্ত্রণ ক'রে অপদস্থ কর্‌বার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন, তাঁদের ভার নিজেই বহন করুন, আমাকে অংশ নিতে অনুরোধ করবেন না।

বিলাস দুই চক্ষু প্রদীপ্ত করিয়া হাঁকিয়া কহিল, আমি কাজের লোক—কাজই ভালবাসি, খেলা ভালবাসি নে—তা মনে রেখো বিজয়া।

বিজয়া স্বাভাবিক শান্তস্বরে জবাব দিল, আচ্ছা, সে আমি ভুল্‌ব না।

ইহার মধ্যে যেটুকু শ্লেষ ছিল, তাহা বিলাসবিহারীকে একেবারে উন্মত্ত করিয়া দিল। সে প্রায় চীৎকার করিয়াই বলিয়া উঠিল, আচ্ছা, যাতে না ভোলো, সে আমি দেখব।

বিজয়া ইহার জবাব দিল না, মুখ নিচু করিয়া নিঃশব্দে চায়ের বাটির মধ্যে চামচটা ডুবাইয়া নাড়িতে লাগিল। তাহাকে মৌন দেখিয়া, বিলাস নিজেও ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া আমাকে কথঞ্চিৎ সংযত করিয়া প্রশ্ন করিল, আচ্ছা, এত বড় বাড়ি তবে কি কাজে লাগবে শুনি? এ ত আর শুধু শুধু ফেলে রাখা যেতে পারবে না।

এবার বিজয়া মুখ তুলিয়া চাহিল; এবং অবিচলিত দৃঢ়তার সহিত কহিল, না। কিন্তু এ বাড়ি যে নিতেই হবে, সে ত এখনো স্থির হয় নি!

জবাব শুনিয়া বিলাস ক্রোধে আত্মবিস্মৃত হইয়া গেল। মাটিতে সজোরে পা ঠুকিয়া পুনরায় চেঁচাইয়া বলিল, হয়েছে, একশ বার স্থির হয়েছে। আমি সমাজের মান্য ব্যক্তিদের আহ্বান ক'রে এনে অপমান করতে পারব না—এই বাড়ি আমাদের চাই-ই। এ আমি ক'রে তবে ছাড়ব—এই তোমাকে আজ আমি জানিয়ে গেলুম। বলিয়া প্রত্যুত্তরের জন্য অপেক্ষামাত্র না করিয়াই দ্রুতবেগে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

নবম পরিচ্ছেদ

সেইদিন হইতে বিজয়ার মনের মধ্যে এই আশাটা অনুক্ষণ যেন তৃষ্ণার মত জাগিতেছিল যে, সেই অপরিচিত লোকটি যাইবার পূর্ব্বে অন্ততঃ একটিবারও তাঁহার বন্ধুকে লইয়া অনুরোধ করিতে আসিবেন। যত কথা তাহাদের মধ্যে হইয়াছিল, সমস্তগুলিই তাহার অন্তরের মধ্যে গাঁথা হইয়া গিয়াছিল, তাহার একটি শব্দ পর্য্যন্তও সে বিস্মৃত হয় নাই। সেইগুলি সে মনে মনে অহর্নিশি আন্দোলন করিয়া দেখিয়াছিল, যে, বস্তুতঃ সে এমন একটা কথাও বলে নাই, যাহাতে এ ধারণা তাঁহার জন্মিতে পারে যে, তাহার কাছে আশা করিবার তাঁহার বন্ধুর একেবারে কিছু নাই। বরঞ্চ তাহার বেশ মনে পড়ে, নরেন যে তাহার পিতৃ-বন্ধুর পুত্র, এ উল্লেখ সে করিয়াছে; সময় পাইলে ঋণ-পরিশোধ করিবার মত শক্তি-সামর্থ আছে কি না, তাহাও জিজ্ঞাসা করিয়াছে; তবে যাহার সর্ব্বস্ব যাইতে বসিয়াছে তাহার ইহাতেও কি চেষ্টা করিবার মত কিছুই ছিল না! যেখানে কোন ভরসাই থাকে না, সেখানেও ত আত্মীয়-বন্ধুরা একবার যত্ন করিয়া দেখিতে বলে। এ বন্ধুটি কি তাঁহার তবে একেবারেই সৃষ্টিছাড়া!

নদীতীরের পথে আর সাক্ষাৎ হয় নাই। কিন্তু সে সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত প্রত্যহই এই আশা করিত যে, একবার না একবার তিনি আসিবেনই। কিন্তু দিন বহিয়া যাইতে লাগিল—না আসিলেন তিনি, না আসিল তাঁহার অদ্ভুত ডাক্তার বন্ধুটি।

বৃদ্ধ রাসবিহারীর সহিত দেখা হইলে তিনি, ছেলের সঙ্গে যে ইতিমধ্যে কোন কথা হইয়াছে, তাহার আভাসমাত্র দিলেন না। বরঞ্চ ইঙ্গিতে এই ভাবটাই প্রকাশ করিতে লাগিলেন, যেন সঙ্কল্প একপ্রকার সিদ্ধ হইয়াই গিয়াছে। এই লইয়া যে আর কোন প্রকার আন্দোলন উঠিতে পারে, তাহা যেন তাঁহার মনেই আসিতে পারে না। বিজয়া নিজেই সঙ্কোচে

কথাটা উত্থাপন করিতে পারিল না। অগ্রহায়ণ শেষ হইয়া গেল, পৌষের ঠিক প্রথম দিনটিতেই পিতা-পুত্র একত্র দর্শন দিলেন। রাসবিহারী কহিলেন, মা,আর ত বেশি দিন নেই, এর মধ্যেই ত সমস্ত সাজিয়ে-গুছিয়ে তুল্‌তে হবে!

বিজয়া সত্য সত্যই একটু বিস্মিত হইয়া কহিল, তিনি নিজে ইচ্ছে ক'রে চলে না গেলে ত কিছুই হ'তে পারে না।

বিলাসবিহারী মুখ টিপিয়া ঈষৎ হাস্য করিলেন; তাহার পিতা কহিলেন, কার কথা বল্‌চ মা, জগদীশের ছেলে ত? সে ত কালই বাড়ি ছেড়ে দিয়েছে।

সংবাদটা যথার্থ-ই বিজয়ার বুকের ভিতর পর্য্যন্ত গিয়া আঘাত করিল। সে তৎক্ষণাৎ বিলাসের দিক্ হইতে এমন করিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল, যাহাতে সে কোন মতে না তাহার মুখ দেখিতে পায়। এই ভাবে ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া, আঘাতটা সামলাইয়া লইয়া, আস্তে আস্তে রাসবিহারীকে জিজ্ঞাসা করিল, তাঁর জিনিষপত্র কি হ'ল? সমস্ত নিয়ে গেছেন?

বিলাস পিছন হইতে হাসির ভঙ্গীতে বলিল, থাক্‌বার মধ্যে একটা তে-পেয়ে খাট ছিল—তার উপরেই বোধ করি তাঁর শয়ন চলত, আমি সেটা বাইরে গাছতলায় টেনে ফেলে দিয়েছি, তাঁর ইচ্ছে হ'লে নিয়ে যেতে পারেন—কোন আপত্তি নেই।

বিজয়া চুপ করিয়া রহিল, কিন্তু তাহার মুখের উপর সুস্পষ্ট বেদনার চিহ্ন লক্ষ্য করিয়া রাসবিহারী ভর্ৎসনার কণ্ঠে ছেলেকে বলিলেন, ওটা তোমার দোষ বিলাস। মানুষ যেমন অপরাধীই হোক্, ভগবান তাকে যত দণ্ডই দিন, তার দুঃখে আমাদের দুঃখিত হওয়া, সমবেদনা প্রকাশ করা উচিত। আমি বল্‌ছি নে যে, তুমি অন্তরে তার জন্যে কষ্ট পাচ্চ না, কিন্তু বাইরেও সেটা প্রকাশ করা কর্ত্তব্য। জগদীশের ছেলের সঙ্গে তোমার

কি দেখা হয়েছিল? তাকে একবার আমার সঙ্গে দেখা করতে বললে না কেন? দেখতুম যদি কিছু—

পিতার কথাটা শেষ হইতেও পাইল না—পুত্র তাঁহার ইঙ্গিতটা সম্পূর্ণ ব্যর্থ করিয়া দিয়া মুখে একটা শব্দ করিয়া বলিয়া উঠিল, তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রে নিমন্ত্রণ করা ছাড়া আমার ত আর কাজ ছিল না বাবা! তুমি কি যে বল, তার ঠিকানাই নেই। তা ছাড়া আমার পৌছাবার পূর্ব্বেই ত ডাক্তারসাহেব তাঁর তোরঙ্গ, প্যাঁটরা, যন্ত্র-পাতি গুটিয়ে নিয়ে স'রে পড়েছিলেন। বিলাতের ডাক্তার! একটা অপদার্থ হামবাগ কোথাকার! বলিয়া সে আরও কি সব বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু রাসবিহারী বিজয়ার মুখের প্রতি আড়চোখে চাহিয়া ক্রুদ্ধকণ্ঠে কহিলেন, না বিলাস, তোমার এ রকম কথাবার্ত্তা আমি মার্জ্জনা করতে পারি নে। নিজের ব্যবহারে তোমার লজ্জিত হওয়া উচিত—অনুতাপ করা উচিত।

কিন্তু বিলাস লেশমাত্র লজ্জিত বা অনুতপ্ত না হইয়া জবাব দিল, কি জন্যে শুনি? পরের দুঃখে দুঃখিত হওয়া, পরের ক্লেশ নিবারণ করার শিক্ষা আমার আছে, কিন্তু যে দাম্ভিক লোক বাড়ি বয়ে অপমান ক'রে যায়, তাকে আমি মাপ করিনে। অত ভণ্ডামি আমার নেই।

তাহার জবাব শুনিয়া উভয়েই আশ্চর্য্য হইয়া উঠিল। রাসবিহারী কহিলেন, কে আবার তোমাকে বাড়ি বয়ে অপমান ক'রে গেল? কার কথা তুমি বলছ?

বিলাস ছদ্ম-গাম্ভীর্য্যের সহিত কহিল, জগদীশবাবুর সু-পুত্র নরেনবাবুর কথাই বলছি বাবা। তিনিই একদিন ঠিক এই ঘরে বসেই আমাকে অপমান ক'রে গিয়েছিলেন। তখন তাকে চিনতুম না তাই—, বলিয়া ইঙ্গিতে বিজয়াকে দেখাইয়া কহিল, নইলে ওঁকেও অপমান ক'রে যেতে সে কসুর করে নি—তোমরা জান সে কথা?

বিজয়া চমকিয়া মুখ ফিরাইয়া চাহিতেই, বিলাস তাহাকেই উদ্দেশ করিয়া বলিল, পূর্ণবাবুর ভাগ্নে ব'লে পরিচয় দিয়ে যে তোমাকে পর্য্যন্ত অপমান করে গিয়েছিল সে কে? তখন যে তাকে ভারি প্রশ্রয় দিলে! সে-ই নরেনবাবু! তখন নিজের যথার্থ পরিচয় দিতে যদি সে সাহস করত, তবেই বলতে পারতুম, সে পুরুষমানুষ! ভণ্ড কোথাকার! বলিয়া উভয়েই সবিস্ময়ে দেখিল, বিজয়ার সমস্ত মুখ মুহূর্ত্তের মধ্যে বেদনায় একেবারে শুষ্ক বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে।

দশম পরিচ্ছেদ

বড়দিনের ছুটীর আর বিলম্ব নাই; সুতরাং জগদীশের বাটীর প্রকাণ্ড হল-ঘরটা মন্দিরের জন্য, এবং অপরাপর কক্ষগুলি কলিকাতার মান্য অতিথিদের নিমিত্ত সজ্জিত করা হইতেছে। স্বয়ং বিলাসবিহারী তাহার তত্ত্বাবধান করিতেছেন। সাধারণ নিমন্ত্রিতের সংখ্যাও অল্প নয়। যাঁহারা বিলাসের বন্ধু, স্থির হইয়াছিল, তাঁহারা রাসবিহারীর বাটীতে এবং অবশিষ্ট বিজয়ার এখানে থাকিবেন। মহিলা যাঁহারা আসিবেন, তাঁহারাও এইখানেই আশ্রয় লইবেন। বন্দোবস্তও সেইরূপ হইয়াছিল।

সেদিন সকাল-বেলায় বিজয়া স্নান সারিয়া নিচে বসিবার ঘরে প্রবেশ করিতে গিয়া দেখিল প্রাঙ্গণের একধারে দাঁড়াইয়া পরেশের মায়ের পরেশ একহাতে কোঁচড় হইতে মুড়ি লইয়া চিবাইতেছে, অপর হস্তে রজ্জুবদ্ধ একটা গরুর গলায় হাত বুলাইয়া অনির্ব্বচনীয় তৃপ্তিলাভ করিতেছে। গরুটাও আরামে চোখ বুজিয়া গলা উঁচু করিয়া ছেলেটার সেবা গ্রহণ করিতেছে।

এই দুটি বিজাতীয় জীবের সৌহৃদ্যের সহিত তাহার মনের পুঞ্জীভূত বেদনার কি যে সংযোগ ছিল, বলা কঠিন; কিন্তু চাহিয়া চাহিয়া অজ্ঞাতসারে তাহার চক্ষু দুটি অশ্রুপ্লাবিত হইয়া গেল। এ বাটীতে এই

ছেলেটি ছিল তাহার ভারি অনুগত। সে চোখ মুছিয়া তাহাকে কাছে ডাকিয়া সস্নেহে কৌতুকের সহিত কহিল, হাঁ রে পরেশ, তোর মা বুঝি তোকে এই কাপড় কিনে দিয়েছে? ছিঃ—এ কি আবার একটা পাড় রে?

পরেশ ঘাড় বাঁকাইয়া, আড়-চোখে চাহিয়া নিজের পাড়ের সঙ্গে বিজয়ার শাড়ীর চমৎকার চওড়া পাড়টা মনে মনে মিলাইয়া দেখিয়া অতিশয় ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। তাহার ভাব বুঝিয়া বিজয়া নিজের পাড়টা দেখাইয়া কহিল, এম্‌নি না হ'লে কি তোকে মানায়? কি বলিস্ রে?

পরেশ তৎক্ষণাৎ সায় দিয়া বলিল, মা কিচ্ছু কিন্‌তে জানে না যে!

বিজয়া কহিল, আমি কিন্তু তোকে এম্‌নি একখানা কাপড় কিনে দিতে পারি, যদি তুই—

কিন্তু যদিতে পরেশের প্রয়োজন ছিল না। সে সলজ্জ হাস্যে মুখখানা আকর্ণ-প্রসারিত করিয়া প্রশ্ন করিল, কখন্ দেবে?

দিই, যদি তুই আমার একটা কথা শুনিস্।

কি কথা?

বিজয়া একটু চিন্তা করিয়া বলিল, কিন্তু তোর মা কি আর কেউ শুন্‌লে তোকে পর্‌তে দেবে না।

এ সম্বন্ধে কোন প্রকার প্রতিবন্ধক গ্রাহ্য করিবার মত মনের অবস্থা পরেশের নয়। সে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, মা জান্‌বে ক্যাম্‌নে? তুমি বল না, আমি এক্ষুণি শুন্‌ব।

বিজয়া জিজ্ঞাসা করিল, তুই দিঘড়া গাঁ চিনিস্?

পরেশ হাত তুলিয়া বলিল, ওই ত হোতা। গুটিপোকা খুঁজ্‌তে কতদিন দিঘড়ে যাই।

বিজয়া প্রশ্ন করিল, ওখানে সবচেয়ে বড় কাদের বাড়ি, তুই জানিস্?

পরেশ বলিল, হিঁ—বামুনদের গো। সেই যে আর বচ্ছর রস খেয়ে

তিনি ছাদ থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে ছ্যালো। এই যেন হেথায় গোবিন্দের মুড়কি-বাতাসার দোকান, আর ওই হোথায় তেনাদের দালান। গোবিন্দ কি বলে জান মাঠান্? বলে, সব মাগ্যি-গোণ্ডা, আধ পয়সায় আর আড়াই গোণ্ডা বাতাসা মিল্‌বে না, এখন মোটে দুগোণ্ডা। কিন্তু তুমি যদি একসঙ্গে গোটা পয়সার আন্‌তে দাও মাঠান্, আমি তা হ'লে সাড়ে পাঁচ গোণ্ডা নিয়ে আস্‌তে পারি।

বিজয়া কহিল, তুই দুপয়সার বাতাসা কিনে আন্‌তে পার্‌বি?

পরেশ কহিল, হিঁ—এ হাতে এক পয়সার সাড়ে পাঁচ গোণ্ডা গুণে নিয়ে বল্‌ব, দোকানি, এ হাতে আর সাড়ে পাঁচ গোণ্ডা গুণে দাও। দিলে বল্‌ব, মাঠান্ বলে দেছে দুটো ফাউ—নাঃ? তবে পয়সা দুটো হাতে দেব, নাঃ?

বিজয়া হাসিয়া কহিল, হাঁ, তবে পয়সা দিবি। আর অম্‌নি দোকানীকে জিজ্ঞেসা ক'রে নিবি, ওই যে বড়বাড়িতে নরেনবাবু থাক্‌ত, সে কোথায় গেছে? বল্‌বি—যে বাড়িতে তিনি আছেন, সেটা আমাকে চিনিয়ে দিতে পার দোকানি? কি রে পারবি ত?

পরেশ মাথা নাড়িতে নাড়িতে কহিল, হিঁ—আচ্ছা পয়সা দাও তুমি। আমি ছুট্টে গে নে আসি।

আমি যা জিজ্ঞেসা কর্‌তে বল্‌লুম?

পরেশ কহিল, হিঁ—তা-ও।

বাতাসা হাতে পেয়ে ভুলে যাবি নে ত?

পরেশ হাত বাড়াইয়া বলিল, তুমি পয়সা আগে দাও না? আমি ছুট্টে যাই।

আর তোর মা যদি জিজ্ঞেসা করে, পরেশ, গিয়েছিলি কোথায়?, কি বল্‌বি?

পরেশ অত্যন্ত বুদ্ধিমানের মত হাস্য করিয়া কহিল, সে আমি খুব বল্‌তে পার্‌ব। বাতাসার ঠোঙা এম্‌নি ক'রে কোঁচড়ে লুকিয়ে বলব, মাঠান্ পাঠিয়ে ছ্যালো—ঐ হোথা বামুনদের নরেনবাবুর খবর জান্‌তে, গেছ্‌লাম। তুমি দাও না শিগ্‌গির পয়সা।

বিজয়া হাসিয়া ফেলিয়া কহিল, তুই কি বোকা ছেলে রে পরেশ, মায়ের কাছে মিছে কথা বল্‌তে আছে? বাতাসা কিন্‌তে গিয়েছিলি, জিজ্ঞেসা করলে তাই বল্‌বি। কিন্তু দোকানীর কাছে সে খবরটা জেনে আস্‌তে ভুলিস্ নে যেন। নইলে কাপড় পাবি নে, তা ব'লে দিচ্ছি।

আচ্ছা, বলিয়া পরেশ পয়সা লইয়া দ্রুতবেগে প্রস্থান করিল, বিজয়া শূন্যদৃষ্টিতে সেই দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। যে সংবাদ জানিবার কৌতূহলের মধ্যে বিন্দুমাত্র অস্বাভাবিকতা নাই, যা সে যে-কোন লোক পাঠাইয়া অনেকদিন পূর্ব্বেই স্বচ্ছন্দে জানিতে পারিত, তাহাই যে কেন এখন তাহার কাছে এত বড় সঙ্কোচের বিষয় হইয়া উঠিয়াছে, একবার তলাইয়া দেখিলে এই লুকোচুরির লজ্জায় আজ সে নিজেই মরিয়া যাইত। কিন্তু লজ্জাটা নাকি তাহার চিন্তার ধারার সহিত অজ্ঞাতসারে মিশিয়া একাকার হইয়া গিয়াছিল, তাই তাহাকে আলাদা করিয়া দেখিবার দৃষ্টি যে কোন কালে তাহার চোখে ছিল, ইহাও আজ তাহার মনে পড়িল না।

কয়েকখানা চিঠি লিখিবার ছিল। সময় কাটাইবার জন্য বিজয়া টেবিলে গিয়া কাগজ-কলম লইয়া বসিল। কিন্তু কথাগুলা এম্‌নি এলো-মেলো অসম্বদ্ধ হইয়া মনে আসিতে লাগিল যে, কয়েকটা চিঠির কাগজ ছিঁড়িয়া ফেলিয়া তাহাকে কলম রাখিয়া দিতে হইল। পরেশের দেখা নাই। মনের চাঞ্চল্য আর দমন করিতে না পারিয়া বিজয়া ছাদে উঠিয়া তাহার পথ চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। বহুক্ষণে দেখা গেল, সে হন্ হন্

করিয়া নদীর পথ ধরিয়া আসিতেছে। বিজয়া কম্পিত-পদে শঙ্কিত-বক্ষে নিচে নামিয়া বাহিরের ঘরে ঢুকিতেই ছেলেটা বাতাসার ঠোঙা কোঁচড়ে লুকাইয়া চোরের মত পা টিপিয়া কাছে আসিয়া সেগুলি মেলিয়া ধরিয়া বলিল, দুপয়সায় বার গোণ্ডা এনেছি মাঠান্!

বিজয়া সভয়ে কহিল, আর দোকানী কি বল্লে?

পরেশ ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিল, পয়সায় ছগোণ্ডার কথা কাউকে বল্‌তে মানা করে দেছে। বলে কি জান মা—

বিজয়া বাধা দিয়া কহিল, আর সেই বামুনদের নরেনবাবুর কথা—

পরেশ কহিল, সে হোথা নেই—কোথায় চ'লে গেছে। গোবিন্দ বলে কি জানো মাঠান্, বার গোণ্ডায়—

বিজয়া অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া রুক্ষস্বরে কহিল, নিয়ে যা তোর বার গোণ্ডা বাতাসা আমার সুমুখ থেকে! বলিয়া সরিয়া জানালার গরাদে ধরিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

এই অচিন্তনীয় রূঢ়তায় ছেলেটা এতটুকু হইয়া গেল। সে এত দ্রুত গিয়াছে এবং আসিয়াছে, এগার গণ্ডার স্থানে কত কৌশলে বার গণ্ডা সওদা করিয়াছে, তবুও মাঠানকে প্রসন্ন করিতে পারিল না মনে করিয়া তাহার ক্ষোভের সীমা রহিল না। সে ঠোঙা হাতে করিয়া মলিন-মুখে কহিল, এর বেশি যে দেয় না মাঠান্!

বিজয়া ইহার জবাব দিল না, কিন্তু এদিকে না চাহিয়াও সে ছেলেটার অবস্থা অনুভব করিতেছিল। তাই খানিক পরে সদয়-কণ্ঠে কহিল, যা পরেশ, ওগুলো তুই খেগে যা।

পরেশ সভয়ে জিজ্ঞাসা করিল, সব?

বিজয়া মুখ না ফিরাইয়াই কহিল, সব। ওতে আমার কাজ নেই।

পরেশ বুঝিল, এ রাগের কথা। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া তাহার

কাপড়ের কথাটা স্মরণ হইতেই আরও একটা কথা তাহার মনে পড়িয়া গেল। আস্তে আস্তে কহিল, ভট্‌চায্যিমশায়ের কাছে জেনে আস্‌ব মাঠান্‌?

কে ভট্‌চায্যিমশাই? কি জেনে—' বলিয়া উৎসুক কণ্ঠে প্রশ্ন করিয়াই বিজয়া মুখ ফিরাইয়াই থামিয়া গেল। মুখের বাকি কথাটুকু তাহার মুখেই রহিয়া গেল, আর বাহির হইল না। বারান্দার উপর ঠিক সম্মুখেই অকস্মাৎ নরেনকে দেখা গেল—এবং পরক্ষণেই সে ঘরে পা দিয়া হাত তুলিয়া বিজয়াকে নমস্কার করিল।

পরেশ বলিল, কোথায় গেছে নরেন্দরবাবু—

বিজয়া প্রতি নমস্কারেরও অবসর পাইল না, নিদারুণ লজ্জায় সমস্ত মুখ রক্তবর্ণ করিয়া ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, আচ্ছা, যা, যা—আর জিজ্ঞাসা করবার দরকার নেই।

পরেশ বুঝিল, এও রাগের কথা। ক্ষুব্ধস্বরে কহিল, কাণা ভট্‌চায্যি-মশাই ত তেনাদের পাশের বাড়িতেই থাকে মাঠান্‌। গোবিন্দ-দোকানী যে বললে—

বিজয়া শুষ্ক হাসিয়া কহিল, আসুন, বসুন।

পরেশের প্রতি চাহিয়া বলিয়া উঠিল, তুই এখন যা না পরেশ। ভারি তা কথা, তার আবার—সে আর একদিন তখন জেনে আসিস না হয়। এখন যা।

পরেশ চলিয়া গেলে নরেন জিজ্ঞাসা করিল, আপনি নরেনবাবুর খবর জানতে চান? তিনি কোথায় আছেন তাই?

অস্বীকার করিতে পারিলেই বিজয়া বাঁচিত। কিন্তু মিথ্যা বলিবার অভ্যাস তাহার ছিল না। সে কোন মতে ভিতরের লজ্জা দমন করিয়া বলিল, হাঁ। তা সে একদিন জানলেই হবে।

নরেন জিজ্ঞাসা করিল, কেন? কোন দরকার আছে?

প্রশ্ন তাহার কানের মধ্যে ঠিক বিদ্রূপের মত শুনাইল। কহিল, দরকার ছাড়া কি কেউ কারও খবর জান্‌তে চায় না?

কেউ কি করে না করে সে ছেড়ে দিন। কিন্তু তার সঙ্গে ত আপনার সমস্ত সম্বন্ধ চুকে গেছে; তবে আবার কেন তার সন্ধান নিচ্চেন? দেনাটা কি সব শোধ হয় নি?

বিজয়ার মুখের উপর ক্লেশের চিহ্ন দেখা দিল, কিন্তু সে উত্তর দিল না। নরেন নিজেও তাহার ভিতরের উদ্বেগ সম্পূর্ণ গোপন করিতে পারিল না। পুনরায় কহিল, যদি আরও কিছু ঋণ বার হয়ে থাকে, তা হ'লেও আমি যতদূর জানি, তার এমন কিছু আর নেই, যা থেকে সেই বাকি ঋণটা পরিশোধ হ'তে পারবে। এখন আর তাঁর খোঁজ করা—

কে আপনাকে বল্‌লে, আমি দেনার জন্যেই তাঁর অনুসন্ধান কর্‌ছি?

তা ছাড়া আর যে কি হ'তে পারে, আমি ত ভাব্‌তে পারি নে। তিনিও আপনাকে চেনেন না, আপনিও তাঁকে চেনেন না।

তিনিও আমাকে চেনেন, আমিও তাঁকে চিনি।

নরেন হাসিল; কহিল, তিনি আপনাকে চেনেন, এ কথা সত্যি, কিন্তু আপনি তাঁকে চেনেন না। ধরুন আমিই যদি বলি, আমার নাম নরেন, তা হ'লেও ত আপনি—

বিজয়া ঘাড় নাড়িয়া কহিল, তা হ'লে আমি বিশ্বাস করি, এবং বলি এই সত্যি কথাটা অনেক দিন পূর্ব্বেই আপনার মুখ থেকে বার হওয়া উচিত ছিল।

ফুঁ দিয়া আলো নিবাইলে ঘরের চেহারার যেমন বদল হয় বিজয়ার প্রত্যুত্তরে চক্ষুর নিমিষে নরেনের মুখ তেমনি মলিন হইয়া গেল। বিজয়া তাহা লক্ষ্য করিয়াই পুনশ্চ কহিল, অন্য পরিচয়ে নিজের আলোচনা শোনা, আর লুকিয়ে আড়ি পেতে শোনা, দুটোই কি সমান ব'লে

আপনার মনে হয় না? আমার ত হয়। তবে কি না আমরা ব্রাহ্ম, এই যা বলেন।

নরেনের মলিন মুখ এইবার লজ্জায় একেবারে কালো হইয়া উঠিল। একটুখানি মৌন থাকিয়া বলিল, আপনার সঙ্গে অনেক রকম আলোচনার মধ্যে নিজের আলোচনাও ছিল বটে, কিন্তু তাতে মন্দ অভিপ্রায় ত কিছুই ছিল না। শেষ দিনটায় পরিচয় দেব মনেও করেছিলাম, কিন্তু হয়ে উঠ্‌ল না। এতে আপনার কোন ক্ষতি হয়েছে কি?

এ প্রশ্ন গোড়াতেই করিয়া বসিলে এ পক্ষেও উত্তর দেওয়া নিশ্চয়ই শক্ত হইত। কিন্তু যে আলোচনা একবার সুরু হইয়া গেছে, নিজের ঝোঁকে সে অনেক কঠিন স্থান আপনি ডিঙাইয়া যায়। তাই সহজেই বিজয়া জবাব দিতে পারিল। কহিল, ক্ষতি একজনের ত কত রকমেই হ'তে পারে। আর যদি হয়েও থাকে, সে ত হয়েই গেছে, আপনি ত এখন তার উপায় কর্‌তে পার্‌বেন না। সে যাক্‌। আপনার নিজের সম্বন্ধে কোন কথা জান্‌তে চাইলে কি—

রাগ কর্‌ব? না। বলিয়াই তৎক্ষণাৎ প্রশান্ত নির্ম্মল হাস্যে তাহার সমস্ত মুখ উজ্জল হইয়া উঠিল। এতদিন এত কথাবার্ত্তাতেও এই লোকটির যে পরিচয় বিজয়া পায় নাই, এই একমুহূর্ত্তের হাসিটুকু তাহাকে সেই খবর দিয়া গেল। তাহার মনে হইল, ইহার সমস্ত অন্তর-বাহির একেবারে যেন স্ফটিকের মত স্বচ্ছ। যে লোক সর্ব্বস্ব গ্রহণ করিয়াছে, তাহার কাছেও ইহার কিছুই অজানা নাই বটে, এবং ঠিক এইজন্যই বোধ করি সে তাহার মুখের পানে চোখ তুলিয়া আর প্রশ্ন করিতেও পারিল না, ঘাড় হেঁট করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনি এখন আছেন কোথায়?

নরেন বলিল, আমার দূর-সম্পর্কের এক পিসি এখনো বেঁচে আছেন, তাঁর বাড়িতেই আছি।

আপনার সম্বন্ধে যে সামাজিক গোলযোগ আছে, তা কি সে গ্রামের লোকেরা জানেন না?

জানেন বৈ কি।

তবে?

নরেন একটুখানি ভাবিয়া বলিল, যে ঘরটায় আছি, সেটাকে ঠিক বাড়ির মধ্যে বলাও যায় না; আর আমার অবস্থা শুনেও বোধ করি, সামান্য কিছুদিনের জন্যে তাঁর ছেলেরা আপত্তি করে না। তবে বেশি দিন থেকে তাঁদের বিব্রত করা চল্‌বে না, সে ঠিক। বলিয়া সে একটুখানি থামিল। কহিল, আচ্ছা, সত্যি কথা বলুন ত, কেন এ সব খোঁজ নিচ্ছিলেন? বাবার আরও কিছু দেনা বেরিয়েছে। এই না?

উত্তর দিবার জন্যই বোধ করি বিজয়া তাহার মুখপানে চাহিল। কিন্তু সহসা হাঁ-না কোন কথাই তাহার গলা দিয়া বাহির হইল না।

নরেন কহিল, পিতৃ-ঋণ কে না শোধ দিতে চায়, কিন্তু সত্যি বল্‌চি আপনাকে স্বনামে বেনামে এমন কিছু আমার নাই, যা বেচে দিতে পারি। শুধু মাইক্রস্‌কোপ্‌টা আছে—তাও বেচে তবে বর্ম্মায় ফিরে যাবার খরচটা যোগাড় কর্‌তে হবে। পিসিমার অবস্থাও খারাপ—এমন কি, সেখানে খাওয়া-দাওয়া পর্য্যন্ত—, বলিয়াই সে হঠাৎ থামিয়া গেল।

বিজয়ার চোখে জল আসিয়া পড়িল; সে ঘাড় ফিরাইল।

নরেন বলিল, তবে যদি এই দয়াটা করেন, তা হ'লে বাবার দেনাটা আমি নিজের নামে লিখে দিতে পারি। ভবিষ্যতে শোধ দিতে প্রাণপণে চেষ্টা কর্‌ব। আপনি রাসবিহারীবাবুকে একটু বল্‌লেই আর তিনি এ নিয়ে এখন পীড়াপীড়ি কর্‌বেন না।

পরেশ আসিয়া দ্বারের বাহির হইতে কহিল, মাঠান্‌, মা বল্‌চে বেলা যে অনেক হয়ে গেল—ঠাকুরমশাইকে ভাত দিতে বল্‌বে?

সুমুখের ঘড়িটার প্রতি চাহিয়া নরেন চকিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল; লজ্জিত হইয়া বলিল, ইস্! বারটা বাজে। আপনার ভারি কষ্ট হ'ল।

বিজয়া চোখের জল সাম্‌লাইয়া লইয়াছিল; কহিল, আপনি কি জন্যে এসেছিলেন, সে ত বল্‌লেন না?

নরেন তাড়াতাড়ি বলিল, সে থাক্। বলিয়া প্রস্থানের উপক্রম করিতেই বিজয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনার পিসিমার বাড়ি এখান থেকে কত দূর? এখন সেখানেই ত যেতে হবে?

নরেন কহিল, হাঁ। দূর একটু বৈ কি—প্রায় ক্রোশ-দুই।

বিজয়া অবাক্ হইয়া বলিল, এই রোদের মধ্যে এখন দুক্রোশ হাঁটবেন? যেতেই ত তিনটে বেজে যাবে!

তা হোক্, তা হোক্, নমস্কার! বলিয়া নরেন পা বাড়াইতেই বিজয়া দ্রুতপদে কবাটের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল; কহিল, আমার একটা অনুরোধ আপনাকে আজ রাখ্‌তেই হবে। এত বেলায় না খেয়ে আপনি কিছুতেই যেতে পাবেন না।

নরেন অতিশয় বিস্মিত হইয়া বলিল, খেয়ে যাব? এখানে?

কেন, তাতে কি আপনারও জাত যাবে নাকি?

প্রত্যুত্তরে পুনরায় তেম্‌নি প্রশান্ত হাসিতে তাহার মুখ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল; কহিল, না, সে ভয় আমার দুনিয়ায় আর নেই। তা ছাড়া ভগবান আমার প্রতি আজ ভারি প্রসন্ন; নইলে এত বেলায় সেখানে যে কি জুট্‌ত, সে ত আমি জানি।

তবে একটু বসুন, আমি আস্‌চি, বলিয়া বিজয়া তাহার প্রতি না চাহিয়াই ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

একাদশ পরিচ্ছেদ

খাওয়া প্রায় শেষ হইয়া আসিলে নরেন পুনরায় সেই কথাই বলিল, কহিল, এতো বেলা পর্য্যন্ত উপোস ক'রে আমাকে সুমুখে বসিয়ে খাওয়াবার কোন দরকার ছিল না। অন্য কোন দেশে এ প্রথা নেই।

বিজয়া হাসিমুখে জবাব দিল, বাবা বল্‌তেন, সে দেশের ভারি দুর্ভাগ্য, যে দেশের মেয়েরা অভুক্ত থেকে পুরুষদের খাওয়াতে পায় না, সঙ্গে ব'সে খেতে হয়। আমিও ঠিক তাই বলি।

নরেন কহিল, কেন তা বলেন? অন্য দেশের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম, কিন্তু আমাদের দেশেও ত অনেকের বাড়িতে খেয়েছি; তাঁদের মধ্যেও ত এ প্রথা চলে দেখেছি।

বিজয়া কহিল, বিলিতি প্রথা যাঁরা শিখেছেন, তাঁদের বাড়িতে হয় ত চলে, কিন্তু সকলের নয়। আপনি নিজে সে দেশে অনেক দিন ছিলেন বলেই আপনার ভুল হচ্ছে। নইলে পুরুষদের সাম্‌নে বার হই, দরকার হ'লে কথা কই বলেই আমরা সবাই মেমসাহেবও নই, তাদের চাল-চলনেও চলি নে।

নরেন কহিল, না চল্‌লেও চলা ত উচিত। যাদের যেটা ভাল, তাদের কাছে সেটা ত নেওয়া চাই।

বিজয়া বলিল, কোন্‌টা ভাল, একসঙ্গে ব'সে খাওয়া? বলিয়াই একটুখানি হাসিয়া কহিল, আপনি কি জানবেন, মেয়েদের কতখানি জোর এই খাওয়ানোর মধ্যে থাকে? আমি ত বরঞ্চ আমাদের অনেক অধিকার ছাড়তে রাজী আছি, কিন্তু এটি নয়—ও কি, সমস্ত দুধই যে প'ড়ে রইল! না, না—মাথা নাড়লে হবে না। কখনই আপনার পেট ভরে নি, তা ব'লে দিচ্ছি।

নরেন হাসিয়া বলিল, আমার নিজের পেট ভরেছে কি না, সেও

আপনি বলে দেবেন! এ ত বড় অদ্ভুত কথা। বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। কথাটা শুনিয়া বিজয়া নিজেও একটু হাসিল বটে, কিন্তু তাহার মুখের ভাব দেখিয়া বুঝিতে বাকি রহিল না যে, সে ঐটুকু দুধ না খাওয়ার জন্য ক্ষুব্ধ হইয়াছে।

বেলা পড়িলে বিদায় লইতে গিয়া নরেন হঠাৎ বলিয়া উঠিল, একটা বিষয়ে আজ আমি ভারি আশ্চর্য্য হয়ে গেছি। আমাকে রোদের মধ্যে আপনি যেতে দিলেন না, না খাইয়ে ছেড়ে দিলেন না, একটু কম খাওয়া দেখে ক্ষুণ্ণ হলেন—এ সব কেমন ক'রে সম্ভব হয়? শুনে আপনি দুঃখিত হবেন না—আমি শ্লেষ বা বিদ্রূপ করার অভিপ্রায়ে এ কথা বলছি নে—কিন্তু আমি তখন থেকে কেবল ভাবছি, এ রকম কেমন ক'রে সম্ভব হয়!

বিজয়া কোন উপায়ে এই আলোচনার হাত হইতে নিস্তার পাইবার জন্য তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া বলিল, সব বাড়িতেই এই রকম হয়ে থাকে। সে থাক্, আপনি আর কতদিনের মধ্যে বর্ম্মা যাবার ইচ্ছে করেন?

নরেন অন্যমনস্কভাবে কহিল, পরশু। কিন্তু আমি ত আপনার একেবারেই পর; আমার দুঃখ-কষ্টেতে সত্যিই ত আপনার কিছু যায় আসে না; তবু আপনার আচরণ দেখে বাইরের কারুর বলবার যো নেই যে, আমি আপনার লোক নই। পাছে কম খাই, বা খাওয়ার সামান্য ত্রুটি হয়, এই ভয়ে নিজে না খেয়ে, সুমুখে ব'সে রইলেন। আমার বোন নেই, মাও ছেলে-বেলায় মারা গেছেন। তাঁরা বেঁচে থাকলে, এম্‌নি ব্যাকুল হতেন কি না, আমি ঠিক জানি নে; কিন্তু আপনার যত্ন করা দেখে ভারি আশ্চর্য্য হয়ে গেছি। অথচ এ কিছু আর যথার্থই সত্যি হ'তে পারে না, সে আমিও জানি আপনিও জানেন, বরঞ্চ একে সত্যি বললেই আপনাকে ব্যঙ্গ করা হবে—অথচ মিথ্যে ব'লে ভাবতেও যেন ইচ্ছে করে না।

বিজয়া জানালার বাহিরে চাহিয়া ছিল ; সেইদিকেই দৃষ্টি রাখিয়া কহিল, ভদ্রতা ব'লে একটা জিনিষ আছে, সে কি আপনি আর কোথাও দেখেননি ?

ভদ্রতা ? তাই হবে বোধ হয়। বলিয়া হঠাৎ তাহার একটা নিশ্বাস পড়িল। তার পরে হাত তুলিয়া আবার নমস্কার করিয়া কহিল, যে ক'রে হোক্ বাবার ঋণটা যে সমস্ত শোধ হয়েছে, এই আমার ভারি তৃপ্তি। আপনার মন্দিরের দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি হোক্—আজকের দিনটা আমার চিরকাল মনে থাকবে। আমি চল্লুম। বলিয়া সে যখন ঘরের বাহিরে আসিয়া পড়িল, তখন ভিতর হইতে অস্ফুট আহ্বান আসিল, একটু দাঁড়ান—

নরেন ফিরিয়া আসিয়া দাঁড়াইতে, বিজয়া মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, আপনার মাইক্রস্কোপটার দাম কত ?

নরেন কহিল, কিন্‌তে আমার পাঁচশ টাকার বেশি লেগেছিল, এখন আড়াইশ টাকা—দুশ টাকা পেলেও আমি দিই। কেউ নিতে পারে আপনি জানেন ? একেবারে নূতন আছে বল্‌লেও হয় !

তাহার বিক্রী করিবার আগ্রহ দেখিয়া মনে মনে অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া বিজয়া জিজ্ঞাসা করিল, এত কমে দেবেন, আপনার কি তার সব কাজ হয়ে গেছে ?

নরেন নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, কাজ ? কিছুই হয় নি।

এই নিশ্বাসটুকুও বিজয়ার লক্ষ্য এড়াইল না। সে ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, আমার নিজেরই একটা অনেক দিন থেকে কেনবার সাধ আছে, কিন্তু হয়ে ওঠে নি। কাল একবার দেখাতে পারেন ?

পারি। আমি সমস্ত আপনাকে দেখিয়ে দিয়ে যাব।

একটু চিন্তা করিয়া পুনরায় কহিল, যাচাই কর্‌বার সময় নেই বটে, কিন্তু আমি নিশ্চয় বলছি, নিলে আপনি ঠক্‌বেন না।

আবার একটু মৌন থাকিয়া বলিল, টাকার বদলে দাম হয় না, এ এমনি জিনিস। আমার আর কোন উপায় যে নেই, নইলে—আচ্ছা, কাল দুপুর-বেলায় আমি নিয়ে আস্‌ব।

সে চলিয়া গেলে যতক্ষণ দেখা গেল, বিজয়া অপলক চক্ষে চাহিয়া রহিল; তার পরে ফিরিয়া আসিয়া সুমুখের চৌকিটার উপর বসিয়া পড়িল। কখনো বা তাহার মনে হইতে লাগিল, যতদূর দৃষ্টি যায়, সব যেন খালি হইয়া গিয়াছে—কিছুতেই যেন কোন দিন তাহার প্রয়োজন ছিল না, কিছুই যেন তাহার মরণকাল পর্য্যন্ত কোন কাজেই লাগিবে না। অথচ সেজন্য ক্ষোভ বা দুঃখ কিছুই মনের মধ্যে নাই। এম্‌নি শূন্য-দৃষ্টিতে বাহিরের গাছপালার পানে চাহিয়া, মূর্ত্তির মত স্তব্ধভাবে বসিয়া কি করিয়া যে সময় কাটাইতেছিল, তাহার খেয়াল ছিল না। কখন্‌ সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, কখন্‌ চাকরে আলো দিয়া গিয়াছে সে টেরও পায় নাই। চৈতন্য ফিরিয়া আসিল তাহার নিজের চোখের জলে। তাড়াতাড়ি মুছিয়া ফেলিয়া, হাত দিয়া দেখিল, কখন্‌ ফোঁটা ফোঁটা করিয়া অজ্ঞাতসারে পড়িয়া বুকের কাপড় পর্য্যন্ত ভিজিয়া গিয়াছে। ছি ছি—চাকর-বাকর আসিয়াছে—হয় ত তাহারা লক্ষ্য করিয়াছে—হয় ত তাহারা কি মনে করিয়াছে—লজ্জায় আজ সে প্রয়োজনেও কাহাকেও কাছে ডাকিতে পারিল না। রাত্রিতে বিছানায় শুইয়া, জানালা খুলিয়া দিয়া, তেম্‌নি বাহিরের অন্ধকারে চাহিয়া রহিল; অম্‌নি বস্তু-বর্ণহীন শূন্য অন্ধকারের মত নিজের সমস্ত ভবিষ্যৎটা তাহার চোখে ভাসিতে লাগিল। তাহার পরে কখন্‌ ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, তাহার মনে নাই, কিন্তু ঘুম যখন ভাঙিল, তখন প্রভাতের স্নিগ্ধ আলোকে ঘর ভরিয়া গিয়াছে—প্রথমেই মনে পড়িল তাহাকে, যাহার সহিত সে জীবনে পাঁচ-ছয় দিনের বেশি কথা পর্য্যন্ত বলে নাই। আর মনে পড়িল যে অজ্ঞাত বেদনা তাহার ঘুমের

মধ্যেও সঞ্চরণ করিয়া ফিরিয়াছিল, তাহারই সহিত কেমন করিয়া যেন সেই লোকটির ঘনিষ্ঠ সংযোগ আছে।

বেলা বাড়িতে লাগিল। কিন্তু যখনই মনে পড়ে, সমস্ত কাজকর্ম্মের মধ্যে কোথায় তাহার একটি চোখ এবং একটি কান আজ সারাদিন পড়িয়া আছে, তখন নিজের কাছেই তাহার ভারি লজ্জা বোধ হয়। কিন্তু এ যে কিছুই নয়, এ যে শুধু সেই যন্ত্রটা দেখিবার জন্যই মনের কৌতূহল, একবার সেটা দেখা হইয়া গেলেই সমস্ত আগ্রহের নিবৃত্তি হইবে, আজ না হয় ত কাল হইবে—এমন করিয়াও আপনাকে আপনি অনেকবার বুঝাইল কিন্তু কোন কাজেই লাগিল না; বরঞ্চ বেলার সঙ্গে সঙ্গে উৎকণ্ঠা যেন রহিয়া রহিয়া আশঙ্কায় আত্মপ্রকাশ করিতে লাগিল। পৌষের মধ্যাহ্ন-সূর্য্য ক্রমশঃ একপাশে হেলিয়া পড়িল, আলোকের চেহারায় দিনান্তের সূচনা দেখিয়া বিজয়ার বুক দমিয়া গেল। কাল যে লোক চিরদিনের মত দেশ ছাড়িয়া যাইতেছে, আজ সে যদি এত দূরে আসিতে, এতখানি সময় নষ্ট করিতে না পারে, তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কি আছে! তাহার শেষ সম্বলটুকু যদি অপর কাহাকেও বেশি দামে বিক্রয় করিয়া চলিয়া গিয়া থাকে, তাহাতেই বা দোষ দিবে কে? তাহাদের শেষ কথাবার্ত্তাগুলি সে বার বার তোলাপাড়া করিয়া নিরতিশয় অনুশোচনার সহিত মনে করিতে লাগিল যে, মনের মধ্যে তাহার যাহাই থাক্, মুখে সে এ সম্বন্ধে আগ্রহাতিশয্য একেবারেই প্রকাশ করে নাই। ইহাকে অনিচ্ছা কল্পনা করিয়া সে যদি শেষ পর্য্যন্ত পিছাইয়া গিয়া থাকে ত দর্পিতার উচিত শাস্তিই হইয়াছে বলিয়া হৃদয়ের ভিতর হইতে যে কঠিন তিরস্কার বারংবার ধ্বনিত হইয়া উঠিতে লাগিল, তাহার জবাব সে কোন দিকে চাহিয়াই খুঁজিয়া পাইল না। কিন্তু পরেশকে কিম্বা আর কাহাকেও কোন ছলে তাঁহার কাছে পাঠান যায় কি না, পাঠাইলেও তাহারা খুঁজিয়া পাইবে কি

না, তিনি আসিতে স্বীকার করিবেন কি না, এম্‌নি তর্ক-বিতর্ক করিয়া ছট্‌ফট্ করিয়া, ঘড়ির পানে চাহিয়া ঘর-বাহির করিয়া যখন কোন মতেই তাহার সময় কাটিতেছিল না, এম্‌নি সময়ে পরেশ ঘরে ঢুকিয়া সংবাদ দিল, মাঠান্, নিচে এসো, বাবু এসেছে।

বিজয়ার মুখ পাংশু হইয়া গেল; কহিল, কে বাবু রে?

পরেশ কহিল, কাল যে এসে ছ্যালো—তেনার হাতে মস্ত একটা চামড়ার বাক্স রয়েছে মাঠান্।

আচ্ছা, তুই বাবুকে বস্‌তে বল্ গে, আমি যাচ্ছি।

মিনিট দুই-তিন পরে বিজয়া ঘরে ঢুকিয়া নমস্কার করিল। আজ তাহার পরণের কাপড়ে, মাথায় ঈষৎ রুক্ষ এলোচুলে এমন একটা বিশেষত্ব ও পারিপাট্য ছিল, যাহা কাহারও দৃষ্টি এড়াইবার কথা নহে। গতকল্যের সঙ্গে আজকের এই প্রভেদটির দিকে তাকাইয়া ক্ষণকালের জন্য নরেনের মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না। তাহার বিস্মিত-দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া বিজয়ার নিজের দৃষ্টি যখন নিজের প্রতি ফিরিয়া আসিল, তখন লজ্জায়-সরমে সে একেবারে মাটীর সঙ্গে যেন মিশিয়া গেল। মাইক্রস্কোপের ব্যাগটা এতক্ষণ তাহার হাতেই ছিল; সেটা টেবিলের উপর রাখিয়া দিয়া সে ধীরে ধীরে কহিল, নমস্কার। আমি বিলেতে থাক্‌তে ছবি আঁক্‌তে শিখেছিলাম। আপনাকে ত আমি আরও কয়েকবার দেখেছি, কিন্তু আজ আপনি ঘরে ঢুক্‌তেই আমার চোখ খুলে গেল। আমি নিশ্চয় বল্‌তে পারি, যে ছবি আঁক্‌তে জানে, তারই আপনাকে দেখে আজ লোভ হবে। বাঃ কি সুন্দর!

বিজয়া মনে মনে বুঝিল, ইহা সৌন্দর্য্যের পদমূলে অকপট ভক্তের স্বার্থ-গন্ধহীন নিষ্কলুষ স্তোত্র অজ্ঞাতসারে উচ্ছ্বসিত হইয়াছে; এবং এ কথা একমাত্র ইহার মুখ দিয়াই বাহির হইতে পারে। কিন্তু তথাপি নিজের আরক্ত মুখখানা যে সে কোথায় লুকাইবে, এই দেহটাকে তাহার সমস্ত

সাজসজ্জার সহিত যে কি করিয়া লুপ্ত করিবে, তাহা ভাবিয়া পাইল না। কিন্তু মুহূর্ত্তকাল পরেই আপনাকে সংবরণ করিয়া লইয়া মুখ তুলিয়া গম্ভীর-স্বরে কহিল, আমাকে এ রকম অপ্রতিভ করা কি আপনার উচিত? তা ছাড়া, একটা জিনিষ কিন্‌ব বলেই আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছিলাম, ছবি আঁক্‌বার জন্যে ত ডাকি নি। জবাব শুনিয়া নরেনের মুখ শুকাইল। সে লজ্জায় একান্ত সঙ্কুচিত ও কুণ্ঠিত হইয়া অস্ফুট-কণ্ঠে এই বলিয়া ক্ষমা চাহিতে লাগিল যে, সে কিছুই ভাবিয়া বলে নাই—তাহার অত্যন্ত অন্যায় হইয়া গিয়াছে—আর কখনো সে—ইত্যাদি ইত্যাদি। তাহার অনুতাপের পরিমাণ দেখিয়া বিজয়া হাসিল। স্নিগ্ধহাস্যে মুখ উজ্জ্বল করিয়া কহিল, কৈ, দেখি আপনার যন্ত্র।

নরেন বাঁচিয়া গেল। এই যে দেখাই, বলিয়া সে তাড়াতাড়ি অগ্রসর হইয়া তাহার বাক্স খুলিতে প্রবৃত্ত হইল। এই বসিবার ঘরটায় আলো কম হইয়া আসিতেছিল দেখিয়া বিজয়া পাশের ঘরটা দেখাইয়া কহিল, ও-ঘরে এখনো আলো আছে, চলুন ঐখানে যাই।

তাই চলুন, বলিয়া সে বাক্স হাতে লইয়া গৃহস্বামিনীর পিছনে পিছনে পাশের ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল। একটি ছোট টিপয়ের উপর যন্ত্রটি স্থাপিত করিয়া উভয়ে দুই দিকে দুই খানা চেয়ার লইয়া বসিল। নরেন কহিল, এইবার দেখুন। কি ক'রে ব্যবহার করতে হয়, তার পরে আমি শিখিয়ে দেব।

এই অণুবীক্ষণ যন্ত্রটির সহিত যাহাদের সাক্ষাৎ পরিচয় নাই, তাহারা ভাবিতেও পারে না, কত বড় বিস্ময় এই ছোট জিনিষটির ভিতর দিয়া দেখিতে পাওয়া যায়। বাহিরের অসীম ব্রহ্মাণ্ডের মত এম্‌নি সীমাহীন ব্রহ্মাণ্ড যে মানুষের একটি ক্ষুদ্র মুঠার ভিতর ধরিতে পারে, সে আভাস শুধু এই যন্ত্রটির সাহায্যেই পাওয়া যায়। এইটুকুমাত্র ভূমিকা

করিয়াই সে বিজয়ার মনোযোগ আহ্বান করিল। বিলাতে চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষা করার পরে তাহার জ্ঞানের পিপাসা এই জীবাণু-তত্ত্বের দিকেই গিয়াছিল। তাই একদিকে যেমন ইহার সহিত তাহার পরিচয়ও একান্ত ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার সংগ্রহও তেম্‌নি অপর্য্যাপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল। সে সমস্তই সে তাহার এই প্রাণাধিক যন্ত্রটীর সহিত বিজয়াকে দিবার জন্য সঙ্গে আনিয়াছিল। সে ভাবিয়াছিল, এ সকল না দিলে শুধু শুধু যন্ত্রটা লইয়া আর একজনের কি লাভ হইবে। প্রথমে ত বিজয়া কিছুই দেখিতে পায় না—শুধু ঝাপ্সা আর ধোঁয়া। নরেন যতই আগ্রহভরে জিজ্ঞাসা করে, সে কি দেখিতেছে, ততই তাহার হাসি পায়। সেদিকে তাহার চেষ্টাও নাই, মনোযোগও নাই। দেখিবার কৌশলটা নরেন প্রাণপণে বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছে; প্রত্যেক কব্জা নানাভাবে ঘুরাইয়া-ফিরাইয়া দেখাটা সহজ করিয়া তুলিবার বিধিমতে প্রয়াস পাইতেছে; কিন্তু দেখিবে কে? যে বুঝাইতেছে, তাহার কণ্ঠস্বরে আর একজনের বুকের ভিতরটা দুলিয়া দুলিয়া উঠিতেছে, প্রবল নিশ্বাসে তাহার এলোচুল উড়িয়া সর্ব্বাঙ্গ কণ্টকিত করিতেছে, হাতে হাতে ঠেকিয়া দেহ অবশ করিয়া আনিতেছে—তাহার কি আসে-যায় জীবাণুর স্বচ্ছ দেহের অভ্যন্তরে কি আছে, না আছে, দেখিয়া? কে ম্যালেরিয়ায় গ্রাম উজাড় করিতেছে, আর কে যক্ষ্মায় গৃহ শূন্য করিতেছে, চিনিয়া রাখিয়া তাহার লাভ কি? করিলেও ত সে তাহাদের নিবারণ করিতে পারিবে না! সে ত আর ডাক্তার নয়! মিনিট-দশেক ধ্বস্তাধ্বস্তি করিয়া নরেন অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া সোজা উঠিয়া বসিল; কহিল, যান্, এ আপনার কাজ নয়। এমন মোটা বুদ্ধি আমি জন্মে দেখি নি।

বিজয়া প্রাণপণে হাসি চাপিয়া কহিল, মোটা বুদ্ধি আমার, না আপনি বোঝাতে পারেন না।

নিজের রূঢ় কথায় নরেন মনে মনে লজ্জিত হইয়া কহিল, আর কি ক'রে বোঝাবো বলুন? আপনার বুদ্ধি আর কিছু সত্যিই মোটা নয়, কিন্তু আমার নিশ্চয় বোধ হচ্চে, আপনি মন দিচ্চেন না। আমি ব'কে মরচি, আর আপনি মিছিমিছি ওটাতে চোখ রেখে মুখ নিচু ক'রে শুধু হাস্‌চেন।

কে বল্‌লে, আমি হাস্‌চি?

আমি বল্‌চি।

আপনার ভুল।

আমার ভুল? আচ্ছা বেশ, যন্ত্রটা ত আর ভুল নয়, তবে কেন দেখ্‌তে পেলেন না?

যন্ত্রটা আপনার খারাপ, তাই।

নরেন বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া বলিল, খারাপ! আপনি জানেন, এ রকম পাওয়ারফুল মাইক্রস্কোপ এখানে বেশি লোকের নেই। এমন স্পষ্ট দেখাতে—, বলিয়া স্বচক্ষে একবার যাচাই করিয়া লইবার অত্যন্ত ব্যগ্রতায় ঝুঁকিতে গিয়া বিজয়ার মাথার সঙ্গে তাহার মাথা ঠুকিয়া গেল।

উঃ করিয়া বিজয়া মাথা সরাইয়া লইয়া হাত বুলাইতে লাগিল। নরেন অপ্রস্তুত হইয়া কি একটা বলিবার চেষ্টা করিতেই সে হাসিয়া ফেলিয়া কহিল, মাথা ঠুকে দিলে কি হয় জানেন? শিঙ্ বেরোয়।

নরেনও হাসিল। কহিল, বেরোতে হ'লে আপনার মাথা থেকেই তাদের বার হওয়া উচিত।

তা বৈ কি! আপনার এই পুরানো ভাঙ্গা যন্ত্রটাকে ভাল বলি নি ব'লে, আমার মাথাটা শিঙ বেরোবার মত মাথা!

নরেন হাসিল বটে, কিন্তু তাহার মুখ শুষ্ক হইল। ঘাড় নাড়িয়া কহিল, আপনাকে সত্যি বল্‌চি, ভাঙা নয়। আমার কিছু নেই বলেই আপনার

সন্দেহ হচ্চে, আমি ঠকিয়ে টাকা নেবার চেষ্টা করচি, কিন্তু আপনি পরে দেখ্‌বেন।

বিজয়া কহিল, পরে দেখে আর কি করব বলুন? তখন আপনাকে আমি পাব কোথায়?

নরেন তিক্তস্বরে বলিল, তবে কেন বললেন, আপনি নেবেন? কেন মিথ্যে কষ্ট দিলেন?

বিজয়া গম্ভীরভাবে বলিল, তখন আপনিই বা কেন না বললেন, এটা ভাঙা?

নরেন মহা বিরক্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, একশ বার বল্‌চি, ভাঙা নয়, তবু বল্‌বেন ভাঙা?

কিন্তু পরক্ষণেই ক্রোধ সংবরণ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, আচ্ছা, তাই ভাল। আমি আর তর্ক কর্‌তে চাই নে—এটা ভাঙাই বটে। আপনি আমার এইটুকু মাত্র ক্ষতি কর্‌লেন যে, কাল আর যাওয়া হ'ল না। কিন্তু সবাই আপনার মত অন্ধ নয়—কল্‌কাতায় আমি অনায়াসে বেচতে পারি, তা জান্‌বেন। আচ্ছা, চল্‌লুম! বলিয়া সে যন্ত্রটা বাক্সের মধ্যে পূরিবার উদ্যোগ করিতে লাগিল।

বিজয়া গম্ভীরভাবে বলিল, এখ্‌নি যাবেন কি ক'রে? আপনাকে যে খেয়ে যেতে হবে।

না, তার দরকার নেই।

দরকার আছে বৈ কি।

নরেন মুখ তুলিয়া কহিল, আপনি মনে মনে হাস্‌চেন। আমাকে কি পরিহাস কর্‌চেন?

কাল যখন খেতে বলেছিলাম, তখন কি পরিহাস করেছিলাম? সে হবে না, আপনাকে নিশ্চয় খেয়ে যেতে হবে। একটু বসুন, আমি এখুনি

আসচি; বলিয়া বিজয়া হাসি চাপিতে চাপিতে সমস্ত ঘরময় রূপের তরঙ্গ প্রবাহিত করিয়া বাহির হইয়া গেল। মিনিট-পাঁচেক পরেই সে স্বহস্তে খাবারের থালা এবং চাকরের হাতে চায়ের সরঞ্জাম দিয়া ফিরিয়া আসিল। টিপয়টা খালি দেখিয়া কহিল, এর মধ্যে বন্ধ ক'রে ফেলেচেন, আপনার রাগ ত কম নয়!

নরেন উদাস-কণ্ঠে জবাব দিল, আপনি নেবেন না, তাতে রাগ কিসের? কিন্তু ভেবে দেখুন ত, এত বড় একটা ভারি জিনিষ এতদূর বয়ে আন্‌তে, বয়ে নিয়ে যেতে কত কষ্ট হয়।

থালাটা টেবিলের উপর রাখিয়া দিয়া বিজয়া কহিল, তা হ'তে পারে। কিন্তু কষ্ট ত আমার জন্যে করেন নি, করেছেন নিজের জন্যে। আচ্ছা খেতে বসুন, আমি চা তৈরী ক'রে দিই।

নরেন খাড়া বসিয়া রহিল দেখিয়া সে পুনরায় কহিল, আচ্ছা, আমিই না হয় নেব, আপনাকে বয়ে নিয়ে যেতে হবে না। আপনি খেতে আরম্ভ করুন।

নরেন নিজেকে অপমানিত মনে করিয়া বলিল, আপনাকে দয়া করতে ত আমি অনুরোধ করি নি।

বিজয়া কহিল, সেদিন কিন্তু করেছিলেন, যেদিন মামার হয়ে বল্‌তে এসেছিলেন।

সে পরের জন্যে, নিজের জন্যে নয়! এ অভ্যাস আমার নেই।

কথাটা যে কতদূর সত্য, বিজয়ার তাহা অগোচর ছিল না। সেই হেতু একটু গায়েও লাগিল। কহিল, যাই হোক্‌, ওটা আপনার ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে না—এইখানেই থাক্‌বে। আচ্ছা, খেতে বসুন।

নরেন সন্দিগ্ধ-স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, তার মানে?

বিজয়া বলিল, কিছু একটা আছে বৈ কি।

জবাব শুনিয়া নরেন ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। বোধ করি মনে মনে এই কারণটা অনুসন্ধান করিল, এবং পরক্ষণেই হঠাৎ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়া উঠিল, সেইটে কি, তাই আমি আপনার কাছে স্পষ্ট শুন্‌তে চাচ্চি। আপনি কি কেন্‌বার ছলে কাছে আনিয়ে আটকাতে চান? এও কি বাবা আপনার কাছে বাঁধা রেখেছিলেন? আপনি ত তা হ'লে দেখচি আমাকেও আটকাতে পারেন? অনায়াসে বলতে পারেন, বাবা আমাকেও আপনার কাছে বাঁধা দিয়ে গেছেন।

বিজয়ার মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল; সে ঘাড় ফিরাইয়া কহিল, কালিপদ, তুই দাঁড়িয়ে কি কর্‌চিস্? ও-গুলো নামিয়ে রেখে, যা পান নিয়ে আয়।

ভৃত্য কেৎলি প্রভৃতি টেবিলের একধারে নামাইয়া দিয়া প্রস্থান করিলে, বিজয়া নিঃশব্দে নতমুখে চা প্রস্তুত করিতে লাগিল, এবং অদূরে চৌকির উপর নরেন মুখখানা রাগে হাঁড়ির মত করিয়া বসিয়া রহিল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

সৃষ্টিতত্ত্বের যাহা অজ্ঞেয় ব্যাপার, তাহার সম্বন্ধে বিজয়া বড় বড় পণ্ডিতের মুখে অনেক আলোচনা, অনেক গবেষণা শুনিয়াছে, কিন্তু যে অংশটা তাহার জ্ঞেয়, সে কোথায় শুরু হইয়াছে, কি তাহার কার্য্য, কেমন তাহার আকৃতি-প্রকৃতি, কি তাহার ইতিহাস, এমন দৃঢ় এবং সুস্পষ্ট ভাষায় বলিতে সে যে আর কখনো শুনিয়াছে, তাহার মনে হইল না। যে যন্ত্রটাকে সে এইমাত্র ভাঙা বলিয়া উপহাস করিতেছিল, তাহারই সাহায্যে কি অপূর্ব্ব এবং অদ্ভুত ব্যাপার না তাহার দৃষ্টিগোচর হইল। এই রোগা এবং ক্ষ্যাপাটে গোছের লোকটি যে ডাক্তারি পাশ করিয়াছে,

ইহাই ত বিশ্বাস হইতে চায় না। কিন্তু শুধু তাহাই নয়। জীবিতদের সম্বন্ধে ইহার জ্ঞানের গভীরতা, ইহার বিশ্বাসের দৃঢ়তা, ইহার স্মরণ করিয়া রাখিবার অসামান্য শক্তির পরিচয়ে সে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া গেল। অথচ সামান্য লোকের মত ইহাকে রাগাইয়া দেওয়া কত না সহজ। শেষা-শেষি সে কতক বা শুনিতেছিল, কতক বা তাহার কানেও প্রবেশ করিতেছিল না। শুধু মুখপানে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়াছিল। নিজের ঝোঁকে সে যখন নিজেই বকিয়া যাইতেছিল, শ্রোতাটি হয় ত তখন ইহার ত্যাগ, ইহার সততা, ইহার সরলতার কথা মনে মনে চিন্তা করিয়া স্নেহে, শ্রদ্ধায়, ভক্তিতে বিভোর হইয়া বসিয়াছিল।

হঠাৎ একসময়ে নরেনের চোখে পড়িয়া গেল যে, সে মিথ্যা বকিয়া মরিতেছে। কহিল, আপনি কিছুই শুন্‌চেন না।

বিজয়া চকিত হইয়া বলিল, শুন্‌চি বৈ কি।

কি শুন্‌চেন, বলুন ত?

বাঃ—একদিনেই বুঝি সবাই শিখতে পারে?

নরেন হতাশভাবে কহিল, না, আপনার কিছু হবে না। আপনার মত অন্যমনস্ক লোক আমি জন্মে দেখি নি।

বিজয়া লেশমাত্র অপ্রতিভ না হইয়া বলিল, এক দিনেই বুঝি হয়? আপনারই নাকি একদিনে হয়েছিল?

নরেন হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিল, আপনার যে একশ বছরেও হবে না। তা ছাড়া এ সব শেখাবেই বা কে?

বিজয়া মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিল, আপনি। নইলে ঐ ভাঙা যন্ত্রটা কে নেবে?

নরেন গম্ভীর হইয়া কহিল, আপনার নিয়েও কাজ নেই, আমি শেখাতেও পারব না।

বিজয়া কহিল, তা হ'লে ছবি-আঁকা শিখিয়ে দিন। সে ত শিখ্‌তে পারব?

নরেন উত্তেজিত হইয়া বলিল, তাও না। যে বিষয়ে মানুষের নাওয়া-খাওয়া জ্ঞান থাকে না, তাতেই যখন মন দিতে পার্‌লেন না, মন দেবেন ছবি আঁকাতে? কিছুতেই না।

তা হ'লে ছবি-আঁকাও শিখ্‌তে পারব না?

না।

বিজয়া ছদ্ম গাম্ভীর্য্যের সহিত কহিল, কিছুই না শিখ্‌তে পার্‌লে মাথায় শিঙ্‌ বেরোবে।

তাহার মুখের ভাবে ও কথায় নরেন পুনরায় উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিল। কহিল, সেই আপনার উচিত শাস্তি।

বিজয়া মুখ ফিরাইয়া হাসি গোপন করিয়া বলিল, তা বই কি। আপনার শেখাবার ক্ষমতা নেই তাই কেন বলুন না। কিন্তু চাকরেরা কি কর্‌চে, আলো দেয় না কেন? একটু বসুন, আমি আলো দিতে ব'লে আসি। বলিয়া দ্রুতপদে উঠিয়া, দ্বারের পর্দা সরাইয়া, অকস্মাৎ যেন ভূত দেখিয়া থমকিয়া গেল। সম্মুখেই বসিবার ঘরের দুটা চৌকি দখল করিয়া পিতা-পুত্র, রাসবিহারী ও বিলাসবিহারী বসিয়া আছেন। বিলাসের মুখের উপর কে যেন এক ছোপ কালি মাখাইয়া দিয়াছে। বিজয়া আপনাকে সংবরণ করিয়া লইয়া অগ্রসর হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কখন্ এলেন কাকাবাবু? আমাকে ডাকেন নি কেন?

রাসবিহারী শুষ্ক হাস্য করিয়া কহিলেন, প্রায় আধ ঘণ্টা এসেছি মা। তুমি ও-ঘরে কথায়-বার্ত্তায় ব্যস্ত আছ ব'লে আর ডাকি নি। ওই বুঝি জগদীশের ছেলে? কি চায় ও?

পাশের ঘর পর্য্যন্ত শব্দ না পৌছায়, বিজয়া এম্‌নি মৃদুস্বরে বলিল,

একটা মাইক্রস্কোপ বিক্রী ক'রে উনি বর্ম্মায় যেতে চান। তাই দেখাচ্ছিলেন।

বিলাস ঠিক যেন গর্জ্জন করিয়া উঠিল—মাইক্রস্কোপ! ঠকাবার জায়গা পেলে না ও!

রাসবিহারী মৃদু ভং'সনার ভাবে ছেলেকে বলিলেন, ও কথা কেন? তার উদ্দেশ্য ত আমরা জানি নে—ভালও ত হ'তে পারে।

বিজয়ার মুখের প্রতি চাহিয়া ঈষৎ হাস্যের সহিত ঘাড়টা নাড়িয়া কহিলেন, যা জানি নে, সে সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করা আমি উচিত মনে করি নে। তার উদ্দেশ্য মন্দ নাও ত হ'তে পারে—কি বল মা? বলিয়া একটু থামিয়া নিজেই পুনরায় কহিলেন, অবশ্য জোর ক'রে কিছুই বলা যায় না, সেও ঠিক। তা, সে যাই হোক্ গে, ওতে আমাদের আবশ্যক কি? দূরবীণ হ'লেও না হয় কখনো কালে-ভদ্রে দূরে টুরে দেখতে কাজে লাগতেও পারে।—ও কে, কালিপদ? ও ঘরে আলো দিতে যাচ্ছিস্? অম্নি বাবুটিকে ব'লে দিস আমরা কিন্‌তে পারব না—তিনি যেতে পারেন।

বিজয়া ভয়ে ভয়ে বলিল, তাঁকে বলেছি, আমি নেব।

রাসবিহারী কিছু আশ্চর্য্য হইয়া কহিলেন, নেবে? কেন? তাতে প্রয়োজন কি?

বিজয়া মৌন হইয়া রহিল।

রাসবিহারী জিজ্ঞাসা করিলেন, উনি কত দাম চান?

দু'শ টাকা।

রাসবিহারী দুই ভ্রূ প্রসারিত করিয়া কহিলেন, দু'শ? দু'শ টাকা চায়? বিলাস ত তা হ'লে নেহাৎ—কি বল বিলাস, কলেজে তোমার এক-এ ক্লাসে কেমিষ্ট্রিতে ত এসব অনেক ঘাঁটাঘাঁটি করেচ—দু'শ টাকা

একটা মাইক্রস্কোপের দাম?—কালিপদ, যা—ওঁকে যেতে ব'লে দে—এ সব ফন্দি এখানে খাটবে না।

কিন্তু যাকে বলিতে হইবে, সে নিজের কানেই সমস্ত শুনিতেছে তাহাতে লেশমাত্র সন্দেহ নাই। কালিপদ যাইবার উপক্রম করিতেছে দেখিয়া বিজয়া তাহাকে শান্ত অথচ দৃঢ়কণ্ঠে বলিয়া দিল, তুমি শুধু আলো দিয়ে এসো গে, যা বল্‌বার আমি নিজেই বল্‌ব।

বিলাস শ্লেষ করিয়া তাহার পিতাকে কহিল, কেন বাবা, তুমি মিথ্যে অপমান হতে গেলে? ওঁর হয় ত এখনো কিছু দেখিয়ে নিতে বাকি আছে।

রাসবিহারী কথা কহিলেন না, কিন্তু ক্রোধে বিজয়ার মুখ রাঙা হইয়া উঠিল। বিলাস তাহা লক্ষ্য করিয়াও বলিয়া ফেলিল, আমরাও অনেক রকম মাইক্রস্কোপ দেখেচি বাবা, কিন্তু হো হো ক'রে হাসবার বিষয় কখনো কোনটার মধ্যে পাই নি।

কাল খাওয়ানোর কথাও সে জানিতে পারিয়াছিল, আজ উচ্চহাস্যও সে স্বকর্ণে শুনিয়াছিল। বিজয়ার আজিকার বেশভূষার পারিপাট্যও তাহার দৃষ্টি এড়ায় নাই। ঈর্ষার বিষে সে এম্‌নি জ্বলিয়া মরিতেছিল যে, তাহার আর দিগ্বিদিক্ জ্ঞান ছিল না। বিজয়া তাহার দিকে সম্পূর্ণ পিছন ফিরিয়া রাসবিহারীকে কহিল, আমার সঙ্গে কি আপনার কোন বিশেষ কথা আছে কাকাবাবু?

রাসবিহারী অলক্ষ্যে পুত্রের প্রতি একটা কটাক্ষ হানিয়া স্নিগ্ধকণ্ঠে বিজয়াকে কহিলেন, কথা আছে বৈ কি মা! কিন্তু তার জন্যে তাড়াতাড়ি কি?

একটু থামিয়া কহিলেন, আর—ভেবে দেখলাম, ওকে কথা যখন দিয়েচ, তখন যাই হোক সেটা নিতে হবে বৈ কি। দুশ টাকা বেশি

না কথাটার দাম বেশি! তা না হয়, ওকে কাল একবার এসে টাকাটা নিয়ে যেতে ব'লে দিক্ না মা?

বিজয়া এ প্রশ্নের জবাব না দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনার সঙ্গে কি কাল কথা হতে পারে না কাকাবাবু?

রাসবিহারী একটু বিস্মিত হইয়া বলিলেন, কেন মা?

বিজয়া মুহূর্ত্তকাল স্থির থাকিয়া, দ্বিধা-সঙ্কোচ সবলে বর্জ্জন করিয়া কহিল, ওঁর রাত হয়ে যাচ্চে—আবার অনেক দূর যেতে হবে। ওর সঙ্গে আমার কিছু আলোচনা করবার আছে।

তাহার এই স্পর্দ্ধিত প্রকাশ্যতায় বৃদ্ধ মনে মনে স্তম্ভিত হইয়া গেলেও বাহিরে তাহার লেশমাত্র প্রকাশ পাইতে দিলেন না। চাহিয়া দেখিলেন, পুত্রের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চক্ষু দুটি অন্ধকারে হিংস্র শ্বাপদের মত ঝক্ ঝক্ করিতেছে এবং কি একটা সে বলিবার চেষ্টায় যেন যুদ্ধ করিতেছে; ধূর্ত্ত রাসবিহারী অবস্থাটা চক্ষের নিমিষে বুঝিয়া লইয়া তাহাকে কটাক্ষে নিবারণ করিয়া প্রফুল্ল হাসিমুখে কহিলেন, বেশ ত মা, আমি কাল সকালেই আবার আসব। বিলাস, অন্ধকার হয়ে আসবে বাবা, চল, আমরা যাই। বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, এবং ছেলের বাহুতে একটু মৃদু আকর্ষণ দিয়া তাহার অবরুদ্ধ দুর্দ্দাম ক্রোধ ফাটিয়া বাহির হইবার পূর্ব্বেই সঙ্গে করিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

বিজয়া সেই অবধি বিলাসের প্রতি একেবারেই চাহে নাই। সুতরাং তাহার মুখের ভাব ও চোখের চাহনি স্বচক্ষে দেখিতে না পাইলেও মনে মনে সমস্ত অনুভব করিয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কাঠের মত দাঁড়াইয়া রহিল।

কালিপদ এ ঘরে বাতি দিতে আসিয়া কহিল, ও-ঘরে আলো দিয়ে এসেছি মা।

আচ্ছা, বলিয়া বিজয়া নিজেকে সংযত করিয়া পরক্ষণে দ্বারের পর্দা সরাইয়া ধীরে ধীরে এ ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল। নরেন ঘাড় হেঁট করিয়া কি ভাবিতেছিল, উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার নিশ্বাস চাপিবার ব্যর্থ চেষ্টাও বিজয়ার কাছে ধরা পড়িল! একটুখানি চুপ করিয়া নরেন দুঃখের সহিত কহিল, এটা আমি সঙ্গে নিয়েই যাচ্চি, কিন্তু আজকের দিনটা আপনার বড় খারাপ গেল। কি জানি কার মুখ দেখে সকালে উঠেছিলেন আপনাকে অনেক অপ্রিয় কথা আমিও বলেচি, ওঁরাও বলে গেলেন।

বিজয়ার মনের ভিতরটায় তখনো জ্বালা করিতেছিল, সে মুখ তুলিয়া চাহিতেই তাহার অন্তরের দাহ দুই চক্ষে দীপ্ত হইয়া উঠিল; অবিচলিত কণ্ঠে কহিল, তার মুখ দেখেই আমার যেন রোজ ঘুম ভাঙে। আপনি সমস্ত কথা নিজের কানে শুনেছেন বলেই বল্‌চি নে, আপনার সম্বন্ধে তারা যে সব অসম্মানের কথা বলেছেন, সে তাঁদের অনধিকার চর্চ্চা। কাল তাঁদের আমি তা বুঝিয়ে দেব।

অতিথির অসম্মান যে তাহার কিরূপ লাগিয়াছে নরেন তাহা বুঝিয়াছিল, কিন্তু শান্ত সহজ ভাবে কহিল, আবশ্যক কি? এ সব জিনিষের ধারণা নেই বলেই তাঁদের সন্দেহ হয়েচে, নইলে আমাকে অপমান করায় তাঁদের কোন লাভ নেই। আপনার নিজেরও ত প্রথমে নানা কারণে সন্দেহ হয়েছিল, সে কি অসম্মান করার জন্যে? তাঁরা আপনার আত্মীয়, শুভাকাঙ্ক্ষী, আমার জন্যে তাঁদের ক্ষুণ্ণ করবেন না। কিন্তু রাত হ'য়ে যাচ্চে—আমি যাই।

কাল কি পরশু একবার আসতে পারবেন?

কাল কি পরশু? কিন্তু, আর ত সময় হবে না। কাল আমি যাচ্চি, অবশ্য কালই বর্ম্মায় যাওয়া হবে না; কলকাতায় কয়েকদিন থাকতে হবে, কিন্তু আর দেখা করবার—

বিজয়ার দুই চক্ষু জলে ভরিয়া গেল, সে না পারিল মুখ তুলিতে, না পারিল কথা কহিতে। নরেন আপনিই একটু হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, আপনি নিজে এত হাসাতে পারেন, আর আপনারই এত সামান্য কথায় এমন রাগ হয়? আমিই বরঞ্চ একবার রেগে উঠে আপনাকে মোটাবুদ্ধি প্রভৃতি কত কি ব'লে ফেলেচি; কিন্তু তাতে ত রাগ করেন নি, বরঞ্চ মুখ টিপে হাস্‌ছিলেন দেখে আমার আরও রাগ হচ্ছিল। কিন্তু আপনাকে আমার সর্ব্বদা মনে পড়বে—আপনি ভারি হাসাতে পারেন।

ক্ষান্ত-বর্ষণ বৃষ্টির জল দমকা হাওয়ায় যেমন করিয়া পাতা হইতে ঝরিয়া পড়ে, তেমনি শেষ কথাটায় কয়েক ফোঁটা চোখের জল বিজয়ার চোখ দিয়া টপ টপ করিয়া মাটির উপর ঝরিয়া পড়িল। কিন্তু পাছে হাত তুলিয়া মুছিতে গেলে অপরের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়, এই ভয়ে সে নিঃশব্দ নতমুখে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

নরেন বলিতে লাগিল, এটা নিতে পার্‌লেন না ব'লে আপনি দুঃখিত—, বলিয়াই সহসা কথার মাঝখানে থামিয়া গিয়া এই কাণ্ড-জ্ঞান-বর্জ্জিত বৈজ্ঞানিক চক্ষের নিমিষে এক বিষম কাণ্ড করিয়া বসিল। অকস্মাৎ হাত বাড়াইয়া বিজয়ার চিবুক তুলিয়া ধরিয়া সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল, এ কি, আপনি কাঁদ্‌চেন?

বিদ্যুদ্বেগে বিজয়া দুই পা পিছাইয়া গিয়া চোখ মুছিয়া ফেলিল। নরেন হতবুদ্ধি হইয়া শুধু জিজ্ঞাসা করিল, কি হ'ল?

এ সকল ব্যাপার সে বেচারার বুদ্ধির অতীত। সে জীবাণুদের চিনে, তাহাদের নাম-ধাম, জাতি-গোত্রের কোন খবর তাহার অপরিজ্ঞাত নয়, তাহাদের কার্য্যকলাপ, রীতিনীতি সম্বন্ধে কখনো তাহার একবিন্দু ভুল হয় না, তাহাদের আচার ব্যবহারের সমস্ত হিসাব তাহার নখাগ্রে—কিন্তু এ কি? যাহাকে নির্ব্বোধ বলিয়া গালি দিলে লুকাইয়া হাসে, এবং শ্রদ্ধায়,

কৃতজ্ঞতায় তদ্গত হইয়া প্রশংসা করিলে কাঁদিয়া ভাসাইয়া দেয়, এমন অদ্ভুত-প্রকৃতি জীবকে লইয়া সংসারের জ্ঞানী লোকের সহজ কারবার চলে কি করিয়া? সে খানিকক্ষণ স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া আস্তে আস্তে ব্যাগটা হাতে তুলিয়া লইতেই বিজয়া রুদ্ধকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, ওটা আমার আপনি রেখে দিন। বলিয়া কান্না আর চাপিতে না পারিয়া দ্রুতপদে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

সেটা নামাইয়া রাখিয়া নরেন হতবুদ্ধির মত মিনিট দুই-তিন দাঁড়াইয়া থাকিয়া বাহিরে আসিয়া দেখিল, কেহ কোথাও নাই। আরও মিনিট-খানেক চুপ করিয়া অপেক্ষা করিয়া অবশেষে শূন্য হাতে অন্ধকার পথ ধরিয়া প্রস্থান করিল।

বিজয়া ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, ব্যাগ আছে, মালিক নাই। সে টাকা আনিতে নিজের ঘরে গিয়াছিল; কিন্তু বিছানায় মুখ গুঁজিয়া কান্না সাম্‌লাইতে যে এতক্ষণ গেছে, তাহার হুঁস ছিল না; ডাক শুনিয়া কালিপদ বাহিরে আসিল। প্রশ্ন শুনিয়া সে মুখে মুখে সাংসারিক কাজের বিরাট ফর্দ্দ দাখিল করিয়া কহিল, সে ভিতরে ছিল, জানেও না বাবু কখন চলিয়া গিয়াছেন। দরওয়ান কানাই সিং আসিয়া বলিল, সে ড়হর ডাল নামাইয়া চপাটি গড়িতেছিল, কোন্ ফুর্‌সতে যে বাবু চুপ্‌সে বাহির হইয়া গিয়াছেন, তাহার মালুমও নাই।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

বিলাসবিহারীর প্রচণ্ড কীর্ত্তি—পল্লীগ্রামে ব্রহ্ম-মন্দির প্রতিষ্ঠার শুভদিন আসন্ন হইয়া আসিল। একে একে অতিথিগণের সমাগম ঘটিতে লাগিল। শুধু কলিকাতার নয়, আশপাশ হইতেও দুই-চারিজন সস্ত্রীক আসিয়া

উপস্থিত হইলেন। কাল সেই শুভদিন। আজ সন্ধ্যায় রাসবিহারী তাঁহার আবাস-ভবনে একটি প্রীতি-ভোজের আয়োজন করিয়াছিলেন।

সংসারে স্বার্থহানির আশঙ্কা কোন কোন বিষয়ী লোককে যে কিরূপ কুশাগ্র-বুদ্ধি ও দূরদর্শী করিয়া তুলে, তাহা নিম্নলিখিত ঘটনা হইতে বুঝা যাইবে।

সমবেত নিমন্ত্রিতগণের মাঝখানে বসিয়া বৃদ্ধ রাসবিহারী তাঁহার পাকা দাড়িতে হাত বুলাইয়া অর্দ্ধমুদিত নেত্রে তাঁহার আবাল্য-সুহৃৎ পরলোকগত বনমালীর উল্লেখ করিয়া গম্ভীর-কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, ভগবান তাঁকে অসময়ে আহ্বান ক'রে নিলেন—তাঁর মঙ্গল-ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমার এতটুকু নালিশ নেই ; কিন্তু সে যে আমাকে কি ক'রে রেখে গেছে আমার বাইরে দেখে সে আপনারা অনুমান করতেও পারবেন না। যদিচ আমাদের সাক্ষাতের দিন প্রতিদিন নিকটবর্ত্তী হয়ে আসচে, সে আভাস আমি প্রতি মুহূর্ত্তেই পাই, তবুও সেই একমাত্র ও অদ্বিতীয় নিরাকার ব্রহ্মের শ্রীচরণে এই প্রার্থনা করি, তিনি তাঁর অসীম করুণায় সেই দিনটিকে যেন আরও সন্নিকটবর্ত্তী ক'রে দেন। বলিয়া তিনি জামার হাতায় চোখের কোণটা মুছিয়া ফেলিলেন। অতঃপর কিছুক্ষণ আত্ম-সমাহিতভাবে মৌনী থাকিয়া, পুনরায় অপেক্ষাকৃত প্রফুল্ল-কণ্ঠে কথা কহিতে লাগিলেন। তাঁহাদের বাল্যের খেলাধূলা, কিশোর বয়সের পড়া-শুনা—তার পর যৌবনে সত্যধর্ম্ম গ্রহণের ইতিহাস বিবৃত করিয়া কহিলেন, কিন্তু বনমালীর কোমল-হৃদয়ে গ্রামের অত্যাচার সহ্য হ'ল না—তিনি কলকাতায় চলে গেলেন। কিন্তু আমি সমস্ত নির্য্যাতন সহ্য ক'রে গ্রামে থাকতেই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হ'লাম। উঃ—সে কি নির্য্যাতন! তথাপি মনে মনে বললাম, সত্যের জয় হবেই। তাঁর মহিমায় একদিন জয়ী হবই। সেই শুভদিন আজ সমাগত—তাই এখানে এতকাল পরে আপনাদের পদধূলি পড়ল। বনমালী আমাদের

মধ্যে আজ নেই—দুদিন পূর্ব্বেই তিনি চলে গেছেন; কিন্তু আমি চোখ বুজলেই দেখতে পাই, ওই, তিনি উপর থেকে আনন্দে মৃদু মৃদু হাস্য কর্‌চেন। বলিয়া তিনি পুনরায় মুদিত-নেত্রে স্থির হইলেন।

উপস্থিত সকলের মনই উত্তেজিত হইয়া উঠিল—বিজয়ার দুচক্ষে অশ্রু টল্ টল্ করিতে লাগিল। রাসবিহারী চক্ষু মেলিয়া সহসা দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করিয়া বলিয়া উঠিলেন, ওই তাঁর একমাত্র কন্যা বিজয়া। পিতার সর্ব্বগুণের অধিকারিণী—কিন্তু কর্ত্তব্যে কঠোর! সত্যে নির্ভীক! স্থির! আর ঐ আমার পুত্র বিলাসবিহারী। এমনি অটল, এমনি দৃঢ়চিত্ত। এরা বাইরে এখনো আলাদা হলেও অন্তরে—হাঁ, আর একটি শুভদিন আসন্ন হয়ে আস্‌চে, যেদিন আবার আপনাদের পদধূলির কল্যাণে এঁদের সম্মিলিত নবীন-জীবন ধন্য হবে।

একটি অস্ফুট, মধুর কলরবে সমস্ত সভাটি মুখরিত হইয়া উঠিল। যে মহিলাটি পাশে বসিয়াছিলেন, তিনি বিজয়ার হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে লইয়া একটু চাপ দিলেন। রাসবিহারী একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস মোচন করিয়া বলিলেন, ঐ তাঁর একমাত্র সন্তান—এটি তাঁর চোখে দেখে যাবার বড় সাধ ছিল; কিন্তু সমস্ত অপরাধ আমার! আজ আপনাদের সকলের কাছে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার কর্‌চি, এর জন্যে দায়ি আমি একা। পদ্মপত্রে শিশির-বিন্দুর মত যে মানব-জীবন, এ শুধু আমরা মুখেই বলি, কিন্তু কাজে মনে করি না! সে যে এত শীঘ্র যেতে পারে সে খেয়াল ত করলাম না।

এই বলিয়া তিনি ক্ষণকালের নিমিত্ত নীরব হইলেন। তাঁহার অনুতাপ-বিদ্ধ অন্তরের ছবি উজ্জ্বল দীপালোকে মুখের উপর ফুটিয়া উঠিল। পুনরায় একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া শান্ত গম্ভীর স্বরে বলিলেন, কিন্তু এবার আমার চৈতন্য হয়েচে। তাই নিজের শরীরের দিকে চেয়ে এই আগামী

ফাল্গুনের বেশি আর আমার বিলম্ব কর্‌বার সাহস হয় না। কি জানি, পাছে আমিওঁ না দেখে যেতে পারি।

আবার একটা অব্যক্ত ধ্বনি উত্থিত হইল। রাসবিহারী দক্ষিণে ও বামে দৃষ্টিপাত করিয়া বিজয়াকে উদ্দেশ করিয়া বলিতে লাগিলেন, বনমালী তাঁর যথাসর্ব্বস্বের সঙ্গে মেয়েকেও যেমন আমার হাতে দিয়ে গেছেন, আমিও তেমনি ধর্ম্মের দিকে দৃষ্টি রেখে আমার কর্ত্তব্য সমাপন ক'রে যাব। ওঁরাও তেম্‌নি আপনাদের আশীর্ব্বাদে দীর্ঘজীবন লাভ করে, সত্যকে আশ্রয় করে, কর্ত্তব্য করুন। যেখান থেকে ওঁদের পিতাকে নির্ব্বাসিত করা হয়েছিল, সেইখানে দৃঢ়-প্রতিষ্ঠিত হয়ে সত্যধর্ম্ম প্রচার করুন, এই আমার একমাত্র প্রার্থনা।

বৃদ্ধ আচার্য্য দয়ালচন্দ্র ধাড়া মহাশয় ইহার উপর আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করিলেন।

রাসবিহারী তখন বিজয়াকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, মা, তোমার বাবা নেই, তোমার জননী সাধ্বীসতী বহুপূর্ব্বেই স্বর্গারোহণ করেছেন, নইলে এ কথা আজ আমার তোমাকে জিজ্ঞাসা কর্‌তে হ'ত না। লজ্জা ক'রো না মা, বল, আজ এইখানেই আমাদের এই পূজনীয় অতিথিগণকে আগামী ফাল্গুন মাসেই আবার একবার পদধূলি দেবার জন্য আমন্ত্রণ ক'রে রাখি।

বিজয়া কথা কহিবে কি, ক্ষোভে, বিরক্তিতে, ভয়ে তাহার কণ্ঠরোধ হইয়া গেল। সে অধোবদনে নিঃশব্দে বসিয়া রহিল। রাসবিহারী ক্ষণকাল মাত্র অপেক্ষা করিয়াই মৃদু হাসিয়া কহিলেন, দীর্ঘজীবী হও মা, তোমাকে কিছুই বল্‌তে হবে না—আমরা সমস্ত বুঝেছি।

তাহার পরে দাঁড়াইয়া, উঠিয়া, দুই হাত মুক্ত করিয়া বলিলেন, আমি আগামী ফাল্গুনেই আর একবার আপনাদের পদধূলির ভিক্ষা জানাচ্ছি।

সকলেই বারবার করিয়া তাঁহাদের সম্মতি জানাইতে লাগিলেন। বিজয়া আর সহ্য করিতে না পারিয়া অব্যক্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, বাবার মৃত্যুর এক বৎসরের মধ্যে—প্রবল বাষ্পোচ্ছ্বাসে কথাটা সে শেষ করিতেও পারিল না।

রাসবিহারী চক্ষের পলকে ব্যাপারটা অনুভব করিয়া গভীর অনুতাপের সহিত তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিলেন, ঠিক ত মা, ঠিক ত। এ যে আমার স্মরণ ছিল না। কিন্তু তুমি আমার মা কি না, তাই এ বুড়ো ছেলের ভুল ধ'রে দিলে।

বিজয়া নীরবে আঁচলে চোখ মুছিল। রাসবিহারী ইহাও লক্ষ্য করিলেন। নিশ্বাস ফেলিয়া আর্দ্রস্বরে বলিলেন, সকলই তাঁর ইচ্ছা। একটু পরে কহিলেন, তাই হবে। কিন্তু তারও ত আর বিলম্ব নেই।

সকলের দিকে চাহিয়া কহিলেন, বেশ, আগামী বৈশাখেই শুভকার্য্য সম্পন্ন হবে। আপনাদের কাছে এই আমাদের পাকা কথা হয়ে রইল। বিলাসবিহারী, বাবা, রাত্রি হয়ে যাচ্চে—কাল প্রভাত থেকে ত কাজের অন্ত থাকবে না—আমাদের আহারের আয়োজনটা—না—না, চাকরদের উপর আর নির্ভর করা নয়—তুমি নিজে যাও—চল, আমি যাচ্ছি—তা হ'লে আপনাদের অনুমতি হ'লে আমি একবার—, বলিতে বলিতেই তিনি পুত্রের পিছনে পিছনে অন্দরের দিকে প্রস্থান করিলেন।

যথাসময়ে প্রীতি-ভোজনের কার্য্য সমাধা হইয়া গেল। আয়োজন প্রচুর হইয়াছিল, কোথাও কোন অংশে ত্রুটি হইল না। রাত্রি প্রায় বারোটা বাজে, একটা থামের আড়ালে, অন্ধকারে একাকী দাঁড়াইয়া বিজয়া পাল্কীর জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। রাসবিহারী তাহাকে যেন হঠাৎ আবিষ্কার করিয়া একেবারে চমকিয়া গেলেন—এখানে একলা দাঁড়িয়ে কেন মা? এসো এসো—ঘরে বস্‌বে এসো।

বিজয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না, কাকাবাবু, আমি বেশ দাঁড়িয়ে আছি।

কিন্তু ঠাণ্ডা লাগবে যে মা ?

না, লাগবে না।

রাসবিহারী তখন পাশে দাঁড়াইয়া 'ঘরের লক্ষ্মী' প্রভৃতি বলিয়া আর একদফা আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। বিজয়া পাথরের মূর্ত্তির মত নির্ব্বাক্ হইয়া এই সমস্ত স্নেহের অভিনয় সহ্য করিতে লাগিল।

অকস্মাৎ তাঁহার একটা কথা মনে পড়িয়া গেল। বলিলেন, তোমাকে সে কথাটা বল্‌তে একেবারেই ভুলে গিয়েছিলাম মা। সেই মাইক্রস্কোপের দামটা তাঁকে আমি দিয়ে দিয়েছি।

আট-দশ দিন হইয়া গেল, নরেন সেই যে সেটা রাখিয়া গেছে, আর আসে নাই। এই কয়টা দিন যে বিজয়ার কি করিয়া কাটিয়াছে, তাহা শুধু সেই জানে। তাঁহার পিসির বাড়ির দূরত্বটাই সে জানিয়া লইয়াছিল, কিন্তু সে যে কোথায়, কোন্ গ্রামে, তাহা জিজ্ঞাসাও করে নাই। এই ভুলটা তাহাকে প্রতিমুহূর্ত্তে তপ্ত শেলে বিঁধিয়া গিয়াছে; কিন্তু কোন উপায় খুঁজিয়া পায় নাই। এখন রাসবিহারীর কথায় সে চকিত হইয়া বলিল, কখন্ দিলেন ?

রাসবিহারী একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন, কি জানি তার পরের দিনই হবে বুঝি। শুন্‌লাম, তুমি সেটা কিন্‌বে বলেই রেখেছ! কথা, কথা। যখন কথা দেওয়া হয়েছে, তখন ঠকাই হোক্, আর যাই হোক্, টাকা দেওয়াও হয়েছে—এই ত আমি সারাজীবন বুঝে এসেছি মা। দেখলাম, সে বেচারার ভারি দরকার—টাকাটা হাতে পেলেই চ'লে যায়—গিয়ে যা হোক্ কিছু কর্‌বার চেষ্টা করে। হাজার হোক্ সেও ত আমার পর নয় মা, সেও ত এক বন্ধুরই ছেলে। দেখলাম, চ'লে যাবার জন্যে ভারি ব্যস্ত—পেলেই চ'লে যায়। আর তোমার দেওয়াও দেওয়া, আমার

দেওয়াও দেওয়া। তাই তখনি দিয়ে দিলাম। তার ধর্ম্ম তার কাছে—দশ টাকা বেশি নিয়ে থাকে, নিক্।

বিজয়ার মুখের মধ্যে জিভটা যেন আড়ষ্ট হইয়া গেল—কিছুতেই যেন আর-কথা ফুটিবে না এম্‌নি মনে হইল। কিছুক্ষণে প্রবল চেষ্টায় বলিয়া ফেলিল, কোথায় তাঁকে টাকা দিলেন?

রাসবিহারী কেমন করিয়া জানি না, প্রশ্নটাকে সম্পূর্ণ অন্য বুঝিয়া চম্‌কাইয়া উঠিয়া কহিলেন, না না, বল কি টাকাটা দুবার ক'রে নিলে নাকি? কিন্তু কৈ, সে রকম ত তার মুখ দেখে মনে হ'ল না? আর কাকেই বা দোষ দেব। এম্‌নি ক'রে লোকের কথায় বিশ্বাস ক'রে ঠক্‌তে ঠক্‌তেই ত দাড়ি পাকিয়ে দিলাম। না হয়, আর দুশ গেল। তা সে টাকাটা আমিই দেব—চিরকাল এই রকম দণ্ড বইতে বইতে কাঁধে কড়া পড়ে গেছে মা, আর লাগে না। যাক্—সে আমি—

বিজয়া আর কিছুতেই সহিতে না পারিয়া রুক্ষস্বরে বলিয়া উঠিল, কেন আপনি মিথ্যে ভয় কর্‌চেন কাকাবাবু? দুবার ক'রে টাকা নেবার লোক তিনি নন—না খেতে পেয়ে মর্‌বার সময় পর্য্যন্ত নন। কিন্তু কোথায় দেখা হ'ল? কবে টাকা দিলেন?

রাসবিহারী অত্যন্ত আশ্বস্ত হইয়া নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, যাক্ বাঁচা গেল। টাকাটাও কম নয়—দুশ! যাবার জন্যে ব্যতিব্যস্ত! হঠাৎ দেখা হতেই—কে দাঁড়িয়ে? বিলাস? পাল্‌কীর কি হ'ল বল দেখি? ঠাণ্ডা লেগে যাচ্ছে যে! যে কাজটা আমি নিজে না দেখব, তাই কি হবে না! বলিয়া অত্যন্ত রাগ করিয়া, তিনি ও-ধারের একটা থামকে বিলাস কল্পনা করিয়া অকস্মাৎ দ্রুতবেগে সেই দিকে ধাবিত হইলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

এমন এক দিন ছিল, যখন বিলাসের হাতে আত্মসমর্পণ করা বিজয়ার পক্ষে কিছুমাত্র কঠিন ছিল না। কিন্তু আজ শুধু বিলাস কেন, এত বড় পৃথিবীতে এত কোটি লোকের মধ্যে কেবল একটিমাত্র লোক ছাড়া আর কেহ তাকে স্পর্শ করিয়াছে ভাবিলেও তাহার সর্ব্বাঙ্গ ঘৃণায় ও লজ্জায়, এবং সমস্ত অন্তঃকরণ কি একটা গভীর পাপের ভয়ে, ত্রস্ত, সশঙ্কিত হইয়া উঠে। এই জিনিসটাকেই সে রাসবিহারীর নিমন্ত্রণ সারিয়া পাল্‌কীতে উঠিয়া নানাদিক দিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে যাচাই করিতে করিতে বাটী আসিতেছিল।

তাহার সম্বন্ধে তাহার পিতার মনোভাব ঠিক কি ছিল, তাহা জানিয়া লইবার যথেষ্ট সুযোগ ঘটে নাই। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পরে তাহার নিজের ভবিষ্যৎ জীবনের ধারণাটা যে বিলাসবিহারীর সহিত সম্মিলিত হইয়া প্রবাহিত হইবে, তাহা স্থির হইয়া গিয়াছিল। কোন মতেই যে ইহার ব্যত্যয় ঘটিতে পারে, এ সম্ভাবনার কল্পনাও কোন দিন তাহার মনে উদয় হয় নাই।

অথচ এই যে একটা অনাসক্ত উদাসীন লোক আকাশের কোন্ এক অদৃশ্য প্রান্ত হইতে সহসা ধূমকেতুর মত উঠিয়া আসিল, এবং এক নিমিষে তাহার বিশাল পুচ্ছের প্রচণ্ড তাড়নায় সমস্ত লণ্ড-ভণ্ড বিপর্য্যস্ত করিয়া দিয়া তাহার সুনির্দ্দিষ্ট পথের রেখাটা পর্য্যন্ত বিলুপ্ত করিয়া দিয়া কোথায় যে নিজে সরিয়া গেল—চিহ্ন পর্য্যন্ত রাখিয়া গেল না—ইহা সত্য, কিংবা নিছক স্বপ্ন, ইহাই বিজয়া তাহার সমস্ত আত্মাকে জাগ্রত করিয়া আজ ভাবিতেছিল। যদি স্বপ্ন হয়, সে মোহ কেমন করিয়া কতদিনে কাটিবে, আর যদি সত্য হয়, তবে তাহাই বা জীবনে কি করিয়া সার্থক হইবে?

ঘরে আসিয়া শয্যায় শুইয়া পড়িল, কিন্তু নিদ্রা তাহার উত্তপ্ত মস্তিষ্কের কাছেও ঘেঁসিল না। আজ যে আশঙ্কাটা তাহার মনে বার বার উঠিতে লাগিল, তাহা এই যে, যে-চিন্তা কিছুদিন হইতে তাহার চিত্তকে অহর্নিশি আন্দোলিত করিতেছে, তাহাতে সত্য বস্তু কিছু আছে, কিংবা সে শুধুই তাহার আকাশ-কুসুমের মালা। এই নিদারুণ সমস্যার গ্রন্থিভেদ করিয়া তাহাকে কে দিবে?

তাহার মা নাই, পিতাও পরলোকে; ভাই-বোন ত কোন দিনই ছিল না—আপনার বলিতে একা রাসবিহারী ব্যতীত আর কেহ নাই। তিনিই বন্ধু, তিনিই বান্ধব, তিনিই অভিভাবক। অথচ কোন্ শুভ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে যে তিনি এমন তাড়া করিয়া তাহার আজন্ম-পরিচিত কলকাতার সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেশে আনিয়া ফেলিয়াছেন, সে আজ বিজয়ার কাছে জলের ন্যায় স্বচ্ছ হইয়া গিয়াছে। এই স্বচ্ছতার ভিতর দিয়া যতদূর দৃষ্টি যায়, আজ সমস্তই তাহার চোখে সুস্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠিতেছে। বিদেশ যাত্রায় নরেনকে অযাচিত সাহায্য দান, নিজের গৃহে এই খাওয়ানোর আয়োজন, সম্মানিত অতিথিদের সম্মুখে এই বিবাহের প্রস্তাব, তাহার সলজ্জ নীরবতার অর্থ মৌন-সম্মতি বলিয়া অসংশয়ে প্রচার করা—তাহাকে সকল দিক্ দিয়া বাঁধিয়া ফেলিতে এই বৃদ্ধের চেষ্টাপরম্পরার কিছুই আর তাহার কাছে প্রচ্ছন্ন নাই।

কিন্তু রহস্য এই যে, অত্যাচার উপদ্রবের লেশমাত্র চিহ্নও রাসবিহারীর কোন কাজে কোথাও বিদ্যমান নাই। অথচ বৃদ্ধের বিনম্র স্নেহ-সরস মঙ্গলেচ্ছার অন্তরালে দাঁড়াইয়া কত দুর্নিবার শাসন যে তাহাকে অহরহ ঠেলিয়া জালের মুখে অগ্রসর করিয়া দিতেছে—উপলব্ধি করার সঙ্গে সঙ্গেই নিজের উপায়-বিহীনত্বের ছবিটা এম্‌নি সুস্পষ্ট হইয়া দেখা দিল যে,

একাকী ঘরের মধ্যেও বিজয়া আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল। সমস্ত রাত্রির মধ্যে সে মুহূর্ত্তের জন্য ঘুমাইতে পারিল না ; তাহার পরলোকগত পিতাকে বারংবার ডাকিয়া কেবলই কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতে লাগিল, বাবা, তুমি ত এদের চিন্‌তে পেরেছিলে, তবে কেন আমাকে এমন ক'রে তাদের মুখের মধ্যে সঁপে দিয়ে গেলে ?

এক সময়ে সে যে নিজেই বিলাসকে পছন্দ করিয়াছিল, এবং তাহারই সহিত একযোগে পিতার ইচ্ছার বিরুদ্ধেও নরেনের সর্ব্বনাশ কামনা করিয়াছিল, সেই কামনাই আজ তাহার সমস্ত শুভ-ইচ্ছাকে পরাভূত করিয়া জয়লাভ করিতেছে, মনে করিয়া তাহার বুক ফাটিতে লাগিল। সে বার বার করিয়া বলিতে লাগিল, স্নেহে অন্ধ হইয়া কেন পিতা এই সর্ব্বনাশের মূল স্বহস্তে উন্মূলিত করিয়া গেলেন না ; কেন তাহারই বুদ্ধি-বিবেচনার উপর সমস্ত নির্ভর করিয়া গেলেন। আর তাই যদি গেলেন, তবে কেন তাহার স্বাধীনতার পথ এমন করিয়া সকল দিক দিয়া রুদ্ধ করিয়া গেলেন ? সমস্ত উপাধান সিক্ত করিয়া সে কেবলই ভাবিতে লাগিল, তাহার এই ক্রুদ্ধ অভিমানের নিষ্ফল নালিশ আজ সেই স্বর্গবাসী পিতার কানে কি পৌঁছিতেছে না ? আজ প্রতীকারের উপায় কি তাঁহার হাতে আর একবিন্দুও নাই ?

পরদিন পরেশের মায়ের ডাকাডাকিতে যখন ঘুম ভাঙ্গিল, তখন বেলা হইয়াছে। উঠিয়াই শুনিল, তাহার বাহিরের ঘর নিমন্ত্রিতগণের অভ্যাগমে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে—শুধু সে-ই উপস্থিত নাই। এই ত্রুটি সারিয়া লইতে সে যথাসাধ্য তাড়াতাড়ি করিবে কি—আজিকার সারাদিনব্যাপী উৎসবের হাঙ্গামা মনে করিতেই তাহার ভারি যেন একটা বিতৃষ্ণা জন্মিল। শীতের প্রভাত-সূর্য্যালোক বাগানের আমগাছের মাথায় মাথায় একেবারে ভরিয়া গিয়াছিল, এবং তাহারই পাতার ফাঁকে ফাঁকে

সুমুখের মাঠের উপর দিয়া রাখাল বালকেরা খেলা করিতে করিতে গরু চরাইতে চলিয়াছিল, দেখিতে পাওয়া গেল। দেশে আসা পর্য্যন্ত এই দৃশ্যটি দেখিতে তাহার কোন দিন ক্লান্তি জন্মিত না। অনেক দিন অনেক দরকারী কাজ ফেলিয়া রাখিয়াও সে বহুক্ষণ পর্য্যন্ত ইহাদের পানে চাহিয়া বসিয়া থাকিত। কিন্তু আজ সে ভাবিয়াই পাইল না, এত দিন কি মাধুর্য্য ইহাতে ছিল! বরঞ্চ এ যেন একটা অত্যন্ত পুরানো বাসি জিনিষের মত তাহার কাছে আগাগোড়া বিস্বাদ ঠেকিল। এই দৃশ্য হইতে সে তাহার শ্রান্ত চোখ ছুটি ধীরে ধীরে ফিরাইয়া লইতেই দেখিতে পাইল, কালিপদ এক এক লাফে তিন তিনটা সিঁড়ি ডিঙাইয়া উপরে উঠিতেছে! চোখোচোখি হইবামাত্র সে মাঝখানেই থামিয়া গিয়া, একটা মহাব্যস্ততার ইঙ্গিত জানাইয়া, হাত তুলিয়া বলিয়া উঠিল, মা, শিগগির, শিগগির! ছোটবাবু ভয়ানক রেগে উঠেছেন! আজ এত দেরিও করতে আছে!

কিন্তু অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ একরাশি বারুদের মধ্যে পড়িয়া যে বিপ্লবের সৃষ্টি করে, ভৃত্যের এই সংবাদটাও বিজয়ার দেহে-মনে ঠিক তেম্‌নি ভীষণ কাণ্ড বাধাইয়া দিল। মনে হইল, তাহার পদতল হইতে কেশাগ্র পর্য্যন্ত যেন এক মুহূর্ত্তেই এক প্রচণ্ড অগ্নিকাণ্ডের ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু হঠাৎ সে কোন কথা কহিতে পারিল না, শুধু স্ফটিকখণ্ড মধ্যাহ্ন-সূর্য্য-কিরণে যেমন করিয়া জলন্ত তেজ বিকীর্ণ করিতে থাকে, তেমনি তাহার ছুই প্রদীপ্ত চক্ষু হইতেও অসহ্য জ্বালা ঠিক্‌রিয়া পড়িতে লাগিল। কালিপদ সেই চোখের পানে চাহিয়া ভয়ে জড়সড় হইয়া কি একটা পুনরায় বলিবার চেষ্টা করিতেই, বিজয়া আপনাকে সামলাইয়া লইয়া কহিল, তুমি নিচে যাও কালিপদ। বলিয়া নিচের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইল।

এ বাটীতে ছোটবাবু বলিতে যে বিলাসবিহারীকে এবং বড়বাবু বলিতে তাহার পিতাকে বুঝায়, বিজয়া তাহা জানিত। কিন্তু এই দুটি পিতা-পুত্রে এখানে এত বড় হইয়া উঠিয়াছেন যে, তাঁহাদের ক্রোধের গুরুত্ব আজ চাকর-বাকরদের কাছে বাড়ির মনিবকে পর্য্যন্ত অতিক্রম করিয়া গিয়াছে, এ খবর বিজয়া এই প্রথম পাইল। আজ সে স্পষ্ট দেখিল, ইহারই মধ্যে বিলাস এখানকার সত্যকার প্রভু এবং সে তাহার আশ্রিতা অনুগ্রহজীবী মাত্র। এ তথ্য যে তাহার মনের আগুনে জলধারা সিঞ্চিত করিল না, তাহা বলাই বাহুল্য।

আধঘণ্টা পরে সে যখন হাত-মুখ ধুইয়া, কাপড় ছাড়িয়া প্রস্তুত হইয়া নিচে নামিয়া আসিল, তখন চা খাওয়া চলিতেছিল। উপস্থিত সকলেই প্রায় উঠিয়া দাঁড়াইয়া অভিবাদন করিল, এবং তাহার মুখ-চোখের শুষ্কতা লক্ষ্য করিয়া অনেকগুলো অস্ফুট-কণ্ঠের উদ্বিগ্ন প্রশ্নও ধ্বনিয়া উঠিল। কিন্তু সহসা বিলাসবিহারীর তীব্র, কটু-কণ্ঠে সমস্ত ডুবিয়া গেল। সে তাহার চায়ের পেয়ালাটা ঠক্ করিয়া টেবিলের উপর নামাইয়া রাখিয়া বলিয়া উঠিল, ঘুমটা এ বেলায় না ভাঙ্‌লেই ত চলত। তোমার ব্যবহারে আমি ক্রমশঃ ডিস্‌গস্‌টেড হয়ে উঠচি, এ কথা না জানিয়ে আর আমি পার্‌লাম না।

বিরক্তি জানাইবার অধিকার তাহার আছে—এ একটা কথা বটে। কিন্তু এতগুলি বাহিরের লোকের সমক্ষে ভাবী স্বামীর এই কর্ত্তব্যপরায়ণতা নিরতিশয় অভদ্রতার আকারেই সকলকে বিস্মিত এবং ব্যথিত করিল। কিন্তু বিজয়া তাহার প্রতি দৃক্‌পাতমাত্র করিল না। যেন কিছুই হয় নাই, এমনিভাবে সে সকলকেই প্রতি-নমস্কার করিয়া, যেখানে বৃদ্ধ আচার্য্য দয়ালবাবু বসিয়াছিলেন, সেইদিকে অগ্রসর হইয়া গেল। বৃদ্ধ অত্যন্ত কুণ্ঠিত হইয়া উঠিয়াছিল। বিজয়া তাঁহার কাছে গিয়া শান্ত-কণ্ঠে কহিল,

আপনার চা খাওয়ার কোন বিঘ্ন হয় নি? আমার অপরাধ হয়ে গেছে—আজ সকালে আমি উঠতে পারি নি।

বৃদ্ধ দয়াল স্নেহার্দ্র স্বরে একেবারেই মা সম্বোধন করিয়া বলিয়া উঠিলেন, না মা, আমাদের কারও কিছুমাত্র অসুবিধে হয় নি। বিলাসবাবু, রাসবিহারীবাবু কোথাও কোন ত্রুটি ঘট্‌তে দেন নি। কিন্তু তোমাকে ত তেমন ভাল দেখাচ্চে না মা; অসুখ-বিসুখ ত কিছু হয় নি?

ইনি সর্ব্বদা কলিকাতায় থাকেন না বলিয়া বিজয়া পূর্ব্ব হইতে ইহাকে চিনিত না। কালও সে ভাল করিয়া ইহাকে লক্ষ্য করিয়া দেখে নাই। কিন্তু আজ ঘরে পা দিয়া দৃষ্টিপাতমাত্রই এই বৃদ্ধের শান্ত, সৌম্য মূর্ত্তি যেন নিতান্ত আপনার জন বলিয়া তাহাকে আকর্ষণ করিয়াছিল। তাই সকলকে বাদ দিয়া সে একেবারেই ইহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। এখন ইহার স্নিগ্ধ কোমল কণ্ঠস্বরে তাহার অন্তরের দাহ যেন অর্দ্ধেক জল হইয়া গেল, এবং সহসা মনে হইল, কেমন করিয়া যেন এই কণ্ঠস্বরে তাহার পিতার কণ্ঠস্বরের আভাস রহিয়াছে।

দয়াল একটা কৌচের উপর বসিয়াছিলেন, পাশে একটু জায়গা ছিল। তিনি সেই স্থানটুকু নির্দ্দেশ করিয়া পরক্ষণেই কহিলেন, দাঁড়িয়ে কেন মা, ব'স এইখানে; অসুখ-বিসুখ ত কিছু করে নি?

বিজয়া পার্শ্বে বসিয়া পড়িল বটে, কিন্তু জবাব দিতে পারিল না, ঘাড় বাঁকাইয়া আর একদিকে চাহিয়া রহিল। অশ্রু দমন করা তাহার পক্ষে যেন উত্তরোত্তর কঠিন হইয়া উঠিতেছিল। বৃদ্ধ আবার সেই প্রশ্নই করিলেন। প্রত্যুত্তরে এবার বিজয়া মাথা নাড়িয়া কোনমতে শুধু কহিল, না।

এই ধরা-গলার সংক্ষিপ্ত উত্তর বৃদ্ধের লক্ষ্য এড়াইল না; তিনি মুহূর্ত্তকালের জন্য মৌন থাকিয়া, ব্যাপারটা অনুভব করিয়া, মনে মনে শুধু একটু হাসিলেন। যিনি এ বাটীর মালিকের জায়গাটি কিছু পূর্ব্বেই

দখল করিয়া বসিয়াছেন, তিনি যদি তাঁর প্রণয়িনী গৃহস্বামিনীকে একটু তিক্ত সম্ভাষণ করিয়া থাকেন ত আনাড়ীদের কাছে তাহা যত বড়ই ঠেকুক, যাঁরা যৌবনের ইতিহাসটুকু শেষ করিয়া দিয়াছেন, তেমন জ্ঞানবৃদ্ধ কেহ যদি মনে মনে একটু হাস্যই করেন ত তাঁহাকে দোষ দেওয়া যায় না।

তখন বৃদ্ধ তাঁহার পার্শ্বোপবিষ্টা এই নবীনা অভিমানীটিকে সুস্থ হইবার সময় দিতে নিজেই ধীরে ধীরে কথা কহিতে লাগিলেন। এত অল্প বয়সেই এই সত্য-ধর্ম্মের প্রতি তাহাদের অবিচলিত নিষ্ঠা ও প্রীতির অসংখ্য প্রশংসা করিয়া অবশেষে বলিলেন, ভগবানের আশীর্ব্বাদে তোমাদের মহৎ উদ্দেশ্য দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি লাভ করুক; কিন্তু মা, যে মন্দির তুমি তোমার গ্রামের মধ্যে প্রতিষ্ঠা কর্‌লে, তাকে বজায় রাখতে তোমাদের অনেক পরিশ্রম, অনেক স্বার্থত্যাগের আবশ্যক হবে। আমি নিজেও ত পাড়াগাঁয়েই থাকি; আমি বেশ দেখেছি, এ ধর্ম্ম এখনও আমাদের পল্লী-সমাজের রস নিয়ে যেন বাঁচতেই চায় না। তাই আমার মনে হয়, একে যদি যথার্থ-ই জীবিত রাখতে পার মা, এ দেশে একটা সত্যিই বড় সমস্যার মীমাংসা হবে। তোমাদের এই উদ্যমকে আমি যে কি ব'লে আশীর্ব্বাদ করব, এ আমি ভেবেই পাই নে।

বিজয়ার মুখে আসিয়া পড়িতেছিল, বলে, মন্দির প্রতিষ্ঠায় আমার আর কোন উৎসাহ নেই, এর লেশমাত্র সার্থকতা আর আমি দেখতে পাচ্ছি নে। কিন্তু সে কথা চাপিয়া গিয়া মৃদুস্বরে শুধু জিজ্ঞাসা করিল, একটা জটিল সমস্যার সমাধান হবে আপনি কেন বল্‌ছেন?

দয়াল কহিলেন, তা বই কি মা। আমার আন্তরিক বিশ্বাস, বাঙলার পল্লীর সহস্রকোটী কুসংস্কার থেকে মুক্তি দিতে শুধু আমাদের এই ধর্ম্মই পারে। কিন্তু এও জানি, যার যেখানে স্থান নয়, যার যেখানে

প্রয়োজন নেই সে সেখানে বাঁচে না। কিন্তু চেষ্টায়, যত্নে যদি একটিকেও বাঁচাতে পারা যায়, সে কি মস্ত একটা আশা-ভরসার আশ্রয় নয়? আমাদের বাঙালী-ঘরে দোষ গুণের কথা তুমি নিজেও ত কম জান না মা! সেইগুলি সব অন্তরের মধ্যে ভাল ক'রে একটুখানি তলিয়ে ভেবে দেখ দেখি।

বিজয়া আর প্রশ্ন না করিয়া চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিল। স্বদেশের মঙ্গল-কামনা তাহার মধ্যে যথার্থ-ই স্বাভাবিক ছিল, আচার্য্যের শেষ-কথাটায় তাহাই আলোড়িত হইয়া উঠিল। এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠা সংস্পর্শে একটা মস্ত নামের অন্তরালে থাকিয়া বিলাস তাহার হৃদয়ের অত্যন্ত ব্যথার স্থানটাতেই পুনঃপুনঃ আঘাত করিতেছিল। সে বেদনায় ছটফট করিতেছিল, অথচ প্রতিঘাত করিবার উপায় ছিল না বলিয়া তাহার সমস্ত চিত্ত সমস্ত ব্যাপারটার বিরুদ্ধেই বিদ্বেষে প্রায় অন্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু দয়াল যখন তাঁহার প্রশান্ত মূর্ত্তি ও স্নিগ্ধ-কণ্ঠের আহ্বানে বিলাসের চেষ্টার এই বিশেষ দিক্‌টায় চোখ মেলিতে তাহাকে অনুরোধ করিলেন, তখন বিজয়া সত্য সত্যই যেন নিজের ভ্রম দেখিতে পাইল। তাহার মনে হইতে লাগিল, বিলাস হয় ত বাস্তবিকই হৃদয়হীন এবং ক্রূর নয়, তাহার কঠোরতা হয় ত প্রবল ধর্ম্মানুরক্তির একটা প্রকাশমাত্র। মানুষের ইতিহাসে এরূপ দৃষ্টান্তের ত অভাব নাই। তাহার মনে পড়িল, সে কোথায় যেন পড়িয়াছে, সংসারে সকল বড় কার্য্যই কাহারো-না-কাহারো ক্ষতিকর হয়; যাঁহারা এই কার্য্যভার স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেন, তাঁহারা অনেকেও মঙ্গলের জন্য সামান্য ক্ষতিতে ভ্রূক্ষেপ করিবার অবসর পান না। সেই জন্য অনেক স্থলেই তাঁহারা নির্দ্দয় নিষ্ঠুর বলিয়া জগতে প্রচারিত হন। চিরদিনের শিক্ষা ও সংস্কারবশে ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের প্রতি অনুরাগ বিজয়ার কাহারও অপেক্ষা কম ছিল না।

সেই ধর্ম্মের বিস্তৃতির উপর দেশের এতখানি মঙ্গল নির্ভর করিতেছে শুনিয়া তাহার উচ্চ-শিক্ষিত সত্যপ্রিয় অন্তঃকরণ তৎক্ষণাৎ বিলাসকে মনে মনে ক্ষমা না করিয়া থাকিতে পারিল না। এমন কি, সে আপনাকে আপনি বলিতে লাগিল, সংসারে যাহারা বড় কাজ করিতে আসে, তাহাদিগের ব্যবহার আমাদের মত সাধারণ লোকের সহিত বর্ণে বর্ণে না মিলিলেই তাহাদিগকে দোষী করা অসঙ্গত, এমন কি অন্যায়; এবং অন্যায়কে অন্যায় বুঝিয়া কোন কারণেই প্রশ্রয় দিতে পারিব না।

বেলা হইতেছিল বলিয়া সকলেই একে একে উঠিতেছিলেন। বিজয়াও উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল। রাসবিহারী ছেলেকে একটু আড়ালে ডাকিয়া কি একটা কথা বলিবার পরে, সে এই সুযোগটার জন্যই যেন প্রতীক্ষা করিতেছিল; কাছে আসিয়া বলিল, তোমার শরীরটা কি আজ সকালে ভাল নেই বিজয়া?

আধঘণ্টা পূর্ব্বেও হয় ত সে প্রশ্নটাকে একেবারেই উপেক্ষা করিয়া যা হোক একটা কিছু বলিয়া চলিয়া যাইত, কিন্তু এখন সে মুখ তুলিয়া চাহিল। সহজভাবে বলিল, না, ভালই আছি। কাল রাত্রে ঘুম হয় নি বলেই বোধ করি একটু অসুস্থ দেখাচ্চে।

বিলাসের মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। এমন অনেক লোক আছে, যাহারা আঘাতের বদলে প্রতিঘাত না করিয়া কিছুতেই থাকিতে পারে না। নিজের সমূহ ক্ষতি বুঝিয়াও সহিতে পারে না। বিলাস তাহাদেরই একজন। তাহার প্রতি বিজয়ার আচরণ প্রতিদিন যতই অপ্রীতিকর হইতেছিল, তাহার নিজের আচরণও ততোধিক নিষ্ঠুর হইয়া উঠিতেছিল। এইরূপে ঘাত-প্রতিঘাতের আ[illegible] প্রতি মুহূর্ত্তেই যখন মারাত্মক হইয়া দাঁড়াইতেছিল, তখন পক্ক-কেশ অভিজ্ঞ পিতার পুনঃপুনঃ সনির্ব্বন্ধ অনুযোগ সহিষ্ণুতার পরম লাভ ও চরম সিদ্ধি

সম্বন্ধে নিভৃত গভীর উপদেশ অনভিজ্ঞ উদ্ধত পুত্রের কোন কাজেই লাগিতেছিল না; কিন্তু বিজয়ার মুখের এই একটিমাত্র কোমল বাক্য বিলাসের স্বভাবটাকেই যেন বদলাইয়া দিল। সে স্বাভাবিক কর্কশ কণ্ঠ যতদূর সাধ্য করুণ করিয়া কহিল, তা হ'লে তুমি এ-বেলায় রোদে আর বার হ'য়ো না। সকাল সকাল স্নানাহার সেরে যদি একটু ঘুমোতে পার, সেই চেষ্টা করো। সিস্‌ন চেঞ্জের সময়টা ভাল নয়—অসুখ-বিসুখ না হয়ে পড়ে। এই বলিয়া মুখের চেহারায় উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিয়া, বোধ করি বা নিজের ব্যবহারের জন্য একবার ক্ষমা চাহিতেও উদ্যত হইল; কিন্তু এ বস্তুটা তাহার স্বভাবে নাকি একেবারে নাই, তাই আর কিছু না কহিয়া দ্রুতপদে ভদ্রলোকদিগের অনুসরণ করিয়া বাহির হইয়া গেল।

যতদূর দেখা যায়, বিজয়া তাহার প্রতি চাহিয়া রহিল। তাহার পরে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে তাহার উপরের ঘরে চলিয়া গেল। কিছুকাল অবধি একটা অব্যক্ত পীড়া কাঁটার মত তাহার মনের মধ্যে খচ্ খচ্ করিয়া অহরহ বিঁধিতেছিল, আজ অকস্মাৎ বোধ হইল, সেটার খোঁজ পাওয়া যাইতেছে না।

সন্ধ্যার পর ব্রহ্ম-মন্দিরের প্রতিষ্ঠা যথারীতি সম্পন্ন হইয়া গেল। ভিতরের বিশেষ একটা জায়গায় দুখানা ভাল চেয়ার পাশাপাশি রাখা হইয়াছিল। তাহার একটাতে যখন অত্যন্ত সমারোহের সহিত বিজয়াকে বসান হইল, তখন পার্শ্বের অন্য আসনটা যে কাহার দ্বারা পূর্ণ হইবার অপেক্ষা করিতেছে, তাহা কাহারও বুঝিতে বিলম্ব হইল না। পলকের জন্য বিজয়ার মনের ভিতরটা হু হু করিয়া উঠিল বটে, কিন্তু ক্ষণেক পরেই বিলাস আসিয়া যখন তাহার নির্দ্দিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া বসিল, তখন সে জ্বালা নিবিতেও তাহার বেশি সময় লাগিল না।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

পোড়া তুবড়ির খোলাটার ন্যায় তুচ্ছ বস্তুর মত এই ব্রহ্ম-মন্দির হইতেও পাছে সমারোহ-শেষে লোকের দৃষ্টি অবজ্ঞায় অন্যত্র সরিয়া যায়, এই আশঙ্কায় বিলাসবিহারী উৎসবের জেরটা যেন কিছুতেই আর নিকাশ করিতে চাহিতেছিল না। কিন্তু যাঁহারা নিমন্ত্রণ লইয়া আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের বাড়ি-ঘর আছে, কাজ-কর্ম্ম আছে, পরের খরচে কেবল আনন্দে মাতিয়া থাকিলেই চলে না, সুতরাং শেষ একদিন তাঁহাদের করিতেই হইল। সেদিন বৃদ্ধ রাসবিহারী ছোট একটি বক্তৃতা করিয়া শেষের দিকে বলিলেন, যাঁহার অসীম করুণায় আমরা পৌত্তলিকতার ঘোর অন্ধকার হইতে আলোকে আসিতে পারিয়াছি, সেই একমেবাদ্বিতীয়ম্ নিরাকার পরব্রহ্মের পাদপদ্মে এই মন্দির যাঁহারা উৎসর্গ করিয়াছেন, তাঁহাদের কল্যাণ হোক। আমি সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করি যে, অচির-ভবিষ্যতে সেই দুটি নির্ম্মল নবীন-জীবন চিরদিনের জন্য সম্মিলিত হইবে—সেই শুভ-মুহূর্ত্ত দেখিতে ভগবান যেন আমাদের জীবিত রাখেন। এই বলিয়া সেই দুটী নবীন-জীবনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, মা বিজয়া, বিলাস, তোমরা এঁদের প্রণাম কর। আপনারাও আমার সন্তানদের আশীর্ব্বাদ করুন!

বিজয়া ও বিলাস পাশাপাশি মাটীতে মাথা ঠেকাইয়া প্রবীণ ব্রাহ্মদিগের উদ্দেশে প্রণাম করিল, তাঁহারাও অস্ফুটকণ্ঠে উহাদের আশীর্ব্বাদ করিলেন। তাহার পরে সভাভঙ্গ হইল।

সন্ধ্যার পরে বিজয়া যখন বাটিতে আসিয়া পৌছিল, তখন তাহার মনের মধ্যে কোন বিরাগ, কোন চাঞ্চল্য ছিল না। ধর্ম্মের আনন্দে ও উৎসাহে হৃদয় এমনি পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল যে আপনাকে আপনি

কেবলই বলিতে লাগিল, পার্থিব সুখই একমাত্র সুখ নয়—বরঞ্চ ধর্ম্মের জন্য, পরের সে সুখ বলি দেওয়াই একমাত্র শ্রেয়ঃ!

বিলাসের সহিত তাহার মতের আর কোথাও যদি মিল না হয়, ধর্ম্ম-সম্বন্ধে যে তাহাদের কোন দিন অনৈক্য ঘটিবে না, এ কথা সে জোর করিয়াই নিজেকে বুঝাইল। বিছানায় শুইয়াও সে বার বার ইহাই কহিতে লাগিল—এ ভালই হইল যে, তাহার মত একজন স্থিরসংকল্প স্বধর্ম্মপরায়ণ, কর্ত্তব্যনিষ্ঠ লোকের সহিত তাহার জীবন চিরদিনের জন্য মিলিত হইতে যাইতেছে। ভগবান তাহার দ্বারা নিজের অনেক কার্য্য সম্পন্ন করাইয়া লইবেন বলিয়াই এমন করিয়া তাহার মনের গতি পরিবর্ত্তিত করিয়া দিয়াছেন।

পরদিন বিলাস সকলকেই করযোড়ে আবেদন করিল, তাঁহারা যদি অন্ততঃ মাসে একবার করিয়া আসিয়াও মন্দিরের মর্য্যাদা বৃদ্ধি করেন ত তাহারা আজীবন কৃতজ্ঞ হইয়া থাকিবে। এ অনুরোধ অনেকে স্বীকার করিয়াই বাড়ি গেলেন।

রাসবিহারী আসিয়া বলিলেন, মা বিজয়া, তোমার মন্দিরের স্থায়িত্ব যদি কামনা কর ত দয়ালবাবুকে এখানে রাখ্‌বার চেষ্টা কর।

বিজয়া বিস্মিত ও পুলকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, সে কি সম্ভব কাকাবাবু?

রাসবিহারী হাসিয়া কহিলেন, সম্ভব না হ'লে বল্‌ব কেন মা? তাঁকে ছেলে-বেলা থেকে জানি—এক রকম আমারই বাল্যবন্ধু! অবস্থা ভাল না হ'লেও দয়াল খাঁটি লোক। তোমার জমিদারীতে কোন একটা কাজ দিয়ে তাঁকে অনায়াসে রাখা যেতে পারে। মন্দিরের বাড়িতেও ঘরের অভাব নেই, স্বচ্ছন্দে দু-চারটে ঘর নিয়ে তিনি সপরিবারে বাস করতে পারবেন।

এই বৃদ্ধ ভদ্রলোকটির প্রতি বিজয়ার সত্যিকার শ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল। তাঁহার সাংসারিক হীনাবস্থা শুনিয়া সেই শ্রদ্ধায় করুণা যোগ দিল। সে তৎক্ষণাৎ রাসবিহারীর প্রস্তাব সানন্দে অনুমোদন করিয়া বলিল, ওকে এইখানেই রাখুন। আমি সত্যই ভারি খুসি হ'ব কাকাবাবু।

তাহাই হইল। দয়াল আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

দিন কাটিতে লাগিল। পৌষ শেষ হইয়া মাঘের মাঝামাঝিতে আসিয়া পৌছিল। জমিদারী এবং মন্দিরের কাজ সুশৃঙ্খলায় চলিতে লাগিল—কোথাও যে কোন বিরোধ বা অশান্তি আছে, তাহা কাহারও কল্পনাও উদয় হইল না।

নরেনের কোন সংবাদ নাই। থাকিবার কথাও নহে। শুধু দুদিনের জন্য সে দেশে আসিয়াছিল, দুদিন পরে চলিয়া গিয়াছে। তবে একটা ব্যথা বিজয়ার মনে বাজিত, যখনই সেই মাইক্রস্কোপটার প্রতি তাহার চোখ পড়িত। আর কিছু নয়—শুধু যদি তাহার সেই একান্ত দুঃসময়ে কিছু বেশি করিয়াও জিনিষটার দাম দেওয়া হইত। আর একটা কথা স্মরণ হইলে সে যেমন আশ্চর্য্য হইত, তেমনি কুণ্ঠিত হইয়া পড়িত। দুদিনের পরিচয়ে কেমন করিয়াই না জানি, এই লোকটার প্রতি এত স্নেহ জন্মিয়াছিল, ভাগ্যে তাহা প্রকাশ পায় নাই! না হইলে মিথ্যা মোহ একদিন মিথ্যায় মিলাইয়া যাইতই—কিন্তু সারাজীবন লজ্জা রাখিবার আর ঠাই থাকিত না। তাই, সেই দুদিনের স্নেহ-মমতার পাত্রটিকে যখনই মনে পড়িত, তখনই প্রাণপণ বলে মন হইতে তাহাকে সে দূরে ঠেলিয়া দিত। এমনি করিয়া মাঘ মাসও শেষ হইয়া গেল।

ফাল্গুনের প্রারম্ভেই হঠাৎ অত্যন্ত গরম পড়িয়া চারিদিকে জ্বর দেখা দিতে লাগিল। দিন-দুই হইতে দয়ালবাবু জ্বরে পড়িয়াছিলেন। আজ সকালে তাঁহাকে দেখিতে যাইবার জন্য বিজয়া কাপড় পরিয়া একেবারে

প্রস্তুত হইয়াই নিচে নামিয়াছিল। বুড়া দরওয়ান কানাই সিং লাঠি আনিতে তাহার ঘরে গিয়াছিল, এবং সেই অবকাশে বাহিরের ঘরে বসিয়া বিজয়া এক পেয়ালা চা খাইয়া লইতেছিল।

নমস্কা—র!

বিজয়া চমকিয়া মুখ তুলিয়া দেখিল, নরেন ঘরে ঢুকিতেছে।

তাহার হাতের পেয়ালা হাতে রহিল, শুধু অভিভূতের মত নিঃশব্দে চোখ মেলিয়া চাহিয়া রহিল। না করিল প্রতি-নমস্কার, না বলিল বসিতে।

একটা চেয়ারের পিঠে নরেন তাহার লাঠিটা হেলান দিয়া রাখিল; আর একখানা চৌকি টানিয়া লইয়া বসিল; কহিল, এ কাজটা আমারও এখনো সারা হয় নি—আর এক পেয়ালা চা আন্‌তে হুকুম ক'রে দিন ত!

দিই, বলিয়া বিজয়া হাতের বাটিটা নামাইয়া রাখিয়া বাহির হইয়া গেল। কিন্তু কালিপদকে বলিয়া দিয়াই তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া আসিতে পারিল না। উপরে যাইবার সিঁড়ির রেলিঙ ধরিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার বুকের ভিতরটা ভীষণ ঝড়ে সমুদ্রের মত উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিল। কোন কারণেই হৃদয় যে মানুষের এমন করিয়া দুলিয়া উঠিতে পারে, ইহা সে জানিতই না, তথাপি এ কথা স্পষ্ট বুঝিতেছিল, এ আন্দোলন শান্ত না হইলে কাহারো সহিত সহজভাবে কথাবার্তা অসম্ভব। মিনিট পাঁচ-ছয় সেইখানে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া যখন দেখিল, কালিপদ চা লইয়া যাইতেছে, তখন সেও তাহার পিছনে পিছনে ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল।

কালিপদ চলিয়া গেলে নরেন বিজয়ার মুখের প্রতি চাহিয়া কহিল, আপনি মনে মনে ভারি বিরক্ত হয়েছেন। আপনি কোথাও বার হচ্ছিলেন, আমি এসে বাধা দিয়েচি। কিন্তু মিনিট-পাঁচেকের বেশি আপনাকে আটকে রাখব না।

বিজয়া কহিল, আচ্ছা, আগে আপনি চা খান। বলিয়া হঠাৎ পশ্চিম দিকের জানালাটার প্রতি নজর পড়ায় আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, ও জানালাটা কে খুলে দিয়ে গেল ?

নরেন বলিল, কেউ না, আমি।

কি ক'রে খুললেন ?

যেমন ক'রে সবাই খোলে—টেনে। কোন দোষ হয়েছে ?

বিজয়া মাথা নাড়িয়া কহিল, না ; এবং মুহূর্ত্ত কয়েক তাহার লম্বা সরু সরু আঙুলের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, আপনার আঙুলগুলো কি লোহার? ঐ জানালাটা বন্ধ থাক্‌লে পিছন থেকে সজোরে ধাক্কা না দিয়ে শুধু টেনে খুল্‌তে পারে, এমন লোক দেখি নি।

কথা শুনিয়া নরেন হো হো করিয়া উচ্চহাস্যে ঘর ভরিয়া দিল। এ সেই হাসি। মনে পড়িয়া বিজয়ার সর্ব্বাঙ্গে কাঁটা দিয়া উঠিল। হাসি থামিলে নরেন সহজভাবে কহিল, সত্যি, আমার আঙুলগুলো ভারি শক্ত। জোরে টিপে ধর্‌লে যে-কোন লোকের বোধ করি হাত ভেঙ্গে যায়।

বিজয়া হাসি চাপিয়া গম্ভীরমুখে কহিল, আপনার মাথাটা তার চেয়েও শক্ত। ঢুঁ মার্‌লে—

কথাটা শেষ না হইতেই নরেন আবার তেমনি উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিল। এই লোকটির হাসি প্রভাতের আলোর মত এম্‌নি মধুর, এম্‌নি উপভোগের বস্তু যে, কোনমতেই যেন লোভ সম্বরণ করা যায় না।

নরেন পকেট হইতে দুশ টাকার নোট বাহির করিয়া টেবিলের উপর রাখিয়া দিয়া বলিল, সেই জন্যেই এসেচি। আমি জোচ্চোর, আমি ঠক্‌, আরও কত গালাগালি ওই কটা টাকার জন্যে আমাকে দিয়ে পাঠিয়েছিলেন। আপনার টাকা নিন—দিন আমার জিনিষ।

বিজয়ার মুখ পলকের জন্য আরক্ত হইয়া উঠিল ; কিন্তু তখনই

আপনাকে সাম্‌লাইয়া লইয়া কহিল, আর কি কি বলে পাঠিয়েছিলুম, বলুন ত?

নরেন কহিল, অত আমার মনে নেই। সেটা আনতে বলে দিন, আমি সাড়ে নটার গাড়ীতেই কলকাতায় ফিরে যাব। ভাল কথা, আমি কলকাতাতেই বেশ একটা চাকুরি পেয়েচি—অতদূরে আর যেতে হয় নি।

বিজয়ার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, কহিল, আপনার ভাগ্য ভাল।

নরেন বলিল, হাঁ। কিন্তু আমার আর সময় নেই, নটা বাজে—চক্ষের নিমিষে বিজয়ার মুখের দীপ্তি নিবিয়া গেল; কিন্তু নরেন তাহা লক্ষ্যও করিল না; কহিল, আমাকে এখুনি বার হতে হবে—সেটা আনতে বলে দিন।

বিজয়া তাহার মুখের প্রতি চোখ তুলিয়া বলিল, এই সর্ত্ত কি আপনার সঙ্গে হয়েছিল যে, আপনি দয়া ক'রে টাকা এনেচেন বলেই তাড়াতাড়ি ফিরিয়ে দিতে হবে?

নরেন লজ্জিত হইয়া কহিল, না, তা নয় সত্যি; কিন্তু আপনার ত ওতে দরকার নেই।

আজ নেই বলে কোন দিন দরকার হবে না, এ আপনাকে কে বল্‌লে?

নরেন মাথা নাড়িয়া দৃঢ়স্বরে কহিল, আমি বল্‌চি, ও জিনিষ আপনার কোন কাজেই লাগ্‌বে না। অথচ, আমার—

বিজয়া উত্তর দিল, তবে যে বিক্রী ক'রে যাবার সময় বলেছিলেন, ওটা আমার অনেক উপকারে লাগ্‌বে। আমাকে ঠকিয়ে গেছেন বলে পাঠিয়েছিলুম বলে আপনি আবার রাগ কচ্চেন! তখন একরকম কথা আর এখন একরকম কথা?

নরেন লজ্জায় একেবারে মলিন হইয়া গেল। একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, দেখুন, তখন ভেবেছিলুম, অমন জিনিষটা আপনি

ব্যবহারে লাগাবেন, এ রকম ফেলে রেখে দেবেন না। আচ্ছা, আপনি ত জিনিষ বাঁধা রেখেও টাকা ধার দেন, এও কেন তাই মনে করুন না। আমি এ টাকার স্থদ দিচ্চি।

বিজয়া কহিল, কত স্থদ দেবেন ?

নরেন বলিল, যা ন্যায্য স্থদ, আমি তাই দিতে রাজী আছি।

বিজয়া ঘাড় নাড়িয়া কহিল, আমি রাজী নই। কলকাতায় যাচাই ক'রে দেখিয়েচি, ওটা অনায়াসে চারশ টাকায় বিক্রী কর্‌তে পারি।

নরেন সোজা উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, বেশ, তাই করুন গে—আমার দরকার নেই। যে দুশ টাকায় চারশ টাকা চায়, তাকে আমি কিছুই বল্‌তে চাই নে।

বিজয়া মুখ নিচু করিয়া প্রাণপণে হাসি দমন করিয়া যখন মুখ তুলিল, তখন কেবল এই লোকটি ছাড়া সংসারে আর কাহারও কাছে বোধ করি, সে আত্মগোপন করিতে পারিত না। কিন্তু সেদিকে নরেনের দৃষ্টিই ছিল না। সে তীক্ষ্ণভাবে কহিল, আপনি যে একটি শাইলক, তা জান্‌লে আমি আস্‌তাম না।

বিজয়া ভাল-মানুষটির মত কহিল, দেনার দায়ে যখন আপনার যথা-সর্ব্বস্ব আত্মসাৎ ক'রে নিয়েছিলুম, তখনও ভাবেন নি ?

নরেন কহিল, না। কেন না, তাতে আপনার হাত ছিল না। সে কাজ আপনার বাবা এবং আমার বাবা দুজনে ক'রে গিয়েছিলেন। আমরা কেউ তার জন্যে অপরাধী নই। আচ্ছা, আমি চল্‌লুম।

বিজয়া কহিল, খেয়ে যাবেন না ?

নরেন উদ্ধতভাবে কহিল, না, খাবার জন্যে আসি নি।

বিজয়া শান্তভাবে জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা, আপনি ত ডাক্তার—আপনি হাত দেখতে জানেন ?

এইবার তাহার ওষ্ঠপ্রান্তে হাসির রেখা ধরা পড়িয়া গেল। নরেন ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিয়া বলিল, আমি কি আপনার উপহাসের পাত্র? টাকা আপনার ঢের থাকতে পারে, কিন্তু সে জোরে ও-অধিকার কারও জন্মায় না জান্‌বেন—আপনি একটু হিসেব ক'রে কথা কইবেন; বলিয়া সে লাঠিটা তুলিয়া লইল।

বিজয়া কহিল, নইলে আপনার গায়ে জোর আছে, এবং হাতে লাঠি আছে?

নরেন লাঠিটা ফেলিয়া দিয়া হতাশভাবে চেয়ারটায় বসিয়া পড়িয়া বলিল, ছি ছি—আপনি যা মুখে আসে তাই যে বল্‌চেন! আপনার সঙ্গে আর পারি নে।

কিন্তু মনে থাকে যেন! বলিয়া আর সে আপনাকে সামলাইতে না পারিয়া হাসি চাপিতে চাপিতে দ্রুতপদে প্রস্থান করিল।

একাকী ঘরের মধ্যে নরেন হতবুদ্ধির মত খানিকক্ষণ বসিয়া থাকিয়া অবশেষে তাহার লাঠিটা হাতে তুলিয়া লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেই বিজয়া ঘরে ঢুকিয়া কহিল, আপনার জন্যই আমার যখন দেরি হয়ে গেল, তখন আপনারও চ'লে যাওয়া হবে না। আপনি হাত দেখতে জানেন—চলুন আমার সঙ্গে।

নরেন যাওয়ার কথাটা বিশ্বাস করিল না। তথাপি জিজ্ঞাসা করিল, কোথায় যেতে হবে হাত দেখ্‌তে?

তাহার মুখের প্রতি লক্ষ্য করিয়া এইবার বিজয়া গম্ভীর হইল; কহিল, এখানে ভাল ডাক্তার নেই। আমাদের যিনি নূতন আচার্য্য হয়ে এসেছেন—তাঁকে আমি অত্যন্ত শ্রদ্ধা করি—আজ দুদিন হ'ল তাঁর ভারি জ্বর হয়েছে, চলুন, একবার দেখে আসবেন।

আচ্ছা, চলুন।

বিজয়া কহিল, তবে একটু দাঁড়ান। সেই পরেশ ছেলেটিকে ত আপনি চেনেন—পরশু থেকে তারও জ্বর। তার মাকে আন্‌তে ব'লে দিয়েচি। বলিতে বলিতে পরেশের মা ছেলেকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া দ্বারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। নরেন নিমিষমাত্র তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াই কহিল, তোমার ছেলেকে নিয়ে যাও বাছা, আমার দেখা হয়েচে।

ছেলের মা এবং বিজয়া উভয়েই আশ্চর্য্য হইল। মা মিনতির স্বরে বলিল, সমস্ত গায়ে ভয়ানক বেদনা বাবু, নাড়ীটা দেখে একটু ওষুধ-যদি দিতেন—

বেদনা আমি জানি বাপু, তোমার ছেলেকে ঘরে নিয়ে যাও, হাওয়া-টাওয়া লাগিয়ো না, ওষুধ আমি পাঠিয়ে দিচ্চি।

মা একটু ক্ষুণ্ণ হইয়াই ছেলেকে লইয়া চলিয়া গেল। তখন নরেন বিজয়ার বিস্মিত মুখের পানে চাহিয়া কহিল, এদিকে ভারি বসন্ত হচ্চে। এবং এই ছেলেটীর মুখের উপরেও বসন্তের চিহ্ন আমি স্পষ্টই দেখ্‌তে পেয়েচি—একটু সাবধানে রাখ্‌তে ব'লে দেবেন।

বিজয়ার মুখ কালি হইয়া গেল—বসন্ত! বসন্ত হবে কেন?

নরেন কহিল, হবে কেন, সে অনেক কথা। কিন্তু হয়েচে। আজও ভাল বোঝা যাবে না বটে, কিন্তু কাল ওর পানে চাইলেই জান্‌তে পার্‌বেন। আমার মনে হচ্ছে, আপনার আচার্য্যবাবুকেও আর দেখ্‌বার বিশেষ আবশ্যক নেই—তাঁর অসুখটাও খুব সম্ভব কাল্‌কেই টের পাবেন।

ভয়ে বিজয়ার সর্ব্বাঙ্গ ঝিম্ ঝিম্ করিতে লাগিল। সে অবশ নির্জীবের মত চেয়ারে হেলান দিয়া বসিয়া পড়িয়া অস্ফুট-কণ্ঠে কহিল, আমারও নিশ্চয় বসন্ত হবে নরেনবাবু—আমারও কাল রাত্রে জ্বর হয়েছিল, আমারও গায়ে ভয়ানক ব্যথা।

নরেন হাসিল, কহিল, ব্যথা ভয়ানক নয়, ভয়ানক যা হয়েচে, তা আপনার ভয়। বেশ ত, জ্বরই যদি একটু হয়ে থাকে, তাতেই বা কি? আশে-পাশে বসন্ত দেখা দিয়েছে বলেই যে গ্রামসুদ্ধ সকলেরই তাই হতে হবে, তার কোন মানে নেই।

বিজয়ার চোখ দুটি ছল্ ছল্ করিয়া আসিল, কহিল, হলেই বা, আমাকে দেখ্‌বে কে? আমার কে আছে?

নরেন পুনরায় হাসিয়া কহিল, দেখ্‌বার লোক অনেক পাবেন, সে ভাবনা নেই—কিন্তু কিচ্ছু হবে না আপনার।

বিজয়া হতাশভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল, না হলেই ভাল। কিন্তু কাল রাত্রে আমার সত্যিই খুব জ্বর হয়েছিল। তবুও সকাল-বেলা জোর ক'রে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে দয়ালবাবুকে দেখ্‌তে যাচ্ছিলুম। এখনও আমার একটু একটু জ্বর রয়েচে, এই দেখুন; বলিয়া সে ডান হাত বাড়াইয়া দিল। নরেন কাছে গিয়া তাহার কোমল শিথিল হাতখানি নিজের শক্তিমান কঠিন হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া মুহূর্ত্তকাল পরেই ধীরে ধীরে নামাইয়া রাখিয়া বলিল, আজ আর কিছু খাবেন না, চুপ ক'রে শুয়ে থাকুন গে! কোন ভয় নেই, কাল-পরশু আবার আমি আস্‌ব।

আপনার দয়া, বলিয়া বিজয়া চোখ বুজিয়া চুপ করিয়া রহিল। কিন্তু কথাটা তীরের মত গিয়া নরেনের মর্ম্মমূলে বিঁধিল। প্রত্যুত্তরে আর সে কোন কথাই বলিল না বটে, কিন্তু নীরবে লাঠিটি তুলিয়া লইয়া যখন ঘরের বাহির হইয়া গেল, তখন এই ভয়ার্ত্ত রমণীর অসহায় মুখের দয়া-ভিক্ষা তাহার বলিষ্ঠ পুরুষ-চিত্তকে এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত মথিত করিতে লাগিল।

পরদিন কাজের ভিড়ে কোনমতেই সে কলিকাতা ত্যাগ করিতে পারিল না। কিন্তু তাহার পরদিন বেলা নয়টার মধ্যেই গ্রামে আসিয়া

উপস্থিত হইল। বাটীতে পা দিতেই কালিপদ তাড়াতাড়ি আসিয়া কহিল, মায়ের বড় জ্বর বাবু, আপনি একেবারে ওপরে চলুন।

নরেন বিজয়ার ঘরে আসিয়া যখন উপস্থিত হইল তখন সে প্রবল জ্বরে শয্যায় পড়িয়া ছট্‌ফট্‌ করিতেছে। কে একজন প্রৌঢ়া নারী ঘোমটায় মুখ ঢাকিয়া শিয়রের কাছে বসিয়া পাখার বাতাস করিতেছে, এবং অদূরে চৌকির উপর পিতা-পুত্র রাসবিহারী ও বিলাসবিহারী মুখ অসাধারণ গম্ভীর করিয়া বসিয়া আছেন। উভয়ের কাহারই চিত্ত যে ডাক্তারের আগমনে আশায় ও আনন্দে নাচিয়া উঠিল না, তাহা না বলিলেও চলে।

বিলাসবিহারী ভূমিকার লেশমাত্র বাহুল্য না করিয়া সোজা জিজ্ঞাসা করিল, আপনি নাকি পরশু বসন্তের ভয় দেখিয়ে গেছেন?

কথাটা এতবড় মিথ্যা যে, হঠাৎ কোন জবাব দিতেই পারা যায় না।

কিন্তু প্রশ্ন শুনিয়া বিজয়া রক্তচক্ষু মেলিয়া চাহিল। প্রথমটা সে যেন ঠাহর করিতে পারিল না; তার পরে দুই বাহু বাড়াইয়া কহিল, আসুন।

নিকটে আর কোন আসন না থাকায় নরেন তাহার শয্যার একাংশে গিয়াই উপবেশন করিল। চক্ষের পলকে বিজয়া দুই হাত দিয়া সজোরে তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল, কাল এলে ত আজ আমার এত জ্বর হ'ত না—আমি সমস্ত দিন পথ পানে চেয়েছিলুম।

নরেন ডাক্তার—তাহার বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে, প্রবল জ্বর উগ্র মদের নেশার মত অনেক আশ্চর্য্য কথা মানুষের ভিতর হইতে টানিয়া আনে; কিন্তু সুস্থ অবস্থায় তাহার অস্তিত্ব, না মুখে, না অন্তরে কোথাও হয় ত থাকে না। কিন্তু অনতিদূরে বসিয়া দুর্ভাগ্য পিতা-পুত্রের মাথার চুল পর্য্যন্ত ক্রোধে কণ্টকিত হইয়া উঠিল। নরেন সহজ সান্ত্বনার স্বরে প্রসন্ন-মুখে কহিল, ভয় কি, জ্বর দুদিনেই ভাল হয়ে যাবে।

তাহার হাতখানা বিজয়া একেবারে বুকের উপর টানিয়া লইয়া একান্ত

করুণ-স্বরে কহিল, কিন্তু আমি ভাল না হওয়া পর্য্যন্ত তুমি কোথাও যাবে না বল—তুমি চ'লে গেলে আমি হয় ত বাঁচব না।

জবাব দিতে গিয়া নরেন মুখ তুলিতেই দুই জোড়া ভীষণ চক্ষুর সহিত তাহার চোখোচোখি হইয়া গেল। দেখিল, একান্ত সন্নিকটবর্ত্তী নিঃশঙ্কচিত্ত শিকারের উপর লাফাইয়া পড়িবার পূর্ব্বাহ্নে ক্ষুধিত ব্যাঘ্র যেমন করিয়া চাহে, ঠিক তেমনি দুই প্রদীপ্ত চক্ষু মেলিয়া বিলাসবিহারী তাহার প্রতি চাহিয়া আছে।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

নরেন অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল—বিজয়ার প্রশ্নের জবাব দেওয়া হইল না। চোখের হিংস্র-দৃষ্টি শুধু মানুষ কেন, অনেক জানোয়ারে পর্য্যন্ত বুঝিতে পারে। সুতরাং এই লোকটি যতই সোজা মানুষ হোক, এবং সংসারের অভিজ্ঞতা তাহার যত অল্পই থাকুক, এ কথাটা সে এক নিমিষেই টের পাইল যে, ওই চেয়ারে আসীন পিতা-পুত্রের চোখের চাহনিতে আর যে ভাবই প্রকাশ করুক্, হৃদয়ের প্রীতি প্রকাশ করে নাই। ইহারা যে তাহার প্রতি প্রসন্ন ছিলেন না, তাহা সে জানিত। সেই মাইক্রস্কোপটা বিজয়াকে দেখাইতে আসিয়া সে নিজের কানেই অনেক কথা শুনিয়া গিয়াছিল; এবং রাসবিহারী নিজের হাতে বাড়ি-বহিয়া যেদিন তাহার দাম দিতে গিয়াছিলেন, সেদিনও হিতোপদেশ ছলে বৃদ্ধ কম কটু কথা শুনাইয়া আসেন নাই। কিন্তু সে যখন সত্যই ঠকাইয়া যায় নাই, এবং জিনিষটা আজ যখন দুই শতের স্থানে চারি শত ঘুরাইয়া আনিতে পারে, যাচাই হইয়া গিয়াছে, তখন সেদিক দিয়া কেন যে এখনো তাঁহাদের রাগ থাকিবে, তাহা সে ভাবিয়া পাইল না। আর এই বসন্তের ভয় দেখাইয়া যাওয়া! কিন্তু সে ত ভয় দেখাইয়া যায় নাই—বরঞ্চ ঠিক উল্টা।

এ মিথ্যা আর কেহ প্রচার করিয়াছে, কিংবা বিজয়ার নিজের মুখে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা স্থির করিবার পূর্ব্বেই বিলাসবিহারী আর একবার চীৎকার করিয়া উঠিল। ভৃত্য কালিপদ বোধ করি নিছক কৌতূহলবশেই পর্দ্দা একটুখানি ফাঁক করিয়া মুখ বাড়াইয়াছিল, বিলাসের চোখে পড়িতেই সে একেবারে হিন্দী-গর্জ্জন ছাড়িল। খুব সম্ভব, হিন্দীভাষায় অধিক রোক প্রকাশ পায়। কহিল, এই শূয়ারকা বাচ্চা, একঠো কুর্‌সী লাও।

ঘরের সকলেই চমকিয়া উঠিল। কালিপদ 'শূয়ারকা বাচ্চা' এবং 'লাও' কথাটার অর্থ বুঝিতে পারিল, কিন্তু 'কুর্‌সী' বস্তুটি যে কি, তাহা আন্দাজ করিতে না পারিয়া সে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া একবার এদিকে একবার ওদিকে মুখ ফিরাইতে লাগিল। বৃদ্ধ রাসবিহারী নিজেকে সংবরণ করিয়া লইয়াছিলেন; তিনি গম্ভীর-স্বরে কহিলেন, ও ঘর থেকে একটা চেয়ার নিয়ে এসো কালিপদ, বাবুকে বস্‌তে দাও। কালিপদ দ্রুতবেগে প্রস্থান করিলে তিনি ছেলের দিকে ফিরিয়া, তাঁহার শান্ত উদাসকণ্ঠে বলিলেন, রোগা মানুষের ঘর—অমন হেষ্টি হ'য়ো না বিলাস। Temper lose করা কোন ভদ্রলোকের পক্ষেই শোভা পায় না।

ছেলে উদ্ধতভাবে জবাব দিল, মানুষ এতে temper lose করে না ত করে কিসে শুনি? হারামজাদা চাকর, বলা নেই, কওয়া নেই, এমন একটা অসভ্য লোককে ঘরে এনে ঢোকালে যে ভদ্র-মহিলার সম্মান রাখ্‌তে পর্য্যন্ত জানে না।

অকস্মাৎ প্রচণ্ড ধাক্কায় মাতালের যেমন নেশা ছুটিয়া যায়, বিজয়ারও ঠিক তেমনি জ্বরের আচ্ছন্ন ঘোরটা ঘুচিয়া গেল। সে নিঃশব্দে নরেনের হাত ছাড়িয়া দিয়া দেওয়ালের দিকে মুখ করিয়া পাশ ফিরিয়া শুইল।

কালিপদ তাড়াতাড়ি একখানি চেয়ার আনিয়া রাখিয়া যাইতেই, নরেন বিছানা হইতে উঠিয়া আসিয়া তাহাতে বসিল। রাসবিহারী

বিজয়ার মুখের ভাব লক্ষ্য করিতে ত্রুটি করেন নাই। তিনি একটু প্রসন্ন হাস্য করিয়া পুত্রকেই উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, আমি সমস্তই বুঝি বিলাস। এ ক্ষেত্রে তোমার রাগ হওয়াটা যে অস্বাভাবিক নয়, বরঞ্চ খুবই স্বাভাবিক, তাও মানি, কিন্তু এটা তোমার ভাবা উচিত ছিল যে, সবাই ইচ্ছা ক'রে অপরাধ করে না। সকলেই যদি সব রকম রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার জানত, তা হ'লে ভাবনা ছিল কি। সেই জন্যে রাগ না ক'রে শান্তভাবে মানুষের দোষ-ত্রুটি সংশোধন ক'রে দিতে হয়।

এই দোষ-ত্রুটি যে কাহার, তাহা কাহারও বুঝিতে বিলম্ব হইল না। বিলাস কহিল, না বাবা, এ রকম impertinence সহ্য হয় না। তা ছাড়া আমার এ বাড়ির চাকরগুলো হয়েচে যেমন হতভাগা, তেম্‌নি বজ্জাত! কালই আমি ব্যাটাদের সব দূর করে তবে ছাড়ব!

রাসবিহারী আবার একটু হাস্য করিয়া সস্নেহে তিরস্কারের ভঙ্গীতে এবার বোধ করি ঘরের দেওয়াল-গুলাকে শুনাইয়া বলিলেন, এর মন খারাপ হয়ে থাক্‌লে যে কি বলে, তার ঠিকানাই নেই। আর শুধু ছেলেকেই বা দোষ দেব কি, আমি বুড়োমানুষ, আমি পর্য্যন্ত অসুখ শুনে কি রকম চঞ্চল হয়ে উঠেছিলুম! বাড়িতেই হ'ল একজনের বসন্ত তার ওপর উনি ভয় দেখিয়ে গেলেন।

এতক্ষণ পর্য্যন্ত নরেন কোন কথা কহে নাই; এইবার সে বাধা দিয়া কহিল, না, আমি কোন রকম ভয় দেখিয়ে যাই নি।

বিলাস মাটীতে একটা পা ঠুকিয়া সতেজে কহিল, আল্‌বৎ ভয় দেখিয়ে গেছেন। কালিপদ সাক্ষী আছে।

নরেন কহিল, কালিপদ ভুল শুনেচে।

প্রত্যুত্তরে বিলাস আর একটা কি কাণ্ড করিতে যাইতেছিল, তাহার পিতা থামাইয়া দিয়া বলিলেন, আঃ—কি কর বিলাস! উনি যখন

অস্বীকার করছেন, তখন কি কালিপদকে বিশ্বাস করতে হবে? নিশ্চয়ই ওঁর কথা সত্যি।

তথাপি বিলাস কি যেন বলিবার প্রয়াস করিতেই বৃদ্ধ কটাক্ষে নিষেধ করিয়া বলিলেন, এই সামান্য অসুখেই মাথা হারিয়ো না বিলাস, স্থির হও। মঙ্গলময় জগদীশ্বর যে শুধু আমাদের পরীক্ষা করবার জন্যেই বিপদ পাঠিয়ে দেন, বিপদে পড়লে তোমরা সকলের আগে এই কথাটাই কেন ভুলে যাও, আমি ত ভেবে পাই নে।

একটু স্থির থাকিয়া পুনরায় কহিলেন, আর তাই যদি একটা ভুল অসুখের কথা বলেই থাকেন, তাতেই বা কি? কত পাশ-করা ভাল ভাল বিচক্ষণ ডাক্তারের যে ভ্রম হয়, উনি ত ছেলেমানুষ। বলিয়া নরেনের প্রতি মুখ তুলিয়া বলিলেন, যাক—জ্বর তা হ'লে অতি সামান্যই আপনি বল্‌ছেন? চিন্তা করবার ত কোন কারণ নেই, এই ত আপনার মত?

নরেন আসিয়া পর্য্যন্ত অনেক অপমান নীরবে সহিয়াছিল, কিন্তু এইবার একটা বাঁকা জবাব না দিয়া থাকিতে পারিল না। কহিল, আমার বলায় কি আসে যায় বলুন? আমার ওপর ত নির্ভর করছেন না। বরং তার চেয়ে কোন ভাল পাশ-করা ডাক্তার দেখিয়ে তাঁর মতামত নেবেন।

কথাটার নিহিত খোঁচা যাহাই থাক, এ জবাব দিবার তাহার অধিকার ছিল। কিন্তু বিলাস একেবারে লাফাইয়া উঠিয়া, মারমুখী হইয়া চেঁচাইয়া উঠিল—তুমি কার সঙ্গে কথা কইচ, মনে ক'রে কথা ক'য়ো বলে দিচ্চি। এ ঘর না হয়ে আর কোথাও হ'লে তোমার বিদ্রূপ করা—

এই লোকটার কারণে-অকারণে প্রথম হইতেই একটা ঝগড়া বাধাইয়া তুমুল কাণ্ড করিয়া তুলিবার প্রাণপণ চেষ্টা দেখিয়া নরেন বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া গেল। কিন্তু কেন, কিসের জন্য—কোথায় তাহার

ব্যবহারের মধ্যে কি অপরাধ ঘটিতেছে, কিছুই সে স্থির করিয়া উঠিতে পারিল না। আসল কারণ হইতেছে এই যে, কোথায় যে ওই লোকটার অন্তর্দ্দাহ, নরেন তাহা আজিও জানিত না। বিজয়া এখানে আসার সঙ্গে সঙ্গেই গ্রামের অনুসন্ধিৎসু প্রতিবেশীর দল যখন বিলাসের সহিত তাহার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধের আলোচনা করিয়া সময়ের সদ্ব্যবহার করিত; তখন ভিন্ন-গ্রামবাসী এই নবীন বৈজ্ঞানিকের অখণ্ড মনোযোগ কীটাণু-কীটের সম্বন্ধ-নিরূপণেই ব্যাপৃত থাকিত; গ্রামের জনশ্রুতি তাহার কানে পৌছাইত না। তাহার পরে ব্রহ্ম-মন্দির প্রতিষ্ঠার দিনে যখন কথাটা পাকা হইয়া রাষ্ট্র হইতে কোথাও আর বাকি রহিল না, তখন সে কলিকাতায় চলিয়া গিয়াছে। আজ পিতা-পুত্রের কথার ভঙ্গীতে মাঝে মাঝে কি যেন একটা অনির্দ্দেশ্য এবং অস্পষ্ট ব্যথার মত তাহাকে বাজিতেছিল বটে, কিন্তু চিন্তার দ্বারা তাহাকে সুস্পষ্ট করিয়া দেখিবার সময় কিংবা প্রয়োজন কিছুই তাহার ছিল না। ঠিক এই সময়ে বিজয়া এদিকে মুখ ফিরাইল। নরেনের মুখের প্রতি ব্যথিত, উৎপীড়িত দুটি চক্ষু ক্ষণকাল নিবদ্ধ করিয়া কহিল, আমি যতদিন বাঁচব, আপনার কাছে কৃতজ্ঞ হয়ে থাকব। কিন্তু এরা যখন অন্য ডাক্তার দিয়ে আমার চিকিৎসা করাবেন স্থির করেছেন, তখন আর আপনি নিরর্থক অপমান সইবেন না! কিন্তু ফিরে যাবার পথে দয়ালবাবুকে একবার দেখে যাবেন, শুধু এই মিনতিটি রাখবেন। বলিয়া প্রত্যুত্তরের জন্য অপেক্ষা না করিয়াই সে পুনরায় মুখ ফিরিয়া শুইল। রাসবিহারী অনেক পূর্ব্বেই আসল ব্যাপারটা বুঝিয়াছিলেন, তিনি তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিলেন, বিলক্ষণ! তুমি যাকে ডেকে পাঠিয়েছ, তাঁকে অপমান করে কার সাধ্য!

তারপর ছেলেকে নানাপ্রকার ভর্ৎসনার মধ্যে বারংবার এই কথাটাই প্রচার করিতে লাগিলেন যে, অসুখের গুরুত্ব কল্পনা করিয়া

উৎকণ্ঠায় বিলাসের হিতাহিত জ্ঞান লোপ পাইয়াছে, এবং সঙ্গে সঙ্গে এক মাত্র অদ্বিতীয় নিরাকার পরব্রহ্মের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অনেক আধ্যাত্মিক ও নিগূঢ় তত্ত্ব-কথার মর্ম্মোদ্‌ঘাটন করিয়া দেখাইয়া দিলেন। নরেন কোন কথা কহিল না। পিতা ও পুত্রের নিকট হইতে তত্ত্বকথা ও অপমানের বোঝা নিঃশব্দে দুই স্কন্ধে ঝুলাইয়া লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং লাঠি ও ছোট ব্যাগটি হাতে করিয়া তেমনি নীরবে বাহির হইয়া গেল। রাস-বিহারী পিছন হইতে ডাকিয়া কহিলেন, নরেনবাবু, আপনার সঙ্গে একটা জরুরী কথা আলোচনা করবার আছে, বলিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া ছেলেকে অপ্রতিদ্বন্দ্বী, একমাত্র ও অদ্বিতীয়রূপে বিজয়ার ঘরের মধ্যে অধিষ্ঠিত রাখিয়া, দ্রুতবেগে তাহার অনুসরণ করিয়া নীচে নামিয়া গেলেন।

নরেনকে পাশের একটা ঘরে বসাইয়া তিনি ভূমিকাচ্ছলে কহিলেন, পাঁচজনের সামনে তোমাকে বাবুই বলি আর যাই বলি বাবা, এটা কিন্তু ভুল্‌তে পারি নে, তুমি আমাদের সেই জগদীশের ছেলে। বনমালী, জগদীশ দুইজনেই স্বর্গীয় হয়েছেন, শুধু আমিই পড়ে আছি, কিন্তু আমরা তিনজনে যে কি ছিলাম, সে আভাস তোমাকে ত সেইদিনই দিয়েছিলাম, কিন্তু খুলে বল্‌তে পারি নে নরেন—আমার বুক যেন ফেটে যেতে চায়।

বস্তুতঃ মাইক্রস্কোপটার দাম দিতে গিয়া তিনি অনেক কথাই সেদিন কহিয়াছিলেন। নরেন চুপ করিয়া রহিল।

হঠাৎ রাসবিহারীর সে-দিনের কথাটাই যেন মনে পড়ায় বলিয়া উঠিলেন, ওই দরকারী যন্ত্রটা বিক্রী করায় আমি সত্য সত্যই তোমার উপর বিরক্ত হয়েছিলাম নরেন। একটু হাস্য করিয়া বলিলেন, কিন্তু দেখ বাবা, এই বিরক্ত হয়েছিলাম কথাটা বড় রূঢ়। হই নি বলতে পারলেই সাংসারিক হিসাবে হয় ভাল—বল্‌তে শুন্‌তে সব দিকেই নিরাপদ—কিন্তু যাক্‌। বলিয়া একটা নিশ্বাস ফেলিয়া অনেকটা যেন

আত্মগত ভাবেই পুনরায় কহিতে লাগিলেন, আমার দ্বারা যা অসাধ্য, তা নিয়ে দুঃখ করা বৃথা। কত লোকের অপ্রিয় হই, লোকে গাল দেয়, বন্ধুরা বলেন, বেশ, মিথ্যা বল্‌তে যখন কোন কালেই পারলে না রাসবিহারী; তখন তা বল্‌তেও আমরা বলি নে, কিন্তু একটু ঘুরিয়ে বল্‌লেই যদি গালমন্দ হ'তে নিস্তার পাওয়া যায় তাই কেন বল না? আমি শুনে শুধু অবাক হয়ে ভাবি বাবা, যা ঘটে নি, তা বানিয়ে বলা, ঘুরিয়ে বলা যায় কি ক'রে? এরা আমার ভালই চায়, তা বুঝি; কিন্তু সেই মঙ্গলময় আমাকে যে ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত করেছেন, সে অসাধ্য-সাধন করিই বা আমি কেমন ক'রে? যাক্ বাবা, নিজের সম্বন্ধে আলোচনা কর্‌তে আমি কোন দিনই ভালবাসি নে—এতে আমার বড় বিতৃষ্ণা। পাছে তুমি দুঃখ পাও, তাই এত কথা বলা। বলিয়া উদাস-নেত্রে কড়িকাঠের দিকে ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া চোখ নামাইয়া কহিলেন, আর একটা কি জান নরেন, এই সংসারেই চিরকাল আছি বটে, চুল পাকিয়েও ফেল্‌লাম সত্য, কিন্তু কি কর্‌লে কি বল্‌লে যে এখানে সুখ-সুবিধে মেলে, তা আজও এই পাকা মাথাটায় ঢুকল না! নইলে তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছিলাম, এ কথা মুখের ওপর ব'লে তোমার মনে আজ ক্লেশ দেব কেন?

নরেন বিনয়ের সহিত বলিল, যা সত্য তাই বলেছেন—এতে দুঃখ করবার ত কিছু নেই।

রাসবিহারী ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন, না না, ও কথা ব'লো না নরেন—কঠোর কথা মনে বাজে বই কি! যে শোনে, তার ত বাজেই, যে বলে, তারও কম বাজে না বাবা। জগদীশ্বর!

নরেন অধোমুখে চুপ করিয়া রহিল। রাসবিহারী অন্তরের ধর্ম্মোচ্ছ্বাস সংযত করিয়া লইয়া পরে বলিতে লাগিলেন, কিন্তু তার পরে

আর চুপ ক'রে থাকতে পারলাম না। ভাবলাম সে কি কথা! সে অনেক দুঃখেই নিজের অমন আবশ্যকীয় জিনিষটা বিক্রী করে গেছে। তার মূল্য যাই হোক্, কিন্তু কথা যখন দেওয়া হয়েছে, তখন আর ত ভাবাও চলে না, দাম দিতেও বিলম্ব করা চলে না। মনে মনে বললাম, আমার বিজয়া-মার যখন ইচ্ছে, যত দিনে ইচ্ছে টাকা দিন, আমি যাই, নিজে গিয়ে দিয়ে আসিগে। সে বেচারা যখন ঐ টাকা নিয়েই তবে বিদেশে যাবে, তখন একটা দিনও দেরি করা কর্ত্তব্য নয়। তার ওপর সে যখন আমার জগদীশের ছেলে!

নরেন তখনকার কটু কথাগুলা স্মরণ করিয়া বেদনার সহিত জিজ্ঞাসা করিল, তাঁর কি দাম দেবার ইচ্ছে ছিল না?

বৃদ্ধ গম্ভীর হইয়া বলিলেন, সে কথা আমার ত মনে হয় নি নরেন! কিন্তু তবে কি জান—না, থাক্। বলিয়া তিনি সহসা মৌন হইলেন।

চারিশত টাকায় যাচাই করার কথাটা একবার নরেনের জিহ্বায় আসিয়া পড়িল, কিন্তু সেই সঙ্গেই কেমন একটা ক্লেশ হওয়ায় এ সম্বন্ধে আর কোন কথা সে কহিল না।

রাসবিহারী এইবার দরকারী কথাটা পাড়িলেন। তিনি লোক চিনিতেন। নরেনের আজিকার কথাবার্ত্তায় ও ব্যবহারে তাঁহার ঘোর সন্দেহ জন্মিয়াছিল যে, এখনও সে আসল কথাটা জানে না; এবং এই সকল অন্যমনস্ক ও উদাসীন-প্রকৃতির মানুষগুলোর একেবারে চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া না দিলে নিজে হইতে অনুসন্ধান করিয়াও ইহারা কোন দিনই কিছু জানিতে চাহে না। বলিলেন, বিলাসের আচরণে আজ আমি যেমন দুঃখ, তেমনি লজ্জা বোধ করেছি। ওই মাইক্রস্কোপটার কথাই বলি। বিজয়া একবার যদি তার মত নিয়ে সেটা কিনত, তা হ'লে ত কোন কথাই উঠতে পারত না! তুমিই বল দেখি, এ কি তার কর্ত্তব্য ছিল না?

বিজয়ার কর্ত্তব্যটা ঠিক বুঝিতে না পারিয়া নরেন জিজ্ঞাসু-মুখে চাহিয়া রহিল। রাসবিহারী কহিলেন, তার অসুখের খবর পেয়েই বিলাস যে কি রকম উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠেছে, এ ত আমার বুঝতে বাকি নেই। হওয়াই স্বাভাবিক—সমস্ত ভাল-মন্দ, সমস্ত দায়িত্ব ত শুধু তারই মাথার উপরে। চিকিৎসা এবং চিকিৎসক স্থির করা ত তারই কাজ! তার অমতে ত কিছুই হ'তে পারে না। বিজয়া নিজেও ত অবশেষে তা বুঝ্‌লে, কিন্তু দুদিন পূর্ব্বে চিন্তা কর্‌লে ত এসব অপ্রিয় ব্যাপার ঘটতে পারত না। নিতান্ত বালিকা নয়—ভাবা ত উচিত ছিল।

কেন যে উচিত ছিল, তাহা তখন পর্য্যন্তও বুঝিয়া উঠিতে না পারিয়া নরেন বৃদ্ধের প্রশ্নে সায় দিতে পারিল না। কিন্তু তবুও তাহার বুকের ভিতরটা আশঙ্কায় তোলপাড় করিতে লাগিল। অথচ বুঝিয়া লইবার মত কথাও তাহাব কণ্ঠ দিয়া বাহির হইল না। সে শুধু শঙ্কিত দুই চক্ষু বৃদ্ধের মুখের প্রতি মেলিয়া নিঃশব্দে চাহিয়া রহিল।

রাসবিহারী বলিলেন, তুমি কিন্তু বাবা, বিলাসের মনের অবস্থা বুঝে মনের মধ্যে কোন গ্লানি রাখ্‌তে পাবে না। আর একটা অনুরোধ আমার এই রইল নরেন, এদের বিবাহ ত বৈশাখেই হবে, যদি কলকাতাতেই থাক, শুভকর্ম্মে যোগ দিতে হবে, তা ব'লে রাখ্‌লাম।

নরেন কথা কহিতে পারিল না, শুধু ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, আচ্ছা।

রাসবিহারী তখন পুলকিত-চিত্তে অনেক কথা বলিতে লাগিলেন, এ বিবাহ যে মঙ্গলময়ের একান্ত অভিপ্রেত, এবং বর-কন্যার জন্ম কাল হইতেই যে স্থির হইয়াছিল, এবং এই প্রসঙ্গে বিজয়ার পরলোকগত পিতার সহিত তাঁহার কি কি কথা হইয়াছিল, ইত্যাদি বহু প্রাচীন ইতিহাস বিবৃত করিতে করিতে সহসা বলিয়া উঠিলেন, ভাল কথা, কলকাতাতেই কি এখন থাকা হবে? একটু সুবিধে-টুবিধে হবার কি আশা—

নরেন কহিল, হাঁ। একটা বিলিতি ওষুধের দোকানে সামান্য একটা কাজ পেয়েছি।

রাসবিহারী খুসী হইয়া বলিলেন, বেশ—বেশ। ওষুধের দোকান—কাঁচা পয়সা। টিকে থাকৃতে পারলে আখেরে গুছিয়ে নিতে পারবে।

নরেন এ ইঙ্গিতের ধার দিয়াও গেল না। কহিল, আজ্ঞে হাঁ—

শুনিয়া রাসবিহারী আর কৌতূহল দমন করিতে পারিলেন না। একটু ইতস্ততঃ করিয়া প্রশ্ন করিলেন, তা হ'লে মাইনেটা কি রকম দিচ্চে ?

নরেন কহিল, পরে কিছু বেশি দিতে পারে। এখন চারশ টাকা মাত্র দেয়।

চারশ ! রাসবিহারী বিবর্ণ মুখে চোখ কপালে তুলিয়া বলিলেন, আহা, বেশ—বেশ ! শুনে বড় সুখী হ'লাম।

এদিকে বেলা বাড়িয়া উঠিতেছিল দেখিয়া নরেন উঠিয়া দাঁড়াইল। দয়ালবাবুর দুই-চারিটি বসন্ত দেখা দিয়াছিল, তাঁহাকে একবার দেখিতে যাইতে হইবে। জিজ্ঞাসা করিল, সেই পরেশ ছেলেটি কেমন আছে, বল্‌তে পারেন ?

রাসবিহারী অম্লান মুখে জানাইলেন যে, তাহাকে তাহাদের গ্রামের বাটীতে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে—সে কেমন আছে বলিতে পারেন না।

উভয়েই ঘরের বাহির হইয়া আসিলেন। তাঁহাকে আবার একবার উপরে যাইতে হইবে। ছেলে তখনও অপেক্ষা করিয়া আছে; সে চিকিৎসার কিরূপ ব্যবস্থা করিল, তাহার খবর লওয়া আবশ্যক। বারান্দার শেষ পর্য্যন্ত আসিয়া নরেন মুহূর্ত্তের জন্য একবার স্থির হইয়া দাঁড়াইল, তাহার পর ধীরে ধীরে আসিয়া রাসবিহারীকে কহিল, আপনি আমার হয়ে বিলাসবাবুকে একটা কথা জানাবেন। বল্‌বেন, প্রবল জ্বরে

মানুষের আবেগ নিতান্ত সামান্য কারণেও উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠ্‌তে পারে। বিজয়ার সম্বন্ধে ডাক্তারের মুখের এই কথাটা তিনি যেন অবিশ্বাস না করেন। বলিয়া সে মুখ ফিরাইয়া একটু দ্রুতগতিতেই প্রস্থান করিল।

স্নান নাই, আহার নাই, মাথার উপর কড়া রৌদ্র—মাঠের উপর দিয়া নরেন দিঘড়ায় চলিয়াছিল। কিন্তু কিছুই তাহার ভাল লাগিতেছিল না। তাই চলিতে চলিতে আপনাকে আপনি সে বারংবার প্রশ্ন করিতেছিল, তাহার কিসের গরজ? কে একটা স্ত্রীলোক তাহার শ্রদ্ধার পাত্রকে দেখিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছে বলিয়াই, সে যাহাকে কখনো চোখেও দেখে নাই, তাহাকে দেখিবার জন্য এই রৌদ্রের মধ্যে মাঠ ভাঙিতেছে! এই অন্যায় অনুরোধ করিবার যে তাহার একবিন্দু অধিকার ছিল না, তাহা মনে করিয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিতে লাগিল, এবং ইহা রক্ষা করিতে যাওয়াও নিজের সম্মানের হানিকর ইহাও সে বারবার করিয়া আপনাকে আপনি বলিতে লাগিল, অথচ মুখ ফিরিয়া চলিয়া যাইতেও পারিল না। এক-পা এক-পা করিয়া সেই দিঘড়ার দিকেই অগ্রসর হইতে লাগিল; এবং অনতিকাল পরে সেই নিতান্ত স্পর্দ্ধিত অনুরোধটাকে বজায় রাখিতে নিজের বাটীর দ্বারদেশে আসিয়া উপস্থিত হইল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

এক টুক্‌রা কাগজের উপর নরেন নিজের নামের সঙ্গে তাহার বিলাতি ডাক্তারি খেতাবটা জুড়িয়া দিয়া ভিতরে পাঠাইয়া দিয়াছিল। সেইটা পাঠ করিয়া দয়াল অত্যন্ত সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিলেন। এতবড় একটা ডাক্তার পায়ে হাঁটিয়া তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছে, ইহা তাঁহার নিজেরই যেন একটা অশোভন স্পর্দ্ধা ও অপরাধের মত ঠেকিল, এবং ইহাকেই বঞ্চিত করিয়া নিজে এই বাটীতে বাস করিতেছেন; এই লজ্জায় কি করিয়া যে

মুখ দেখাইবেন ভাবিয়া পাইলেন না। ক্ষণেক পরে একজন গৌরবর্ণ, দীর্ঘকায়, ছিপছিপে যুবক যখন তাঁহার ঘরে আসিয়া ঢুকিল, তখন মুগ্ধনেত্রে অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার মনে হইল, ব্যাধি তাঁহার যাই হোক্, এবং যত বড়ই হোক্, আর ভয় নাই—এ যাত্রা তিনি বাঁচিয়া গেলেন। বস্তুতঃ রোগ অতি সামান্য, চিন্তার কিছুমাত্র হেতু নাই, আশ্বাস পাইয়া তিনি উঠিয়া বসিলেন, এমন কি, ডাক্তারসাহেবকে ট্রেণে তুলিয়া দিতে ষ্টেশন পর্য্যন্ত সঙ্গে যাওয়া সম্ভব হইবে কি না, ভাবিতে লাগিলেন। বিজয়া নিজে শয্যাগত হইয়াও তাঁহাকে বিস্মৃত হয় নাই ; সেই-ই অনুরোধ করিয়া পাঠাইয়া দিয়াছে শুনিয়া, কৃতজ্ঞতায়, আনন্দে দয়ালের চোখ ছল্ ছল্ করিয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে এই নবীন চিকিৎসক ও প্রাচীন আচার্য্যের মধ্যে আলাপ জমিয়া উঠিল। নরেনের চিত্তের মাঝে আজ অনেকখানি গ্লানি জমা হইয়া উঠিয়াছিল ; কিন্তু এই বৃদ্ধের সন্তোষ, সহৃদয়তা ও অন্তরের শুচিতার সংস্পর্শে তাহার অর্দ্ধেক পরিষ্কার হইয়া গেল। কথায় কথায় সে বুঝিল, এই লোকটির ধর্ম্মসম্বন্ধীয় পড়া-শুনা যদিও নিতান্তই যৎসামান্য, কিন্তু ধর্ম্ম বস্তুটিকে বৃদ্ধ বুক দিয়া ভালবাসে এবং সেই অকৃত্রিম ভালবাসাই যেন ধর্ম্মের সত্য দিক্‌টার প্রতি তাঁহার চোখের দৃষ্টিকে অসামান্য স্বচ্ছ করিয়া দিয়াছে। কোন ধর্ম্মের বিরুদ্ধেই তাঁহার নালিশ নাই, এবং মানুষ খাঁটি হইলেই যে, সকল ধর্ম্মই তাঁহাকে খাঁটি জিনিষটি দিতে পারে, ইহাই তিনি অকপটে বিশ্বাস করেন। এরূপ অসাম্প্রদায়িক মতবাদ বিলাসবিহারীর কানে গেলে তাঁহার আচার্য্য পদ বাহাল থাকিত কি না ঘোর সন্দেহ, কিন্তু বৃদ্ধের শান্ত, সরল ও বিদ্বেষ-লেশহীন কথা শুনিয়া নরেন মুগ্ধ হইয়া গেল। রাসবিহারী ও বিলাসবিহারীরও তিনি অনেক গুণগান করিলেন। তিনি যাহারই কথা বলেন, তাঁহারই মত সাধু পুরুষ জগতে আর দ্বিতীয় দেখেন নাই বলেন।

বৃদ্ধের মানুষ চিনিবার এই অদ্ভুত ক্ষমতা লক্ষ্য করিয়া নরেন মনে মনে হাসিল। পরিশেষে বিলাসের প্রসঙ্গেই তিনি আগামী বৈশাখে বিবাহের উল্লেখ করিয়া অত্যন্ত পরিতৃপ্তির সহিত জানাইলেন যে, সে উপলক্ষে তাঁহাকেই আচার্য্যের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে, ইহাই বিজয়ার অভিলাষ; এবং এই বিবাহই যে ব্রাহ্ম-সমাজে বিবাহের যথার্থ আদর্শ হওয়া উচিত, এই প্রকার অভিমত প্রকাশ করিতেও তিনি বিরত হইলেন না।

কিন্তু বৃদ্ধ সৌভাগ্য ও আনন্দের আতিশয্যে নিজে এতদূর বিহ্বল হইয়া না উঠিলে, অত্যন্ত অনায়াসেই দেখিতে পাইতেন, এই শেষের আলোচনা কি করিয়া তাঁহার শ্রোতার মুখের উপর কালির উপর কালি ঢালিয়া দিতেছিল!

স্নানাহারের জন্য তিনি নরেনকে যৎপরোনাস্তি পীড়াপীড়ি করিয়াও রাজী করিতে পারিলেন না। ঘণ্টা-দেড়েক পরে নরেন যখন যথার্থ শ্রদ্ধাভরে তাঁহাকে নমস্কার করিয়া বাহির হইয়া গেল, তখন কোথায় যে তাহার ব্যথা, কেন যে সমস্ত মন উদ্‌ভ্রান্ত-বিপর্য্যস্ত, সমস্ত সংসার এরূপ তিক্ত বিস্বাদ হইয়া গেছে, তাহা জানিতে তাহার বাকি রহিল না। নদী পার হইতেই বামদিকে অনেক দূরে জমিদার-বাটীর সৌধ-চূড়া চোখে পড়িয়া আর একবার নূতন করিয়া তাহার দুই চক্ষু জ্বলিয়া গেল। সে মুখ ফিরাইয়া লইয়া সোজা মাঠের পথ ধরিয়া রেলওয়ে ষ্টেশনের দিকে দ্রুতপদে চলিতে লাগিল। আজ এমন অকস্মাৎ এত বড় আঘাত না খাইলে সে হয় ত এত সত্বর নিজের মনটাকে চিনিতে পারিত না। এতদিন তাহার জানা ছিল, এ জীবনে হৃদয় তাহার একমাত্র শুধু বিজ্ঞানকেই ভালবাসিয়াছে। সেখানে কোন কালে আর কোন জিনিষেরই যে জায়গা মিলিবে না, তাহা এমন নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করিত বলিয়াই জগতের অন্যান্য সমস্ত কামনার বস্তুই তাহার কাছে একেবারে তুচ্ছ হইয়া

গিয়াছিল। কিন্তু আজ আঘাত যখন ধরা পড়িল, হৃদয় তাহার তাহারই অজ্ঞাতসারে আর একটা বস্তুকে এম্‌নিই একান্ত করিয়া ভালবাসিয়াছে, তখন ব্যথায় ও বিস্ময়েই শুধু চমকিয়া গেল না, নিজের কাছেই নিজে যেন অত্যন্ত ছোট হইয়া গেল। আজ কোন কথারই যথার্থ মানে বুঝিতে তাহার বাধিল না। বিজয়ার সমস্ত আচরণ সমস্ত কথা-বার্ত্তাই যে প্রচ্ছন্ন উপহাস, এবং এই লইয়া বিলাসের সহিত না জানি সে কতই হাসিয়াছে, কল্পনা করিয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গ লজ্জায় বার বার করিয়া শিহরিতে লাগিল। এই ত সেদিন যে তাহার সর্ব্বস্ব গ্রহণ করিয়া পথে বাহির করিয়া দিতেও একবিন্দু দ্বিধা করে নাই, তাহারই কাছে দৈন্য জানাইয়া তাহার শেষসম্বলটুকু পর্য্যন্ত বিক্রয় করিতে যাইবার চরম দুর্ম্মতি তাহার কোন্ মহাপাপে জন্মিয়াছিল? নিজেকে সহস্র ধিক্কার দিয়া কেবলই বলিতে লাগিল, এ আমার ঠিকই হইয়াছে। যে লজ্জাহীন সেই নিষ্ঠুর রমণীর একটা সামান্য কথায় নিজের সমস্ত কাজ-কর্ম্ম ফেলিয়া এতদূর ছুটিয়া আসিতে পারে, এ শাস্তি তাহার উপযুক্তই হইয়াছে। বেশ করিয়াছে, বিলাস তাহাকে অপমান করিয়া বাটীর বাহির করিয়া দিয়াছে।

ষ্টেশনে পৌছিয়া দেখিল, যে মাইক্রস্কোপটা এত দুঃখের মূল, সেইটাকে লইয়াই কালিপদ দাঁড়াইয়া আছে। সে কাছে আসিয়া বলিল, ডাক্তার-বাবু, মাঠান্ আপনাকে এইটে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

নরেন তিক্তস্বরে কহিল, কেন?

কেন, তাহা কালিপদ জানিত না। কিন্তু জিনিসটা যে ডাক্তারবাবুর, এবং ইহাকে লক্ষ্য করিয়া যত প্রকারের অপ্রিয় ব্যাপার ঘটিয়া গিয়াছে, সম্মুখ এবং অন্তরাল হইতে কিছুই কালিপদর অবিদিত ছিল না। সে বুদ্ধি খাটাইয়া হাসিমুখে বলিল, আপনি ফিরে চেয়েছিলেন যে!

নরেন মনে মনে অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া কহিল, না, চাই নি। দাম দেবার টাকা নেই আমার।

কালিপদ বুঝিল, ইহা অভিমানের কথা। সে অনেক দিনের চাকর, টাকা-কড়ি সম্বন্ধে বিজয়ার মনের ভাব এবং আচরণের বহু দৃষ্টান্ত সে চোখে দেখিয়াছে। সে তাহার সেই জ্ঞানটুকু আরও একটু ফলাও করিয়া একটু হাসিয়া, একটু তাচ্ছিল্যের ভাবে বলিল, ইঃ—ভারি ত দাম। মাঠানের কাছে ছু-চারশ টাকা নাকি আবার টাকা! নিয়ে যান আপনি। যখন যোগাড় কর্‌তে পার্‌বেন, দামটা পাঠিয়ে দেবেন।

অর্থ-সম্বন্ধে তাহার প্রতি বিজয়ার এই অযাচিত বিশ্বাস নরেনের ক্রোধটাকে একটু নরম করিয়া আনিলেও তাহার কণ্ঠস্বরের তিক্ততা দূর করিতে পারিল না। তাই সে যখন ছুই শতের পরিবর্ত্তে চারিশত দিবার অক্ষমতা জানাইয়া কহিল, না না, তুই ফিরিয়ে নিয়ে যা কালিপদ, আমার দরকার নেই। ছুশ টাকার বদলে চারশ টাকা আমি দিতে পারব না, তখন কালিপদ অনুনয়ের স্বরেই বলিয়া উঠিল, না ডাক্তারবাবু, তা হবে না—আপনি সঙ্গে নিয়ে যান—আমি গাড়ীতে তুলে দিয়ে যাব।

এই জিনিষটা সম্বন্ধে তাহার নিজের একটুখানি বিশেষ গরজ ছিল। বিলাসকে সে ছুচক্ষে দেখিতে পারিত না বলিয়া তাহার প্রতি অনেকটা আক্রোশ বশতঃই নরেনের প্রতি তাহার একপ্রকার সহানুভূতি জন্মিয়াছিল! সেইজন্য দরওয়ানকে দিয়া পাঠাইতে বিজয়া আদেশ করিলেও কালিপদ নিজে যাচিয়া এতটা পথ এই ভারি বাক্সটা বহিয়া আনিয়াছিল। নরেন মনে মনে ইতস্তত: করিতেছে কল্পনা করিয়া সে আরও একটু কাছে ঘেঁসিয়া, গলা খাটো করিয়া বলিল, আপনি নিয়ে যান ডাক্তারবাবু। মাঠান্ ভাল হয়ে চাই কি দামটা আপনাকে ছেড়ে দিতেও পারেন।

এই ইঙ্গিত শুনিয়া নরেন অগ্নিকাণ্ডের ন্যায় জ্বলিয়া উঠিল; বটে! সে ডাকিয়াছে, অথচ তাহার বিলাস অপমান করিয়াছে—এ বুঝি তাহারই যৎকিঞ্চিৎ কৃপার বক্‌শিশ্‌!

কিন্তু প্লাট্‌ফরমের উপর আরও লোকজন ছিল, বলিয়াই সে যাত্রা কালিপদর একটা ফাঁড়া কাটিয়া গেল। নরেন কোনমতে আপনাকে সংবরণ করিয়া লইয়া, বাহিরের পথটা হাত দিয়া নির্দ্দেশ করিয়া শুধু বলিল, যাও, আমার সুমুখ থেকে যাও। বলিয়াই মুখ ফিরাইয়া আর একদিকে চলিয়া গেল। কালিপদ হতবুদ্ধি বিহ্বলের ন্যায় কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ব্যাপারটা যে কি হইল, তাহার মাথায় ঢুকিল না! মিনিট্‌-পোনের পরে গাড়ী আসিল, নরেন যখন উঠিয়া বসিল, তখন কালিপদ আস্তে আস্তে সেই ফার্ষ্ট ক্লাস কামরার জানালার কাছে আসিয়া ডাকিল, ডাক্তারবাবু!

নরেন অন্যদিকে চাহিয়াছিল, মুখ ফিরাইতেই কালিপদর মলিন মুখের উপর চোখ পড়িল। চাকরটার প্রতি নিরর্থক রূঢ় ব্যবহার করিয়া সে মনে মনে একটু অনুতপ্ত হইয়াছিল; তাই একটু হাসিয়া সদয় কণ্ঠে কহিল, আবার কি রে?

সে একটুক্‌রা কাগজ এবং পেন্সিল বাহির করিয়া বলিল, আপনার ঠিকানাটা একটুখানি যদি—

আমার ঠিকানা নিয়ে কি কর্‌বি রে?

আমি কিছু কর্‌ব না—মাঠান্‌ ব'লে দিলেন—

মাঠানের নামে এবার নরেনের আত্মবিস্মৃতি ঘটিল। অকস্মাৎ সে প্রচণ্ড একটা ধমক দিয়া বলিয়া উঠিল, বেরো সাম্‌নে থেকে বল্‌চি—পাজি নচ্ছার কোথাকার!

কালিপদ চমকিয়া দুপা হটিয়া গেল, এবং পরক্ষণেই বাঁশী বাজাইয়া গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

সে ফিরিয়া আসিয়া যখন উপরের ঘরে প্রবেশ করিল, তখন বিজয়া খাটের বাজুতে মাথা রাখিয়া চোখ বুজিয়া হেলান দিয়া বসিয়াছিল। পদ-শব্দে চোখ মেলিতেই কালিপদ কহিল, ফিরিয়ে দিলেন—নিলেন না।

বিজয়ার দৃষ্টিতে বেদনা বা বিস্ময় কিছুই প্রকাশ পাইল না। কালিপদ হাতের কাগজ ও পেন্সিলটা টেবিলের উপর রাখিয়া দিতে দিতে বলিল, বাবা, কি রাগ! ঠিকানা জিজ্ঞেস্ করায় যেন তেড়ে মারতে এলেন। ইহার উত্তরেও বিজয়া কথা কহিল না।

সমস্ত পথটা কালিপদ আপনা আপনি মহলা দিতে দিতে আসিতেছিল, মনিবের আগ্রহের জবাবে সে কি কি বলিবে? কিন্তু সে পক্ষে লেশমাত্র উৎসাহ না পাইয়া সে চোখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিল, বিজয়ার দৃষ্টি তেম্‌নি নির্ব্বিকার, তেম্‌নি শূন্য। হঠাৎ তাহার মনে হইল যেন, সমস্ত জানিয়া শুনিয়াই বিজয়া এই একটা মিথ্যা কাজে তাহাকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাই সে অপ্রতিভ-ভাবে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া, শেষে আস্তে আস্তে বাহির হইয়া গেল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

পাঁচ-ছয় দিনের মধ্যেই বিজয়ার রোগ সারিয়া গেল বটে, কিন্তু শরীর সারিতে দেরি হইতে লাগিল। বিলাস ভাল ডাক্তার দিয়া বলকারক ঔষধ ও পথ্যের বন্দোবস্ত করিতে ত্রুটি করিল না, কিন্তু দুর্ব্বলতা যেন প্রতিদিন বাড়িয়াই যাইতে লাগিল। এদিকে ফাল্গুন শেষ হইতে চলিল, মধ্যে শুধু চৈত্র মাসটা বাকি; বৈশাখের প্রথম সপ্তাহেই ছেলের বিবাহ দিবেন, রাসবিহারীর ইহাই সঙ্কল্প। কিন্তু পাত্র যত দিন দিন পরিপুষ্ট ও কান্তিমান হইয়া উঠিতে লাগিলেন, কন্যা তেম্‌নি শীর্ণ ও মলিন হইয়া যাইতেছে দেখিয়া রাসবিহারী প্রত্যহ একবার

করিয়া আসিয়া উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া যাইতে লাগিলেন। অথচ চেষ্টার কোন দিকে কিছু-মাত্র ত্রুটী হইতেছে না—তবে এ কি! সেই মাইক্রস্কোপ-ঘটিত ব্যাপারটা বাহির হইতে কেমন করিয়া না জানি একটু অতিরঞ্জিত হইয়াই পিতা-পুত্রের কানে গিয়াছিল। শুনিয়া ছোটতরফ যতই লাফাইতে লাগিল, বড়তরফ ততই তাহাকে ঠাণ্ডা করিতে লাগিলেন। পরিশেষে ছেলেকে তিনি বিশেষ করিয়া সতর্ক করিয়া দিলেন যে, এই সকল ছোট-খাটো বিষয় লইয়া দাপাদাপি করিয়া বেড়ানো শুধু যে নিষ্প্রয়োজন তাই নয়, তাহার অসুস্থ দেহের উপর হাঙ্গামা করিতে গেলে, হিতে বিপরীত ঘটাও অসম্ভব নয়। বিলাস পৃথিবীর আর যত লোককেই তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করুক, পিতার পাকাবুদ্ধিকে সে মনে মনে খাতির করিত; কারণ ঐহিক ব্যাপারে সে বুদ্ধির উৎকর্ষতার এত অপর্য্যাপ্ত নজির রহিয়া গেছে তাহার প্রামাণ্য-সম্বন্ধে সন্দেহ করা একপ্রকার অসম্ভব। সুতরাং এই লইয়া বুকের মধ্যে তাহার যত বিষই গাঁজাইয়া উঠিতে থাকুক, এই প্রকাশ্য বিদ্রোহ করিতে সাহস করে নাই; কিন্তু আর সহিল না। সেদিন হঠাৎ অতিতুচ্ছ কারণে সে কালিপদকে লইয়া পড়িল। এবং প্রথমটা এই-মারি-ত-এই-মারি করিয়া অবশেষে তাহার মাহিনা চুকাইয়া দিতে গমস্তার প্রতি হুকুম করিয়া তাহাকে ডিস্‌মিস্ করিল।

চিকিৎসক বিজয়ার সকালে বিকালে যৎকিঞ্চিৎ ভ্রমণের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সেদিন সকালে সে নদীর তীরে একটু ঘুরিয়া ফিরিয়া বাটী ফিরিতেই কালিপদ অশ্রুবিকৃত স্বরে বলিল, মা, ছোটবাবু আমাকে জবাব দিলেন।

বিজয়া আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কেন?

কালিপদ কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল, কর্ত্তাবাবু স্বর্গে গেছেন, কিন্তু

তেনার কাছে কখন গাল-মন্দ খাই নি মা, কিন্তু আজ—, বলিয়া সে ঘন ঘন চোখ মুছিতে লাগিল; তার পরে কান্না শেষ করিয়া যাহা কহিল, তাহার মর্ম্ম এই যে, যদিচ সে কোন অপরাধ করে নাই, তথাপি ছোটবাবু তাহাকে দুচক্ষে দেখিতে পারেন না। ডাক্তারবাবুর কাছে সেই বাক্সটা দিতে যাওয়ার কথা কেন আমি তাঁহাকে নিজে জানাই নাই, কেন আমি তাঁহাকে ঘরে ডাকিয়া আনিয়াছিলাম—ইত্যাদি ইত্যাদি।

বিজয়া চৌকির উপর অত্যন্ত শক্ত হইয়া বসিয়া রহিল—বহুক্ষণ পর্য্যন্ত একটা কথাও কহিল না। পরে জিজ্ঞাসা করিল, তিনি কোথায়?

কালিপদ বলিল, কাছারি-ঘরে ব'সে কাগজ দেখচেন।

বিজয়া বহুক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া কহিল, আচ্ছা, দরকার নেই—এখন তুই কাজ কর গে যা! বলিয়া নিজেও চলিয়া গেল। ঘণ্টা-খানেক পরে জানালা দিয়া দেখিতে পাইল, বিলাস কাছারি-ঘর হইতে বাহির হইয়া বাড়ি চলিয়া গেল। কেন যে আজ আর সে তত্ত্ব লইতে বাড়ি ঢুকিল না, তাহা সে বুঝিল।

দয়াল আরোগ্য হইয়া আবার নিয়মিত কাজে আসিতেছিলেন। সন্ধ্যার পূর্ব্বে ঘরে ফিরিবার সময় এক-একদিন বিজয়া তাঁহার সঙ্গ লইত, এবং কথা কহিতে কহিতে কতকটা পথ আগাইয়া দিয়া পুনরায় ফিরিয়া আসিত।

নরেনের প্রতি দয়ালের অন্তঃকরণ সম্ভ্রমে, কৃতজ্ঞতায় একেবারে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। পীড়ার কথা উঠিলে বৃদ্ধ এই নবীন চিকিৎসকের উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় সহস্র-মুখ হইয়া উঠিতেন। বিজয়া চুপ করিয়া শুনিত, কিন্তু কোনরূপ আগ্রহ প্রকাশ করিত না বলিয়াই, দয়াল মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিতেন না যে, তাঁহার একান্ত ইচ্ছা, ইহাকে ডাকিয়াই একবার বিজয়ার অসুখের কথাটা জিজ্ঞাসা করা হয়। ভিতরের রহস্য তখনো তাঁহার সম্পূর্ণ অগোচর ছিল বলিয়াই বিজয়ার নীরব উপেক্ষায়

তিনি মনে মনে পীড়া অনুভব করিয়া সহস্র প্রকার ইঙ্গিতের দ্বারা প্রকাশ করিতে চাহিতেন, হোক্ সে ছেলেমানুষ ; কিন্তু যে সব নামজাদা, বিজ্ঞ চিকিৎসকের দল তোমার মিথ্যা চিকিৎসা করিয়া টাকা এবং সময় নষ্ট করিতেছে, তাহাদের চেয়ে সে ঢের বেশি বিজ্ঞ, ইহা আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি।

কিন্তু এই গোপন রহস্যের আভাস পাইতে তাঁহার বেশি দিন লাগিল না। দিন পাঁচ-ছয় পরেই একদিন সহসা তিনি বিজয়ার ঘরে আসিয়া বলিলেন, কালিপদকে আর ত আমি বাড়িতে রাখতে পারি নে মা।

বিজয়ার এ আশঙ্কা ছিলই ; তথাপি সে জিজ্ঞাসা করিল, কেন ?

দয়াল কহিলেন, তুমি যাকে বাড়িতে রাখতে পার্‌লে না, আমি তাকে রাখব কোন্ সাহসে বল দেখি মা ?

বিজয়া মনে মনে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া কহিল, কিন্তু সেটাও ত আমারি বাড়ি।

দয়াল লজ্জা পাইয়া বলিলেন, তা ত বটেই। আমরা সকলেই ত তোমার আশ্রিত মা। কিন্তু—

বিজয়া জিজ্ঞাসা করিল, তিনি কি আপনাকে রাখতে নিষেধ করেছেন ?

দয়াল চুপ করিয়া রহিলেন। বিজয়া বুঝিতে পারিয়া কহিল, তবে আমার কাছেই কালিপদকে পাঠিয়ে দেবেন। সে আমার বাবার চাকর, তাকে আমি বিদায় দিতে পার্‌ব না।

দয়াল ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া সঙ্কোচের সহিত কহিলেন, কাজটা ভাল হবে না মা। তাঁর অবাধ্য হওয়াও তোমার কর্ত্তব্য নয়।

বিজয়া ভাবিয়া বলিল, তা হ'লে আমাকে কি কর্‌তে বলেন ?

দয়াল কহিলেন, তোমাকে কিছুই কর্‌তে হবে না। কালিপদ নিজেই বাড়ি যেতে চাচ্চে। আমি বলি, কিছুদিন সে তাই যাক্।

বিজয়া অনেকক্ষণ নীরব থাকিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাসের সঙ্গে বলিল, তবে তাই হোক্। কিন্তু যাবার আগে এখানে তাকে একবার পাঠিয়ে দেবেন।

দীর্ঘশ্বাসের শব্দে চকিত হইয়া বৃদ্ধ মুখ তুলিতেই এই তরুণীর মলিন মুখের উপর একটা নিবিড় ঘৃণার ছবি দেখিতে পাইয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। সেদিন এ সম্বন্ধে আর কোন কথা বলিতে তাঁহার সাহস হইল না।

ইহার পরে চার-পাঁচদিন দয়ালকে আর দেখিতে পাওয়া গেল না। বিজয়া কাছারি-ঘরে সংবাদ লইয়া জানিল, তিনি কাজেও আসেন নাই; শুনিয়া উদ্বিগ্ন-চিত্তে ভাবিতেছে, লোক পাঠাইয়া সংবাদ লওয়া প্রয়োজন কি না, এমনি সময়ে দ্বারের বাহিরে তাঁহারই কাসির শব্দে বিজয়া সানন্দে উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহাকে ঘরে আনিয়া বসাইল।

দয়ালের স্ত্রী চিররুগ্না। হঠাৎ তাঁহারই অসুখের বাড়াবাড়িতে কয়েকদিন তিনি বাহির হইতে পারেন নাই। নিজেকেই পাক করিতে হইতেছিল। অথচ তাঁহার নিরুদ্বেগ মুখের চেহারায় বিজয়া বুঝিতে পারিল, বিশেষ কোন ভয় নাই। তথাপি প্রশ্ন করিল, এখন তিনি কেমন আছেন?

দয়াল বলিলেন, আজ ভাল আছেন। নরেনবাবুকে চিঠি লিখতে, কাল বিকালে এসে তিনি ওষুধ দিয়ে গেছেন। কি অদ্ভুত চিকিৎসা মা, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই পীড়া যেন বারো আনা আরোগ্য হয়ে গেছে।

বিজয়া মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিল, ভাল হবে না? আপনাদের সকলের কি সোজা বিশ্বাস তাঁর উপরে?

দয়াল বলিলেন, সে কথা সত্যি। কিন্তু বিশ্বাস ত শুধু শুধু হয় না মা? আমরা পরীক্ষা ক'রে দেখেচি কি না। মনে হয় ঘরে পা দিলেই যেন সমস্ত ভাল হয়ে যাবে।

তা হবে, বলিয়া বিজয়া আবার একটুখানি হাসিল। এবার দয়াল

নিজেও একটু হাসিয়া কহিলেন, শুধু তাঁরই চিকিৎসা ক'রে যান নি মা, আরও একজনের ব্যবস্থা ক'রে গেছেন। বলিয়া তিনি টেবিলের উপর এক টুক্‌রা কাগজ মেলিয়া ধরিলেন।

একখানা প্রেস্‌ক্রিপসন্! উপরে বিজয়ার নাম লেখা। লেখাটুকুর উপর চোখ পড়িবামাত্রই ওই কয়টা অক্ষর যেন আনন্দের বাণ হইয়া বিজয়ার বুকে আসিয়া বিঁধিল। পলকের জন্য তাহার সমস্ত মুখ আরক্ত হইয়াই একেবারে ছাইয়ের মত ফ্যাকাশে হইয়া গেল। বৃদ্ধ নিজের কৃতিত্বের পুলকে এম্‌নি বিভোর হইয়াছিলেন যে, সেদিকে দৃষ্টিপাতও করিলেন না। বলিলেন, তোমাকে কিন্তু উপেক্ষা কর্‌তে দেব না মা। ওষুধটা একবার পরীক্ষা ক'রে দেখতেই হবে, তা ব'লে দিচ্চি।

বিজয়া আপনাকে সামলাইয়া লইয়া কহিল, কিন্তু এ যে অন্ধকারে ঢিল ফেলা—

বৃদ্ধ গর্ব্বে প্রদীপ্ত হইয়া বলিলেন, ইস্! তাই বুঝি! এ কি তোমার নেটিভ ডাক্তার পেয়েছ মা, যে দক্ষিণা দিলেই ব্যবস্থা লিখে দেবে? এ যে বিলাতের বড় পাশ-করা ডাক্তার! নিজের চোখে না দেখে যে এঁরা কিছুই করেন না! এঁদের দায়িত্ব-বোধ কি সোজা মা?

অকৃত্রিম বিস্ময়ে বিজয়া দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া কহিল, নিজের চোখে দেখে কি রকম? কে বল্‌লে আমাকে তিনি দেখে গেছেন? এ শুধু আপনার মুখের কথা শুনেই ওষুধ লিখে দিয়েছেন।

দয়াল বার বার করিয়া মাথা নাড়িয়া বলিতে লাগিলেন, না, না, না, তা কখনই নয়। কাল যখন তুমি তোমাদের বাগানের রেলিঙ ধ'রে দাঁড়িয়েছিলে, তখন ঠিক তোমার স্মুখের পথ দিয়েই যে তিনি হেঁটে গেছেন। তোমাকে ভাল করেই দেখে গেছেন—বোধ হয় অন্যমনস্ক ছিলে বলেই—

বিজয়া হঠাৎ চমকিয়া কহিল, তাঁর কি সাহেবি পোষাক ছিল? মাথায় হ্যাট্ ছিল?

দয়াল কৌতুকের প্রাবল্যে হাঃ হাঃ করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিতে লাগিলেন, কে বল্‌বে যে খাঁটি সায়েব নয়? কে বল্‌বে আমাদের স্বজাতি বাঙ্গালী? আমি নিজেই যে হঠাৎ চম্‌কে গিয়েছিলুম মা।

সুমুখ দিয়া গিয়াছেন, ঠিক চোখের উপর দিয়া গিয়াছেন, তাহাকে দেখিতে দেখিতে গিয়াছেন—অথচ সে একটিবারের বেশি দৃষ্টিপাত পর্য্যন্ত করে নাই। পুলিশের কোন ইংরাজ কর্ম্মচারী হইবে ভাবিয়া বরঞ্চ সে অবজ্ঞায় চোখ নামাইয়া লইয়াছিল। তাহার হৃদয়ের মধ্যে কি ঝড় বহিয়া গেল, বৃদ্ধ তাহার কোন সংবাদই রাখিলেন না। তিনি নিজের মনে বলিয়া যাইতে লাগিলেন—মাঝে শুধু চৈত্র মাসটা বাকি। বৈশাখের প্রথম, না হয় বড় জোর দ্বিতীয় সপ্তাহেই বিবাহ। বল্‌লাম, মায়ের যে শরীর সারে না ডাক্তারবাবু, একটা কিছু ওষুধ দিন, যাতে—তাঁহার মুখের কথাটা ঐখানেই অসমাপ্ত রহিয়া গেল।

এভাবে অকস্মাৎ থামিয়া যাইতে দেখিয়া বিজয়া মুখ তুলিয়া তাঁহার দৃষ্টি অনুসরণ করিতেই দেখিল, বিলাস ঘরে ঢুকিতেছে। একটা আলোচনা চলিতেছিল, তাহার আগমনে বন্ধ হইয়া গেল—প্রবেশ-মাত্রই অনুভব করিয়া বিলাসের চোখ-মুখ ক্রোধে কালো হইয়া উঠিল। কিন্তু আপনাকে যথাসাধ্য সংবরণ করিয়া সে নিকটে আসিয়া একখানা চৌকি টানিয়া লইয়া বসিল। ঠিক সম্মুখে প্রেস্‌ক্রিপসন্‌টা পড়িয়া ছিল, দৃষ্টি পড়ায় হাত দিয়া সেখানা টেবিলের উপর হইতে তুলিয়া লইয়া আগাগোড়া তিন-চার বার করিয়া পড়িয়া যথাস্থলে রাখিয়া দিয়া কহিল, নরেন ডাক্তারের প্রেস্‌ক্রিপসন্ দেখ্‌চি। এলো কি ক'রে—ডাকে না কি?

কেহই সে কথার উত্তর দিল না। বিজয়া ঈষৎ মুখ ফিরাইয়া জানালার বাহিরে চাহিয়া রহিল।

বিলাস হিংসায়-পোড়া একটুখানি হাসি হাসিয়া বলিল, ডাক্তার ত নরেন-ডাক্তার! তাই বুঝি এঁদের ওষুধ খাওয়া হয় না, শিশির ওষুধ শিশিতেই পচে; তার পরে ফেলে দেওয়া হয়? তা না হয় হল, কিন্তু এই কলির ধন্বন্তরিটি কাগজখানি পাঠালেন কি ক'রে শুনি? ডাকে না কি?

এ প্রশ্নেরও কেহ জবাব দিল না!

সে তখন দয়ালের প্রতি চাহিয়া কহিল, আপনি ত এতক্ষণ খুব লেক্‌চার দিচ্ছিলেন—সিঁড়ি থেকেই শোনা যাচ্ছিল—বলি, আপনি কিছু জানেন?

এই জমিদারী সেরেস্তায় বিলাসবিহারীর অধীনে কর্ম্ম গ্রহণ করা অবধি দয়াল মনে মনে তাহাকে বাঘের মত ভয় করিতেন। কালিপদর মুখে শুনিতেও কিছু বাকি ছিল না। সুতরাং প্রেস্‌ক্রিপসন্‌খানা হাতে করা পর্য্যন্তই তাঁহার বুকের ভিতরটা বাঁশপাতার মত কাঁপিতেছিল। এখন প্রশ্ন শুনিয়া মুখের মধ্যে জিভটা তাঁহার এম্‌নি আড়ষ্ট হইয়া গেল যে, কথা বাহির হইল না।

বিলাস এক মুহূর্ত্ত স্থির থাকিয়া ধমক্ দিয়া কহিল, একেবারে যে ভিজে-বেরালটি হয়ে গেলেন? বলি জানেন কিছু?

চাকরীর ভয় যে ভারাক্রান্ত দরিদ্রকে কিরূপ হীন করিয়া ফেলে, তাহা দেখিলে ক্লেশ বোধ হয়। দয়াল চম্‌কিয়া উঠিয়া অস্ফুট-স্বরে কহিলেন, আজ্ঞে হাঁ, আমিই এনেচি।

ওঃ—তাই বটে! কোথায় পেলেন সেটাকে?

দয়াল তখন জড়াইয়া জড়াইয়া কোন মতে ব্যাপারটা বিবৃত করিলেন।

বিলাস স্তব্ধভাবে কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া কহিল, গেল বছরের হিসাবটা আপনাকে সার্‌তে বলেছিলাম, সেটা সারা হয়েচে?

দয়াল বিবর্ণমুখে কহিলেন, আজ্ঞে, দুদিনের মধ্যেই সেরে ফেল্‌ব।

হয় নি কেন?

বাড়িতে ভারি বিপদ্ যাচ্ছিল, রাঁধতে হ'তো—আস্‌তেই পারি নি।

প্রত্যুত্তরে বিলাস কুৎসিত কটু-কণ্ঠে দয়ালের জড়িমার নকল করিয়া হাত নাড়িয়া বলিল, আস্‌তেই পারি নি। তবে আর কি, আমাকে রাজা করেছেন! বলিয়া তীব্র-স্বরে কহিল, আমি তখনই বাবাকে বলেছিলাম, এ সব বুড়ো-হাবড়া নিয়ে আমার কাজ চল্‌বে না।

এতক্ষণ পরে বিজয়া মুখ ফিরাইয়া চাহিল। তাহার মুখের ভাব প্রশান্ত, গম্ভীর; কিন্তু দুই চোখ দিয়া যেন আগুন বাহির হইতেছিল। অনুচ্চ কঠিন-কণ্ঠে কহিল, দয়ালবাবুকে এখানে কে এনেচে জানেন? আপনার বাবা নন—আমি।

বিলাস থমকিয়া গেল। তাহার এরূপ কণ্ঠস্বরও সে আর কখনো শুনে নাই, এরূপ চোখের চাহনিও আর কখন দেখে নাই। কিন্তু নত হইবার পাত্র সে নয়। তাই পলকমাত্র স্থির থাকিয়া জবাব দিল, যেই আনুক, আমার জানবার দরকার নেই। আমি কাজ চাই, কাজের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ।

বিজয়া কহিল, যাঁর বাড়িতে বিপদ্, তিনি কি ক'রে কাজ কর্‌তে আস্‌বেন?

বিলাস উদ্ধত-ভাবে বলিল, অমন সবাই বিপদের দোহাই পাড়ে। কিন্তু সে শুন্‌তে গেলে ত আমার চলে না! আমি দরকারি কাজ সেরে রাখতে হুকুম দিয়েছিলাম, হয় নি কেন, সেই কৈফিয়ৎ চাই। বিপদের খবর জানতে চাই নে।

বিজয়ার ওষ্ঠাধর কাঁপিতে লাগিল। কহিল, সবাই মিথ্যাবাদী নয়—সবাই মিথ্যা বিপদের দোহাই দেয় না; অন্ততঃ মন্দিরের আচার্য্য দেয় না।

সে যাক্‌, কিন্তু, আপনাকে জিজ্ঞাসা করি আমি, যখন জানেন, দরকারি কাজ হওয়া চাই-ই, তখন নিজে কেন সেরে রাখেন নি? আপনি কেন চার দিন কাজ কামাই কর্‌লেন? কি বিপদ হয়েছিল আপনার শুনি।

বিলাস বিস্ময়ে হতবুদ্ধিপ্রায় হইয়া কহিল, আমি নিজে খাতা সেরে রাখব! আমি কামাই কর্‌লাম কেন?

বিজয়া কহিল, হাঁ, তাই। মাসে মাসে দু'শ টাকা মাইনে আপনি নেন। সে টাকা ত আমি শুধু শুধু আপনাকে দিই নে, কাজ কর্‌বার জন্যেই দি!

বিলাস কলের পুতুলের মত কেবল কহিল, আমি চাকর? আমি তোমার আমলা?

অসহ্য ক্রোধে বিজয়ার প্রায় হিতাহিত-জ্ঞান লোপ হইয়াছিল; সে তীব্রতর-কণ্ঠে উত্তর দিল, কাজ কর্‌বার জন্য যাকে মাইনে দিতে হয়, তাকে ও-ছাড়া আর কি বলে? আপনার অসংখ্য উৎপাত আমি নিঃশব্দে সয়ে এসেছি; কিন্তু যত সহ্য করেচি, অন্যায় উপদ্রব ততই বেড়ে গেছে। যান, নিচে যান। প্রভু-ভৃত্যের সম্বন্ধ ছাড়া আজ থেকে আপনার সঙ্গে আর আমার কোন সম্বন্ধ থাকবে না। যে নিয়মে আমার অপর কর্ম্মচারীরা কাজ করে, ঠিক সেই নিয়মে কাজ করতে পারেন করবেন, নইলে আপনাকে আমি জবাব দিলুম, আমার কাছারিতে ঢোক্‌বার চেষ্টা করবেন না!

বিলাস লাফাইয়া উঠিয়া দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী কম্পিত করিতে করিতে চীৎকার করিয়া বলিল, তোমার এত সাহস!

বিজয়া কহিল, দুঃসাহস আমার নয়, আপনার। আমার ষ্টেটেই চাকরি কর্‌বেন, আর আমারই উপর অত্যাচার কর্‌বেন! আমাকে 'তুমি' বল্‌বার অধিকার কে আপনাকে দিয়েছে? আমার চাকরকে

আমারি বাড়িতে জবাব দেবার, আমার অতিথিকে আমারই চোখের সাম্‌নে অপমান কর্‌বার এ সকল স্পর্দ্ধা কোথা থেকে আপনার জন্মাল ?

বিলাস ক্রোধে উন্মত্তপ্রায় হইয়া চীৎকারে ঘর ফাটাইয়া বলিল, অতিথির বাপের পুণ্য যে, সেদিন তার গায়ে হাত দিই নি—তার একটা হাত ভেঙে দিই নি। নচ্ছার, বদ্‌মাইস, জোচ্চোর, লোফার কোথাকার! আর কখনো যদি তার দেখা পাই—

চীৎকার-শব্দে ভীত হইয়া গোপাল কানাই সিংকে ডাকিয়া আনিয়াছিল ; দ্বারপ্রান্তে তাহার চেহারা দেখিতে পাইয়া বিজয়া লজ্জিত হইয়া কণ্ঠস্বর সংযত এবং স্বাভাবিক করিয়া কহিল, আপনি জানেন না, কিন্তু আমি জানি, সেটা আপনারই কত বড় সৌভাগ্য যে, তাঁর গায়ে হাত দেবার অতি-সাহস আপনার হয় নি। তিনি উচ্চ-শিক্ষিত বড় ডাক্তার। সেদিন তাঁর গায়ে হাত দিলেও হয় ত তিনি একজন পীড়িত স্ত্রীলোকের ঘরের মধ্যে বিবাদ না ক'রে সহ্য করেই চলে যেতেন ; কিন্তু এই উপদেশটা আমার ভুলেও অবহেলা কর্‌বেন না যে, ভবিষ্যতে তাঁর গায়ে হাত দেবার সখ যদি আপনার থাকে, ত হয় পিছন থেকে দেবেন, না হয় আপনার মত আরও পাঁচ-সাত জনকে সঙ্গে নিয়ে তবে সুমুখ থেকে দেবেন। কিন্তু বিস্তর চেঁচা-মেচি হয়ে গেছে, আর না! নিচে থেকে চাকর-বাকর দরওয়ান পর্য্যন্ত ভয় পেয়ে ওপরে উঠে এসেছে। যান্, নিচে যান্ ; বলিয়া সে প্রত্যুত্তরের অপেক্ষামাত্র না করিয়া পাশের দরজা দিয়া ও-ঘরে চলিয়া গেল।

উনবিংশ পরিচ্ছেদ

ছেলের মুখে ব্যাপারটা শুনিয়া ক্রোধে, বিরক্তিতে আশাভঙ্গের নিদারুণ হতাশ্বাসে রাসবিহারীর ব্রহ্ম-জ্ঞান ও আনুষঙ্গিক ইত্যাদির খোলস এক মুহূর্ত্তে খসিয়া পড়িয়া গেল। তিনি তিক্ত কটু-কণ্ঠে বলিয়া

উঠিলেন, আরে বাপু হিঁদুরা যে আমাদের ছোটলোক বলে, সেটা ত আর মিছে কথা নয়। ব্রাহ্মই হই, আর যাই হই—কৈবর্ত্ত ত? বামুন-কায়েতের ছেলে হ'লে ভদ্রতাও শিখ্‌তিস্, নিজের ভাল-মন্দ কিসে হয় না হয়, সে কাণ্ডজ্ঞানও জন্মাত। যাও, এখন মাঠে মাঠে হাল-গরু নিয়ে কুল-কর্ম্ম ক'রে বেড়াও গে। উঠতে বসতে তোকে পাখী-পড়া ক'রে শেখালাম যে, ভালয় ভালয় কাজটা একবার হয়ে যাক্, তার পরে যা ইচ্ছে হয় করিস্; কিন্তু তোর সবুর সইল না, তুই গেলি তাকে ঘাঁটাতে। সে হ'ল রায়-বংশের মেয়ে! ডাক-সাইটে হরি রায়ের নাত্‌নী, যার ভয়ে বাঘে-বলদে একঘাটে জল খেত। তুই হাত বাড়িয়ে গেছিস্ তার নাকে দড়ি পরাতে—মুখ্যু কোথাকার! মান-ইজ্জত গেল, এত বড় জমিদারীর আশা-ভরসা গেল, মাসে মাসে দু-দুশ টাকা মাইনে ব'লে আদায় হচ্ছিল, সে গেল—যা এখন চাষার ছেলে, চাষ-বাস ক'রে খেগে যা! আবার আমার কাছে এসেছেন চোখ রাঙিয়ে তাঁর নামে নালিশ কর্‌তে? যা যা—সুমুখ থেকে সরে যা হতভাগা বোম্বেটে শয়তান।

ঘটনাটা না ঘটিলেই যে ঢের ভাল হইত, তাহা বিলাস নিজেও বুঝিতেছিল। তাহাতে পিতৃদেবের এই ভীষণ উগ্রমূর্ত্তি দেখিয়া তাহার সতেজ আস্ফালন নিবিয়া জল হইয়া গেল। তথাপি কি একটু কৈফিয়ৎ দিবার চেষ্টা করিতেই ক্রুদ্ধ পিতা দ্রুতবেগে তাঁহার নিজের ঘরে গিয়া প্রবেশ করিলেন। কিন্তু রাগের মাথায় ছেলেকে যাই বলুন, কাজের বেলায় রাসবিহারী ক্রোধের উত্তেজনাতেও কখনও তাড়া-হুড়া করিয়া কাজ মাটি করেন নাই, আলস্য করিয়াও কখনও ইষ্ট নষ্ট করেন নাই। তাই সেদিনটা তিনি ধৈর্য্য ধরিয়া বিজয়াকে শান্ত হইবার সময় দিয়া পরদিন তাঁহার নিজস্ব শান্তি এবং অবিচলিত গাম্ভীর্য্য লইয়া বিজয়ার

বসিবার ঘরে দেখা দিলেন, এবং চৌকি টানিয়া লইয়া উপবেশন করিলেন।

বিজয়ার ক্রোধোন্মত্ততা ধীরে ধীরে মিলাইয়া গেল, সে নিজের অসংযত রূঢ়তা এবং নির্লজ্জ প্রগল্ভতা স্মরণ করিয়া লজ্জায় মরিয়া যাইতেছিল। বাড়ির সমস্ত চাকর-বাকর এবং কর্ম্মচারীদের সম্মুখে উচ্চকণ্ঠে সে এই যে একটা নাটকের অভিনয় করিয়া বসিল, হয় ত ইহারই মধ্যে তাহা নানা আকারে পল্লবিত এবং অতিরঞ্জিত হইয়া গ্রামের বাটীতে বাটীতে পুরুষ মহলে আলোচিত হইতেছে, এবং পুকুর ও নদীর ঘাটে মেয়েদের হাসি তামাসার ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছে। ইহারই কদর্য্যতা কল্পনা করিয়া সে সেই অবধি আর ঘরের বাহিরে পর্য্যন্ত আসিতে পারে নাই। লজ্জা শতগুণে বাড়িয়া গিয়াছে আরও এই মনে করিয়া যে, আজ যাহাকে সে ভৃত্য বলিয়া প্রকাশ্যে লাঞ্ছনা করিতে সঙ্কোচ মানে নাই, দুই দিন বাদে স্বামী বলিয়া তাহারই গলায় বরমাল্য পরাইবার কথা রাষ্ট্র হইতেও কোথাও আর বাকি নাই।

তাই রাসবিহারী যখন ধীরে ধীরে ঘরে ঢুকিয়া নিঃশব্দে, প্রসন্ন-মুখে আসন গ্রহণ করিলেন, তখন বিজয়া মুখ তুলিয়া তাঁহার মুখের পানে চাহিতেও পারিল না। কিন্তু ইহারই জন্য সে প্রত্যেক মুহূর্ত্তেই প্রতীক্ষা করিয়াছিল, এবং যে সকল যুক্তিতর্কের ঢেউ এবং অপ্রিয় আলোচনা উঠিবে, তাহার মোটামুটি খসড়াটা কাল হইতেই ভাবিয়া রাখিয়াছিল বলিয়া সে এক প্রকার স্থির হইয়াই বসিয়া রহিল। কিন্তু বৃদ্ধ ঠিক উল্টা সুর ধরিয়া বিজয়াকে একেবারে অবাক করিয়া দিলেন। তিনি ক্ষণেক কাল স্তব্ধভাবে থাকিয়া একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, মা বিজয়া, শুনে পর্য্যন্ত আমার যে কি আনন্দ হয়েছে, তা জানাবার জন্যে আমি কালই ছুটে আস্‌তাম—যদি না সেই অম্বলের ব্যথাটা আমাকে

বিছানায় পেড়ে ফেল্‌ত। দীর্ঘজীবী হও মা, আমি এই ত চাই। এই ত তোমার কাছে আশা করি। বলিয়া অত্যন্ত উচ্চ ভাবের আর একটা দীর্ঘশ্বাস মোচন করিয়া কহিলেন, সেই সর্ব্বশক্তিমান মঙ্গলময়ের কাছে শুধু এই প্রার্থনা জানাই, সুখে-দুঃখে, ভালতে-মন্দতে, যেন আমাকে তিনি যা ধর্ম্ম, যা ন্যায়, তার প্রতিই অবিচলিত শ্রদ্ধা রাখ্‌বার সামর্থ্য দেন। এই বলিয়া তিনি যুক্ত-কর মাথায় ঠেকাইয়া চোখ বুজিয়া, বোধ করি, সেই সর্ব্বশক্তিমানকেই প্রণাম করিলেন।

পরে চোখ চাহিয়া হঠাৎ উত্তেজিতভাবে বলিতে লাগিলেন, কিন্তু এই কথাটা আমি কোনমতেই ভেবে পাই নে বিজয়া, বিলাস আমার মত একটা খোলা ভোলা উদাসীন লোকের ছেলে হয়ে এত বড় পাকা বিষয়ী হয়ে উঠ্‌ল কি ক'রে? যার বাপের আজও সংসারে কাজ-কর্ম্মের জ্ঞান, লাভ-লোকসানের ধারণাই জন্মালো না, সে এই বয়সের মধ্যেই এরূপ দৃঢ়কর্ম্মী হয়ে উঠ্‌ল কেমন করে? কি যে তাঁর খেলা, কি যে সংসারের রহস্য, কিছুই বোঝবার জো নেই মা। বলিয়া আর একবার মুদ্রিত-নেত্রে তিনি মাথা নত করিলেন।

বিজয়া নীরবে বসিয়া রহিল। রাসবিহারী আবার একটু মৌন থাকিয়া বলিতে লাগিলেন, কিন্তু কোন জিনিসেরই ত অত্যন্ত ভাল নয়। জানি, বিলাসের কাজ-অন্ত প্রাণ। সেখানে সে অন্ধ। কর্ত্তব্য-কর্ম্মে অবহেলা তার বুকে শূলের মত বাজে; কিন্তু তাই বলে কি মানীর মান রাখ্‌তে হবে না? দয়ালের মত লোকেরও কি ত্রুটি মার্জ্জনা করা আবশ্যক নয়? জানি অপরাধ ছোট-বড় ধনী-নির্ধন বিচার করে না। কিন্তু তাই ব'লে কি তাকে অক্ষরে অক্ষরে মেনে চল্‌তে হবে? সব বুঝি! কাজ না করাও দোষ, খবর না দিয়ে কামাই করাও খুব অন্যায়, অফিসের ডিসিপ্লিন ভঙ্গ করাও অফিস-মাষ্টারের পক্ষে বড় অপরাধ; কিন্তু

দয়ালকেও কি—না মা, আমরা বুড়োমানুষ আমাদের সে তেজও নেই, জোরও নেই—সাহেবেরা বিলাসের কর্ত্তব্যনিষ্ঠার যত সুখ্যাতিই করুক, তাকে যত বড়ই মনে করুক—আমরা কিন্তু কিছুতেই ভাল বলতে পারব না। নিজের ছেলে ব'লে ত এ মুখ দিয়ে মিথ্যা বার হবে না মা! আমি বলি, কাজ না হয় দুদিন পরেই হ'ত, না হয় দশটাকা লোকসানই হ'ত; কিন্তু তাই ব'লে কি মানুষের ভুল-ভ্রান্তি, দুর্ব্বলতা ক্ষমা করতে হবে না? তোমার জমিদারীর ভাল-মন্দের পরেই যে বিলাসের সমস্ত মন পড়ে থাকে, সে তার প্রত্যেক কথাটিতেই বুঝ্‌তে পারি। কিন্তু আমাকে ভুল বুঝো না মা। আমি নিজে সংসার-বিরাগী হলেও বিষয়-সম্পত্তি রক্ষা করা যে গৃহস্থের ধর্ম্ম, তা স্বীকার করি। তার উন্নতি করা আরও ঢের বড় ধর্ম্ম; কারণ সে ছাড়া জগতের মঙ্গল করা যায় না। আর বিলাসের হাতে তোমাদের দুজনের জমিদারী যদি দ্বিগুণ, চতুর্গুণ, এমন কি, দশগুণ হয় শুন্‌তে পাই, আমি তাতেও বিন্দুমাত্র আশ্চর্য্য হ'ব না—আর হচ্চেও তাই দেখতে পাচ্চি। সব ঠিক, সব সত্যি—কিন্তু তাই ব'লে যে বিষয়ের উন্নতিতে কোথাও একটু সামান্য বাধা পৌছলেই ধৈর্য্য হারাতে হবে, সেও যে মন্দ। আমি তাই সেই অদ্বিতীয় নিরাকারের শ্রীপাদপদ্মে বার বার ভিক্ষা জানাচ্চি মা, তার উদ্ধত অবিনয়ের জন্যে যে শাস্তি তাকে তুমি দিয়েচ, তার থেকেই সে যেন ভবিষ্যতে সচেতন হয়। কাজ! কাজ! সংসারে শুধু কাজ করতেই কি এসেছি! কাজের পায়ে কি দয়া-মায়াও বিসর্জ্জন দিতে হবে! ভালই হয়েছে মা, আজ সে তোমার হাত থেকেই তার সর্ব্বোত্তম শিক্ষা লাভ করবার সুযোগ পেলে!

বিজয়া কোন কথাই কহিল না। রাসবিহারী কিছুক্ষণ যেন নিজের অন্তরের মধ্যেই মগ্ন থাকিয়া পরে মুখ তুলিলেন। একটু হাস্য করিয়া কোমল কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, আমার দুটি সন্তানের একটি প্রচণ্ড কর্ম্মী

আর একটি হৃদয় যেন স্নেহ-মমতা-করুণার নির্ঝর! একজন যেমন কাজে উন্মাদ, আর একটি তেমনি দয়া-মায়ায় পাগল। আমি কাল থেকে শুধু স্তব্ধ হয়ে ভাব্‌ছি, ভগবান এই দুটিকে যখন জুড়ি মিলিয়ে তাঁর রথ চালাবেন,তখন দুঃখের সংসারে না জানি কি স্বর্গ-ই নেমে আস্‌বে! আমার আর এক প্রার্থনা মা, এই অলৌকিক বস্তুটি চোখে দেখ্‌বার জন্যে তিনি যেন আমাকে একটি দিনের জন্যও জীবিত রাখেন। বলিয়া এইবার তিনি টেবিলের উপর মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিলেন। মাথা তুলিয়া কহিলেন, অথচ আশ্চর্য্য, ধর্ম্মের প্রতিও তার সোজা অনুরাগ নয়। মন্দির-প্রতিষ্ঠা নিয়ে কি প্রাণান্ত পরিশ্রমই না সে করেছে। যে তাকে জানে না, সে মনে কর্‌বে, বিলাসের ব্রাহ্ম ধর্ম্ম ছাড়া বুঝি সংসারে আর কোন উদ্দেশ্যই নেই। শুধু এরই জন্যে সে বুঝি বেঁচে আছে—এছাড়া—আর বুঝি সে কিছু জানে না! কিন্তু কি ভুল দেখ মা। নিজের ছেলের কথায় এম্‌নি অভিভূত হয়ে পড়েছি যে, তোমাকেই বোঝাচ্ছি। যেন আমার চেয়ে তাকে তুমি কম বুঝেছ! যেন আমার চেয়ে তার তুমি কম মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী! বলিয়া মৃদু মৃদু হাস্য করিয়া কহিলেন, আমার এত আনন্দ ত শুধু সেই জন্যেই মা! আমি যে তোমার হৃদয়ের ভিতরটা আরসির মত স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। তোমার কল্যাণের হাতখানি যে বড় উজ্জ্বল দেখা যাচ্ছে। আর তাও বলি, তুমি ছাড়া এ কাজ কর্‌তে পারেই বা কে, কর্‌বেই বা কে? তার ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ সকলের যে তুমিই সঙ্গিনী। তোমার হাতেই যে তার সমস্ত শুভ নির্ভর কর্‌ছে! তার শক্তি তোমার বুদ্ধি! সে ভার বহন ক'রে চল্‌বে, তুমি পথ দেখাবে। তবেই ত দুজনের জীবন এক সঙ্গে সার্থক হবে মা! সেই জন্যেই ত আজ আমার সুখ ধর্‌ছে না। আজ যে চোখের উপর দেখ্‌তে পেয়েছি, বিলাসের আর ভয় নেই, তার ভবিষ্যতের জন্যে আমাকে একটি মুহূর্ত্তের জন্যেও আর

আশঙ্কা কর্‌তে হবে না! কিন্তু জিজ্ঞাসা করি—এত চিন্তা, এত জ্ঞান, ভবিষ্যৎ-জীবন সফল ক'রে তোল্‌বার এত বড় বুদ্ধি ঐটুকু মাথার মধ্যে এতদিন কোথায় লুকিয়ে রেখেছিলে মা? আজ আমি যে একেবারে অবাক হয়ে গেছি।

বিজয়ার সর্ব্বাঙ্গ চঞ্চল হইয়া উঠিল, কিন্তু সে নিঃশব্দেই বসিয়া রহিল। রাসবিহারী ঘড়ির দিকে চাহিয়া চমকিয়া উঠিয়া পড়িয়া বলিলেন, ইস্, দশটা বাজে যে। একবার দয়ালের স্ত্রীকে দেখ্‌তে যেতে হবে যে!

বিজয়া আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিল, এখন তিনি কেমন আছেন?

ভালই আছেন, বলিয়া তিনি দ্বারের দিকে দুই-এক পদ অগ্রসর হইয়া হঠাৎ থামিয়া বলিলেন, কিন্তু আসল কথাটা যে এখনো বলা হয় নি। বলিয়া ফিরিয়া আসিয়া স্বস্থানে উপবেশন করিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন, তোমার এই বুড়ো কাকাবাবুর একটি অনুরোধ তোমাকে রাখ্‌তে হবে বিজয়া! বল রাখবে? বিজয়া মনে মনে ভীত হইয়া উঠিল। তাহার মুখের ভাব কটাক্ষে লক্ষ্য করিয়া রাসবিহারী বলিলেন, সে হবে না, সন্তানের এ আব্দারটি মাকে রাখ্‌তেই হবে। বল রাখ্‌বে?

বিজয়া অস্ফুটস্বরে কহিল, বলুন।

তখন রাসবিহারী কহিলেন, সে যে শুধু আহার নিদ্রাই পরিত্যাগ করেছে তাই নয়—অনুতাপেও দগ্ধ হয়ে যাচ্ছে জানি; কিন্তু তোমাকে মা, এ ক্ষেত্রে একটু শক্ত হ'তে হবে। কাল অভিমানে সে আসে নি কিন্তু আজ আর থাকৃতে পার্‌বে না—এসে পড়্‌বেই; কিন্তু ক্ষমা চাইবামাত্রই যে মাপ কর্‌বে, সে হবে না—এই আমার একান্ত অনুরোধ। যে অন্যায়ের শাস্তি তাকে দিয়েছ, অন্ততঃ সে শাস্তি আরও একটা দিন সে ভোগ করুক!

এই বলিয়া বিজয়ার মুখের উপর বিস্ময়ের চিহ্ন দেখিয়া তিনি একটু হাসিলেন। স্নেহার্দ্র-স্বরে বলিলেন, তোমার নিজের যে কত কষ্ট হচ্ছে,

সে কি আমার অগোচর আছে মা? তোমাকে কি চিনি নে? তুমি আমারই ত মা? বরঞ্চ তার চেয়েও বেশি ব্যথা পাচ্চো, সেও আমি জানি। কিন্তু অপরাধের শাস্তি পূর্ণ না হ'লে যে প্রায়শ্চিত্ত হয় না! এই গভীর দুঃখ আরো একটা দিন সহ্য না করলে যে সে মুক্ত হবে না! শক্ত না হ'তে পার তার সঙ্গে দেখা ক'রো না; আজ সে বিফল হয়েই ফিরে যাক্। এই যন্ত্রণা আরও কিছু তাকে ভোগ করতে দাও—এই আমার একান্ত অনুরোধ বিজয়া।

রাসবিহারী প্রস্থান করিলে বিজয়া অকৃত্রিম বিস্ময়ে আবিষ্টের ন্যায় স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। এই সকল কথা, এরূপ ব্যবহার তাঁহার কাছে সে একেবারেই প্রত্যাশা করে নাই। বরঞ্চ ঠিক বিপরীতটাই আশঙ্কা করিয়া তাঁহার আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই আপনাকে সে কঠিন করিয়া তুলিতে মনে মনে চেষ্টা করিয়াছিল। বিলাস একাকী আঘাত খাইয়া চলিয়া গেছে, কিন্তু প্রতিঘাতের বেলা সে যে একলা আসিবে না, এবং তখন রাসবিহারীর সহিত তাহার যে একটা অত্যন্ত রকমের বোঝাপড়ার সময় আসিবে, তাহার সমস্ত বীভৎসতার নগ্ন মূর্ত্তিটা কল্পনায় অঙ্কিত করিয়া অবধি বিজয়ার মনে তিল মাত্র শান্তি ছিল না।

এখন বৃদ্ধ ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেলে, শুধু তাহার বুকের উপর হইতে ভয়ের একটা গুরুভার পাথর নামিয়া গেল—সে যে এক সময়ে এই লোকটিকে আন্তরিক শ্রদ্ধা করিত সে কথাও মনে পড়িল, এবং কেন যে এতবড় শ্রদ্ধাটা ধীরে ধীরে সরিয়া গেল, তাহার ঝাপ্সা আভাসগুলা সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়িয়া আজ তাহাকে পীড়া দিতে লাগিল। এমনও একটা সংশয় তাহার অন্তরের মধ্যে উঁকি মারিতে লাগিল, হয় ত সে সেই বৃদ্ধের যথার্থ সংকল্প না বুঝিয়াই তাঁহার প্রতি মনে মনে অবিচার করিয়াছে; এবং তাহার পরলোকগত পিতৃ-আত্মা আবাল্য-সুহৃদের প্রতি

এই অন্যায়ে ক্ষুব্ধ হইতেছেন। সে বার বার করিয়া আপনাকে আপনি বলিতে লাগিল, কই, তিনি ত সত্যকার অপরাধের বেলায় নিজের ছেলেকেও মাপ করেন নাই। বরঞ্চ আমি যেন তাহাকে সহজে ক্ষমা করিয়া তাহার শাস্তিভোগের পরিমাণটা কমাইয়া না দিই, তিনি বার বার সেই অনুরোধই করিয়া গেলেন।

আর একটা কথা—বৃদ্ধের সকল অনুরোধ উপরোধ আন্দোলন আলোচনার মধ্যে যে ইঙ্গিতটা সকলের চেয়ে গোপন থাকিয়াও সর্ব্বাপেক্ষা পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল, সেটা বিলাসের অসীম ভালবাসা, এবং ইহারই অবশ্যম্ভাবী ফল—প্রবল ঈর্ষা।

এই জিনিসটা বিজয়ার নিজের কাছেও যে অজ্ঞাত ছিল, তা নয়; কিন্তু বাহিরের আলোড়নে তাহা যেন নূতন তরঙ্গ তুলিয়া তাহার বুকে আসিয়া লাগিল। এতদিন যাহা শুধু তাহার হৃদয়ের তলদেশেই থিতাইয়া পড়িয়াছিল, তাহাই বাহিরের আঘাতে ফুলিয়া উঠিয়া হৃদয়ের উপরে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল। তাই রাসবিহারী বহুক্ষণ গেলেও তাঁহার আলাপের ঝঙ্কার দুই কানের মধ্যে লইয়া বিজয়া তেম্‌নি নিঃশব্দে জানালার বাহিরে চাহিয়া বিভোর হইয়া বসিয়া রহিল। ঈর্ষা বস্তুটা সংসারে চির দিনই নিন্দিত সত্য, তথাপি সেই নিন্দিত দ্রব্যটা আজ বিজয়ার চক্ষে বিলাসের অনেকখানি নিন্দাকে ফিকা করিয়া ফেলিল, এবং যাহাদিগকে প্রতিপক্ষ কল্পনা করিয়া এই দুটি পিতা-পুত্রের সহস্র রকমের প্রতিহিংসার বিভীষিকা কাল হইতে তাহার প্রত্যেক মুহূর্ত্ত নিরুদ্যম ও নির্জ্জীব করিয়া আনিতেছিল, আজ আবার তাহাদিগকেই আপনার জন ভাবিতে পাইয়া সে যেন হাঁপ ফেলিয়া বাঁচিল।

কালিপদ আসিয়া বলিল, মাঠান্, তা হ'লে এখন আমার যাওয়া হ'ল না ব'লে বাড়িতে আর একখানা চিঠি লিখিয়ে দিই?

বিজয়া ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, আচ্ছা---

কালিপদ চলিয়া যাইতেছিল, বিজয়া তাহাকে আহ্বান করিয়া সলজ্জ-দ্বিধাভরে কহিল, না হয়, আমি বলি কি কালিপদ, চিঠি যখন লিখে দেওয়াই হয়েছে, তখন মাস-খানেকের জন্যে একবার বাড়ি থেকে ঘুরে এস। ওঁর কথাটাও থাক্, তোমারও একবার বাড়ি যাওয়া—অনেক দিন ত যাও নি, কি বল?

কালিপদ মনে মনে আশ্চর্য্য হইল, কিন্তু সম্মত হইয়া কহিল, আচ্ছা আমি মাস-খানেক ঘুরে আসি মাঠান্। এই বলিয়া সে প্রস্থান করিলে, এই দুর্ব্বলতায় বিজয়ার কি একরকম যেন ভারি লজ্জা করিতে লাগিল; কিন্তু তাই বলিয়া তাহাকে আর একবার ফিরাইয়া ডাকিয়া নিষেধ করিয়া দিতেও পারিল না। সেও লজ্জা করিতে লাগিল।

বিংশ পরিচ্ছেদ

প্রাচীরের ধারে যে কয়টা ঘর লইয়া বিজয়ার জমিদারীর কাজ-কর্ম্ম চলিত, তাহার সম্মুখেই একসার ঘন-পল্লবের লিচু গাছ থাকায় বসত-বাটীর উপরের বারান্দা হইতে ঘরগুলার কিছুই প্রায় দেখা যাইত না। তা ছাড়া পূর্ব্বদিকে প্রাচীরের গায়ে যে ছোট দরজাটা ছিল, তাহা দিয়া যাতায়াত করিলে কর্ম্মচারীদের কে কখন আসিতেছে যাইতেছে, তাহার কিছুই জানিবার জো ছিল না।

সেই অবধি দয়াল বাড়ির মধ্যে আর আসেন নাই। কাজ করিতে কাছারিতে আসেন কি না, সঙ্কোচবশতঃ সে সংবাদও বিজয়া লয় নাই, আর বিলাসবিহারী যে এ দিক্ মাড়ান্ না, তাহা কাকেও কোন প্রশ্ন না করিয়াই সে স্বতঃসিদ্ধের মত মানিয়া লইয়াছিল। মধ্যে শুধু একদিন সকালে মিনিট-দশেকের জন্য রাসবিহারী দেখা করিতে আসিয়াছিলেন,

কিন্তু সাধারণভাবে দুই-চারিটা অসুখের কথা-বার্ত্তা ছাড়া আর কোন কথাই হয় নাই।

মানুষের অন্তরের কথা অন্তর্যামীই জানুন, কিন্তু মুখের যেটুকু প্রসন্নতা এবং সৌহৃদ্য লইয়া সেদিন তিনি পুত্রের বিরুদ্ধে ওকালতি করিয়া গিয়াছিলেন, কোন অজ্ঞাত কারণে সে ভাব তাঁহার পরিবর্ত্তিত হইয়াছে নিশ্চয় বুঝিয়া বিজয়া উদ্বেগ অনুভব করিয়াছিল। মোটের উপর সবটুকু জড়াইয়া একটা অতৃপ্তি অস্বস্তির মধ্যেই তাহার দিন কাটিতেছিল। এমন করিয়া আরও কয়েক দিন কাটিয়া গেল।

আজ অপরাহ্ণ-বেলায় বিজয়া বাটীর কাছাকাছি নদীর তীরে একটুখানি বেড়াইবার জন্য একাকী বাহির হইতেছিল, বৃদ্ধ নায়েবমশাই একতাড়া খাতা-পত্র বগলে লইয়া সুমুখে আসিয়া দাঁড়াইল, এবং ভক্তিভরে নমস্কার করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, মা কি কোথাও বার হচ্চেন? কানাই সিং কৈ?

বিজয়া হাসিমুখে বলিল, এই কাছেই একটুখানি নদীর তীরে ঘুরে আস্‌তে যাচ্চি! দরওয়ানের দরকার নেই। আমাকে কি আপনার কোন আবশ্যক আছে?

নায়েব কহিল, একটু ছিল মা। না হয় কাল্‌কেই হবে। বলিয়া সে ফিরিবার উপক্রম করিতেই, বিজয়া পুনরায় হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, দরকার যদি একটুখানিই হয় ত আজই বলুন না। অত খাতাপত্র নিয়ে কোথায় চলেছেন।

নায়েব সেইগুলাই দেখাইয়া কহিল, আপনার কাছেই এসেছি। গত বছরের হিসাবটা সারা হয়েছে—মিলিয়ে দেখে একটা দস্তখত ক'রে দিতে হবে। তা ছাড়া, ছোটবাবু হুকুম দিয়েছেন, হাল সনের জমাখরচটাতেও রোজ তারিখে আপনার সই নেওয়া চাই।

বিজয়া অতিমাত্রায় বিস্মিত হইয়া ফিরিয়া আসিয়া বাহিরের ঘরে বসিল। নায়েব সঙ্গে আসিয়া টেবিলের উপর সেগুলা রাখিয়া দিয়া একখানা খুলিবার উদ্যোগ করিতেই বিজয়া বাধা দিয়া প্রশ্ন করিল, এ হুকুম ছোটবাবু কবে দিলেন?

আজই সকালে দিয়েছেন।

আজ সকালে তিনি এসেছিলেন?

তিনি ত রোজই আসেন।

এখন কাছারী-ঘরে আছেন?

নায়েব ঘাড় নাড়িয়া কহিল, আমাকে পাঠিয়ে দিয়ে তিনি এইমাত্র চ'লে গেলেন।

সেদিনের হাঙ্গামা কোন আমলারই অবিদিত ছিল না। নায়েব, বিজয়ার প্রশ্নের ইঙ্গিত বুঝিয়া, ধীরে ধীরে অনেক কথাই কহিল। বিলাস-বিহারী প্রত্যহ ঠিক এগারোটার সময় কাছারীতে উপস্থিত হন; কাহারও সহিত বিশেষ কোন কথাবার্ত্তা কহেন না, নিজের মনে কাজ করিয়া পাঁচটার সময় বাড়ি ফিরিয়া যান। দয়ালবাবুর বাটীতে অসুখ আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহার আসিবার আবশ্যক নাই বলিয়া তাঁহাকে ছুটি দিয়াছেন ইত্যাদি অনেক ব্যাপার মনিবের গোচর করিল।

বিজয়া লজ্জিত মুখে নীরবে সমস্ত কাহিনী শুনিয়া বুঝিল, বিলাস এই নূতন নিয়ম নিদারুণ অভিমানবশেই প্রবর্ত্তিত করিয়াছে। তথাপি এমন কথাও কহিল না যে, এতদিন যাঁহার সই লইয়া কাজ চলিতেছিল, আজও চলিবে—তাহার নিজের সই অনাবশ্যক। বরঞ্চ বলিল, এগুলো থাক, কাল সকালে একবার এসে আমার সই নিয়ে যাবেন। বলিয়া নায়েবকে বিদায় দিয়া সেইখানেই স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। বাহিরে দিনের আলো ক্রমশঃ নিবিয়া আসিল, এবং প্রতিবেশীদের ঘরে ঘরে শাঁখের শব্দে সন্ধ্যার

শান্ত আকাশ চঞ্চল হইয়া উঠিল ; তথাপি তাহার উঠিবার লক্ষণ দেখা গেল না। আরও কতক্ষণ যে সে এম্‌নি একভাবে বসিয়া কাটাইত, বলা যায় না ; কিন্তু বেহারা আলো হাতে করিয়া ঘরে ঢুকিয়াই হঠাৎ অন্ধকারের মধ্যে কর্ত্রীকে একাকী দেখিয়া যেমন চমকাইয়া উঠিল ; বিজয়া নিজেও তেমনি লজ্জা পাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং বাহিরে আসিয়াই একেবারেই স্তম্ভিত হইয়া গেল।

যে জিনিসটি তাহার চোখে পড়িল, সে তাহার সুদূর কল্পনারও অতীত। সে কি কোন কারণে কোন ছলেও আর এ বাড়িতে পা দিতে পারে ? অথচ সেই প্রায়ান্ধকারেও স্পষ্ট দেখা গেল, সেদিনের সেই সাহেবটিকে হ্যাট্‌ সমেত প্রায় সাড়ে ছয় ফুট দীর্ঘ দেহ লইয়া গেটের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, এবং সাধারণ বাঙালীর অন্ততঃ আড়াই গুণ লম্বা পা ফেলিয়া এই দিকেই আসিতেছে।

আজ আর তাহাকে পুলিশ কর্ম্মচারী বলিয়া ভুল হয় নাই। কিন্তু আনন্দের সেই অপরিমিত দীপ্ত রেখাটিকে যে তাহার আকাশ-পাতাল-জোড়া নিরাশা ও ভয়ের অন্ধকার চক্ষের পলকে গিলিয়া ফেলিল। গাছ-পালায়-ঘেরা আঁকা-বাঁকা পথের মাঝে মাঝে তাহার দেহ অদৃশ্য হইতে লাগিল বটে, কিন্তু পথের কাঁকরে তাহার জুতার শব্দ ক্রমেই সন্নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। বিজয়া মনে মনে বুঝিল, তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া বসানো ভয়ানক অন্যায়, কিন্তু দ্বারের বাহির হইতে অবহেলায় বিদায় দেওয়াও যে অসাধ্য !

এই অবস্থা সঙ্কট হইতে পরিত্রাণের উপায় কোন দিকে খুঁজিয়া না পাইয়া, যে মুহূর্ত্তে পথের বাঁকে কামিনী গাছের পাশে সেই দীর্ঘ ঋজুদেহ তাহার সুমুখে আসিয়া পড়িল, সেই মুহূর্ত্তেই সে পিছন ফিরিয়া দ্রুতবেগে তাহার ঘরের মধ্যে গিয়া প্রবেশ করিল। বৃদ্ধ নায়েব কিছুই

লক্ষ্য করে নাই, নিজের মনে চলিয়াছে; অকস্মাৎ সাহেব দেখিয়া ত্রস্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু সাহেবের প্রশ্নে চিনিতে পারিয়া আশ্বস্ত এবং নিরাপদ হইয়া জবাব দিল, হাঁ, উনি বাহিরের ঘরেই আছেন, বলিয়া চলিয়া গেল। প্রশ্ন এবং উত্তর দুই-ই বিজয়ার কানে গেল। ক্ষণেক পরেই ঘরে ঢুকিয়া নরেন নমস্কার করিল। লাঠি এবং টুপি টেবিলের উপর রাখিয়া সহাস্যে কহিল, এই যে দেখ্‌চি আমার ওষুধের চমৎকার ফল হয়েছে। বাঃ!

ক্ষণেক পূর্ব্বেই বিজয়া মনে মনে ভাবিয়াছিল, আজ বুঝি সে চোখ তুলিয়া চাহিতেও পারিবে না—একটা কথার জবাব পর্য্যন্ত তাহার মুখে ফুটিবে না। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, এই লোকটির কণ্ঠস্বর শুনিবামাত্রই শুধু যে তাহার দ্বিধা-সঙ্কোচই ভোজবাজির মত অন্তর্হিত হইয়া গেল, তাই নয়, তাহার হৃদয়ের অন্ধকার, অজ্ঞাত কোণে সুরবাঁধা বীণার তারের উপর কে যেন না জানিয়া আঙুল বুলাইয়া দিল; এবং এক মুহূর্ত্তেই বিজয়া তাহার সমস্ত বিষাদ বিস্মৃত হইয়া বলিয়া উঠিল, কি ক'রে জান্‌লেন? আমাকে দেখে, না কারো কাছে শুনে?

নরেন বলিল, শুনে। কেন, আপনি কি দয়ালবাবুর কাছে শোনেন নি যে, আমার ওষুধ খেতে পর্য্যন্ত হয় না, শুধু প্রেস্‌ক্রিপসন্‌টার ওপর একবার চোখ বুলিয়ে ছিঁড়ে ফেলে দিলেও অর্দ্ধেক কাজ হয়! বলিয়া নিজের রসিকতায় প্রফুল্ল হইয়া অট্টহাস্যে ঘর কাঁপাইয়া তুলিল।

বিজয়া বুঝিল, সে দয়ালের কাছে সমস্ত শুনিয়াই তবে আজ ব্যঙ্গ করিতে আসিয়াছে। তাই এই অসঙ্গত উচ্চহাস্যে মনে মনে রাগ করিয়া ঠোকর দিয়া বলিল, ওঃ—তাই বুঝি বাকি অর্দ্ধেকটা সারাবার জন্যে দয়া ক'রে আবার ওষুধ লিখে দিতে এসেছেন?

খোঁচা খাইয়া নরেনের হাসি থামিল। কহিল, বাস্তবিক বল্‌চি, এ এক আচ্ছা তামাসা।

বিজয়া কহিল, তাই বুঝি এত খুসি হয়েছেন ?

নরেনের মুখ গম্ভীর হইল। কহিল, খুসি হয়েচি ? একেবারে না। অবশ্য এ কথা একেবারে অস্বীকার করতে পারি নে যে, শুনেই প্রথমে একটু আমোদ বোধ হয়েছিল ; কিন্তু তার পরেই বাস্তবিক দুঃখিত হয়েচি। বিলাসবাবুর মেজাজটা তেমন ভাল না সত্যি—অকারণে খামকা রেগে উঠে পরকে অপমান ক'রে বসেন, কিন্তু তাই ব'লে আপনিও যে অসহিষ্ণু হয়ে কতকগুলো অপমানের কথা ব'লে ফেল্‌বেন, সেও ত ভাল নয়। ভেবে দেখুন দিকি, কথাটা প্রকাশ পেলে ভবিষ্যতে কত বড় একটা লজ্জা এবং ক্ষোভের কারণ হবে। আমাকে বিশ্বাস করুন, বাস্তবিকই শুনে আমি অত্যন্ত দুঃখিত হয়েচি। আমার জন্যে আপনাদের মধ্যে এরূপ একটা অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটায়—

এই লোকটির হৃদয়ের পবিত্রতায় বিজয়া মনে মনে মুগ্ধ হইয়া গেল। তথাপি পরিহাসের ভঙ্গীতে কহিল, কিন্তু হাসিও যে চাপতে পাচ্ছেন না। বলিয়া নিজেও হাসিয়া ফেলিল।

নরেন জোর করিয়া এবার ভয়ানক গম্ভীর হইয়া কহিল, কেন আপনি বার বার তাই মনে করচেন ? যথার্থই আমি অতিশয় ক্ষুণ্ণ হয়েচি। কিন্তু তখন আমি আপনাদের সম্বন্ধে কিছুই জানতাম না। একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া পুনরায় কহিল, সেই দিনই নিচে তাঁর বাবা সমস্ত কথা জানিয়ে বল্‌লেন, ঈর্ষা ! দয়ালবাবুও কাল তাই বল্‌লেন। শুনে আমি কি যে লজ্জা পেয়েচি, বল্‌তে পারি নে। কিন্তু এত লোকের মধ্যে আমাকে ঈর্ষা করবার মত কি আমার আছে, আমি তাও ত ভেবে পাই নে। আ[পনা]রা ব্রাহ্ম-সমাজের, আবশ্যক হ'লে সকলের সঙ্গেই কথা কন— অ ভা...নারা ... ...ার সঙ্গেও কয়েছেন। এতে এমনি কি দোষ তিনি দেখতে পেয়েছেন, ত ...মি ত আজও খুঁজে পাই নে। যাই হোক্‌, আমাকে আপনারা মাপ

করবেন—আর ওই বাঙালায় কি বলে—অভি—অভিনন্দন! আমিও আপনাকে তাই জানিয়ে যাচ্ছি, আপনারা সুখী হোন্।

সে নিজের আচরণের উল্লেখ করিতে গিয়াও যে বিজয়ার সেদিনের আচরণ সম্বন্ধে লেশমাত্র ইঙ্গিত করে নাই, বিজয়া তাহা লক্ষ্য করিয়াছিল; কিন্তু তাহার শেষ কথাটায় বিজয়ার দুই চক্ষু অকস্মাৎ অশ্রুপ্লাবিত হইয়া গেল। সে ঘাড় ফিরাইয়া কোনমতে চোখের জল সামলাইতে লাগিল।

প্রত্যুত্তরের জন্য অপেক্ষা না করিয়াই নরেন জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা, সেদিন কালিপদকে দিয়ে হঠাৎ ষ্টেশনে মাইক্রস্কোপটা পাঠিয়ে ছিলেন কেন, বলুন ত?

বিজয়া রুদ্ধস্বর পরিষ্কার করিয়া লইয়া কহিল, আপনার জিনিস আপনি নিজেই ত ফিরে চেয়েছিলেন।

নরেন বলিল, তা বটে; কিন্তু দামের কথাটা ত তাকে দিয়ে ব'লে পাঠান নি? তা হ'লে ত আমার—

বিজয়া কহিল, না। জ্বরের ওপর আমার ভুল হয়েছিল। কিন্তু সেই ভুলের শাস্তিও ত আপনি আমাকে কম দেন নি!

নরেন লজ্জিত হইয়া কহিল, কিন্তু কালিপদ যে বললে—

বিজয়া বাধা দিয়া বলিল, সে আমি শুনেচি। কিন্তু যাই কেন না সে বলুক, আপনাকে উপহার দেবার মত স্পর্দ্ধা আমার থাকতে পা[illegible]রে—এমন কথা কি ক'রে আপনি বিশ্বাস করলেন? আর সত্যিই তাই যা[illegible]দি ক'রে থাকি নিজের হাতে কেন শাস্তি দিলেন না? কেন চাকরকে দিয়ে [illegible] আমার অপমান করলেন? আপনার আমি কি করেছিলুম? বলিতে বলি[illegible]তেই তাহার গলা যেন ভাঙিয়া আসিল।

নরেন লজ্জিত এবং অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া বিজয়ার মুখের [illegible] চাহিয়া দেখিল, সে ঘাড় ফিরাইয়া জানালার বাহিরে চাহিয়া আ[illegible]

মুখ তাহার চোখে পড়িল না, চোখে পড়িল শুধু তাহার গ্রীবার উপর হীরার কণ্ঠির একটুখানি—দীপালোকে বিচিত্র রশ্মি প্রতিফলিত করিতেছে। উভয়েই কিছুক্ষণ মৌন থাকার পর নরেন ক্ষুণ্ণকণ্ঠে ধীরে ধীরে কহিল, কাজটা যে আমার ভাল হয় নি সে আমি তখনি টের পেয়েছিলাম, কিন্তু ট্রেণ তখন ছেড়ে দিয়েছিল। কালিপদর দোষ কি? তার ওপর রাগ করা আমার কিছুতেই উচিত হয়নি। আবার একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, দেখুন, ঐ ঈর্ষা জিনিসটা যে কত মন্দ এবার আমি ভাল করেই টের পেয়েছি। ও যে শুধু নিজের ঝোঁকেই বেড়ে চলে তাই নয়; সংক্রামক ব্যাধির মত অপরকেও আক্রমণ করতে ছাড়ে না। এখন ত আমি বেশ জানি আমাকে ঈর্ষা করার মত ভ্রম বিলাসবাবুর আর কিছু হতেই পারে না। তাঁর বাবাও সে জন্যে লজ্জা এবং দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন কিন্তু আপনি শুনে হয়ত আশ্চর্য্য হবেন যে, আমার নিজেরও তখন বড় কম ভুল হয় নি।

বিজয়া মুখ ফিরাইয়া প্রশ্ন করিল, আপনার ভুল কি রকম?

নরেন অত্যন্ত সহজ এবং স্বাভাবিকভাবে উত্তর দিল, আমাকে নিরর্থক ও-রকম অপমান করায় আপনি যে সত্যিই ক্লেশ বোধ করেছিলেন সে ত আপনার কথা শুনে সবাই বুঝ্‌তে পেরেছিল। তার উপর রাসবিহারীবাবু যখন নিজে গিয়ে তাঁর ছেলের ওই ঈর্ষার কথাটা তুলে আমাকে দুঃখ করতে নিষেধ করলেন তখন হঠাৎ দুঃখটা আমার যেন বেড়ে গেল। কেবলি মনে হ'তে লাগল নিশ্চয়ই কিছু কারণ আছে; নইলে শুধু শুধু কেউ কারুকে হিংসা করে না। আপনাকে আজ আমি যথার্থ বল্‌চি, তার পরে আট-দশদিন বোধ করি চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে তেইশ ঘণ্টা শুধু আপনাকেই ভাবতুম। আর আপনার অসুখের সেই কথাগুলোই মনে পড়ত। তাই ত বল্‌ছিলুম—এ কি ভয়ানক ছোঁয়াচে রোগ। কাজকর্ম্ম চুলোয় গেল—

দিবারাত্রি আপনার কথাই শুধু মনের মধ্যে ঘুরে বেড়ায়। এর কি আবশ্যক ছিল বলুন ত! আর শুধু কি তাই? দু-তিনদিন এই পথে অনর্থক হেঁটে গেছি কেবল আপনাকে দেখবার জন্যে। দিন-কতক সে এক আচ্ছা পাগলা ভূত আমার ঘাড়ে চেপেছিল! বলিয়া সে হাসিতে লাগিল।

বিজয়া মুখ ফিরাইয়া চাহিল না, একটা কথার জবাব দিল না, নীরবে উঠিয়া পাশের দরজা দিয়া বাটীর ভিতরে চলিয়া গেল; আর একজনের মুখের হাসি চক্ষের পলকে নিবিয়া গেল। যে পথে সে বাহির হইয়া গেল সেই অন্ধকারের মধ্যে নির্নিমিষে চাহিয়া নরেন হতবুদ্ধি হইয়া শুধু ভাবিতে লাগিল, না জানিয়া এ আবার কোন্ নূতন অপরাধের সে সৃষ্টি করিয়া বসিল!

সুতরাং বেহারা আসিয়া যখন কহিল, আপনি যাবেন না, আপনার চা তৈরী হচ্চে—তখন নরেন ব্যস্ত হইয়াই বলিয়া উঠিল, আমার চা দরকার নেই ত!

কিন্তু মা আপনাকে বস্‌তে ব'লে দিলেন। বলিয়া বেহারা চলিয়া গেল। ইহাও নরেনকে কম আশ্চর্য্য করিল না।

প্রায় মিনিট্‌-পনের পরে চাকরের হাতে চা এবং নিজের হাতে জলখাবারের থালা লইয়া বিজয়া প্রবেশ করিল। সে যে সহস্র চেষ্টা করিয়াও তাহার মুখের উপর হইতে রোদনের ছায়া মুছিয়া ফেলিতে পারে নাই তাহা অস্পষ্ট দীপালোকে হয় ত আর কাহারও চোখে ধরা পড়িত না—কিন্তু ডাক্তারের অভ্যস্ত চক্ষুকে সে ফাঁকি দিতে পারিল না, কিন্তু এবার আর সে সহসা কোন মন্তব্য প্রকাশ করিয়া বসিল না। অল্প কিছুদিনের মধ্যে সে অনেক বিষয়েই সতর্ক হইতে শিখিয়াছিল। যেদিন প্রায় অপরিচিত হইয়াও সে অন্তরের সামান্য কৌতূহল ও ইচ্ছার চাঞ্চল্য দমন করিতে না পারিয়া হাত দিয়া বিজয়ার মুখ তুলিয়া ধরিয়া ছিল, আজ আর তাহার সে দিন ছিল না। তাই সে চুপ করিয়াই রহিল।

চাকর টেবিলের উপর চা রাখিয়া দিয়া চলিয়া গেল। বিজয়া তাহারই পাশে খাবারের থালা রাখিয়া দিয়া নিজের জায়গায় গিয়া বসিল। নরেন তৎক্ষণাৎ থালাটা কাছে টানিয়া লইয়া এমনিভাবে আহারে মন দিল যেন এই জন্যই সে প্রতীক্ষা করিতেছিল।

মিনিট্ পাঁচ-ছয় নিঃশব্দে কাটিবার পরে বিজয়াই প্রথমে কথা কহিল। নীরবতার গোপন ভার আর সে সহিতে না পারিয়া হঠাৎ যেন জোর করিয়াই হাসিয়া বলিল, কই, আপনার সেই পাগলা ভূতটার কথা শেষ কর্‌লেন না?

নরেন বোধ করি অন্য কথা ভাবিতেছিল, তাই সে মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কার কথা বল্‌চেন?

বিজয়া কহিল, সেই পাগলা ভূতটা, যে দিন-কতক আপনার কাঁধে চেপেছিল—সে নেমে গেছে ত?

এবার নরেনও হাসিয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিল, হাঁ গেছে।

বিজয়া কহিল, যাক্! তা হ'লে বেঁচে গেছেন বলুন। নইলে আরও কত দিন যে আপনাকে ঘোড়দৌড় করিয়ে নিয়ে বেড়াত কে জানে!

নরেন চায়ের পেয়ালাটা মুখে তুলিয়া লইয়া শুধু বলিল, হাঁ।

বিজয়া পুনরায় ভাল কিছু একটা বলিতে চাহিল বটে, কিন্তু হঠাৎ আর কথা খুঁজিয়া না পাইয়া কেবল আকণ্ঠ উচ্ছ্বসিত দীর্ঘশ্বাস চাপিয়া লইয়া চুপ করিয়া গেল। পরের ঘাড়ের ভূত ছাড়ার আনন্দের জের টানিয়া চলা কিছুতেই আর তাহার শক্তিতে কুলাইল না।

আবার কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত সমস্ত ঘরটা স্তব্ধ হইয়া রহিল। নরেন ধীরে-সুস্থে চায়ের বাটিটা নিঃশেষ করিয়া টেবিলের উপর রাখিয়া দিল; পকেট হইতে ঘড়ি বাহির করিয়া বলিল; আর দশ মিনিট্ সময় আছে, আমি চল্‌লুম।

বিজয়া মৃদুস্বরে প্রশ্ন করিল, কল্‌কাতায় ফিরে যাবার এই বুঝি শেষ ট্রেন?

নরেন উঠিয়া দাঁড়াইয়া টুপিটা মাথায় দিয়া বলিল, আরও একটা আছে বটে, সে কিন্তু ঘণ্টা-দেড়েক পরে। চল্‌লুম—নমস্কার। বলিয়া লাঠিটা তুলিয়া একটু দ্রুত-পদেই ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

বিলাস যথাসময়ে কাছারীতে আসিয়া নিজের কাজ করিয়া বাড়ি চলিয়া যাইত; নিতান্ত প্রয়োজন হইলে কর্ম্মচারী পাঠাইয়া বিজয়ার মত লইত কিন্তু আপনি আসিত না। তাহাকে ডাকাইয়া না পাঠাইলে সে নিজে যাচিয়া আসিবে না ইহাও বিজয়া বুঝিয়াছিল। অথচ তাহার আচরণের মধ্যে অনুতাপ এবং আহত অভিমানের বেদনা ভিন্ন ক্রোধের জ্বালা প্রকাশ পাইত না বলিয়া বিজয়ার নিজেরও রাগ পড়িয়া গিয়াছিল। বরঞ্চ আপনার ব্যবহারের মধ্যেই কেমন যেন একটা নাটক অভিনয়ের আভাস অনুভব করিয়া তাহার মাঝে মাঝে ভারি লজ্জা করিত। প্রায়ই মনে হইত, কত লোকেই না জানি এই লইয়া হাসি-তামাসা করিতেছে। তা ছাড়া যে লোক সকলের চক্ষেই এতদিন সর্ব্বময় হইয়া বিরাজ করিতেছিল, বিশেষ করিয়া জমিদারীর কাজে অকাজে সে যাহাদিগকে শাসন করিয়া শত্রু করিয়া তুলিয়াছে তাহাদের সকলের কাছে তাহাকে অকস্মাৎ এতখানি ছোট করিয়া দিয়া বিজয়া আপনার নিভৃত হৃদয়ে সত্যকার ব্যথা অনুভব করিতেছিল। পূর্ব্বের অবস্থাকে ফিরাইয়া না আনিয়া শুধু এই ঘটনাকে কোন মতে সে যদি সম্পূর্ণ না করিয়া দিতে পারিত তাহা হইলে বাঁচিয়া যাইত। এম্‌নি যখন তাহার মনের ভাব সেই সময়ে হঠাৎ একদিন বিকালে কাছারীর বেহারা আসিয়া শুনাইল, বিলাসবাবু দেখা করতে চান।

ব্যাপারটা একেবারে নূতন। বিজয়া চিঠি লিখিতেছিল; মুখ না তুলিয়াই কহিল, আস্‌তে বল। তাহার মনের ভিতরটা অজ্ঞাত আশঙ্কায় দুলিতে লাগিল; কিন্তু বিলাস প্রবেশ করিতেই সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া শান্তভাবে নমস্কার করিয়া কহিল, আসুন। বিলাস আসন গ্রহণ করিয়া বলিল, কাজের ভিড়ে আস্‌তে পারি নে, তোমার শরীর ভাল আছে?

বিজয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিল, হাঁ।

সেই ওষুধটাই চল্‌চে?

বিজয়া ইহার উত্তর দিল না, কিন্তু বিলাসও প্রশ্নের পুনরুক্তি না করিয়া অন্য কথা কহিল। বলিল, কাল নববৎসরের নূতন দিন—আমার ইচ্ছা হয় সকলকে একত্র ক'রে কাল সকাল-বেলা একটু ভগবানের নাম করা হয়।

সে যে তাহার প্রশ্ন লইয়া পীড়াপীড়ি করিল না কেবল ইহাতেই বিজয়ার মনের উপর হইতে একটা ভার নামিয়া গেল। সে খুসি হইয়া বলিয়া উঠিল, এ ত খুব ভাল কথা।

বিলাস বলিল, কিন্তু নানা কারণে মন্দিরে যাওয়ার সুবিধে হ'ল না। যদি তোমার অমত না হয় ত আমি বলি এইখানেই—

বিজয়া তৎক্ষণাৎ সম্মত হইয়া সায় দিল, এমন কি, উৎসাহিত হইয়া উঠিল। কহিল, তা হ'লে ঘরটাকে একটুখানি ফুল-পাতা-লতা দিয়ে সাজালে ভাল হয় না? আপনাদের বাড়িতে ত ফুলের অভাব নেই—যদি মালীকে হুকুম দিয়ে কাল ভোর থাকতেই—কি বলেন? হ'তে পারে না কি?

বিলাস বিশেষ কোন প্রকার আনন্দের আড়ম্বর না দেখাইয়া সহজ-ভাবে বলিল, বেশ, তাই হবে। আমি সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক ক'রে দেব।

বিজয়া ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া বলিল, কাল ত বৎসরের প্রথম দিন। আচ্ছা, আমি বলি কি অমনি একটু খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন করলে কি—

বিলাস এ প্রস্তাবও অনুমোদন করিল এবং উপাসনার পরে জল-

যোগের আয়োজন যাহাতে ভাল রকম হয় সে বিষয়েও নায়েবকে হুকুম দিয়া যাইবে জানাইল। আরও দুই-চারিটা সাধারণ কথাবার্ত্তার পরে সে বিদায় গ্রহণ করিলে বহুদিনের পরে বিজয়ার অন্তরের মধ্যে তৃপ্তি ও উল্লাসের দক্ষিণা-বাতাস দিতে লাগিল। সেদিনকার সেই প্রকাশ্য সংঘর্ষের পর হইতে অব্যক্ত গ্লানির আকারে যে বস্তুটি তাহাকে অনুক্ষণ দুঃখ দিতেছিল তাহার ভার যে কত ছিল আজ নিষ্কৃতি পাইয়া সে যেমন অনুভব করিল এমন বোধ করি কোন দিন করে নাই! তাই আজ তাহার ব্যথার সহিত মনে হইতে লাগিল, এই কয়েকদিনের মধ্যেই বিলাস পূর্ব্বেকার অপেক্ষা যেন অনেকটা রোগা হইয়া গিয়াছে। অপমান ও অনুশোচনার আঘাত ইহার প্রকৃতিকে যে পরিবর্ত্তিত করিয়া দিয়াছে তাহা চোখের উপর সুস্পষ্ট দেখিতে পাইয়া অজ্ঞাতসারে বিজয়ার দীর্ঘশ্বাস পড়িল, এবং বৃদ্ধ রাসবিহারীর সেদিনের কথাগুলি চুপ করিয়া বসিয়া মনে মনে আলোচনা করিতে লাগিল। বিলাসবিহারী তাহাকে যে অত্যন্ত ভালবাসে তাহা ভাষায়, ইঙ্গিতে, ভঙ্গীতে সর্ব্বপ্রকারেই ব্যক্ত করা হইয়াছে, অথচ একটা দিনের জন্যও সঙ্গোপনে এই ভালবাসার কথা বিজয়ার মনে স্থান পায় না। বরঞ্চ সন্ধ্যার ঘনীভূত অন্ধকারে একাকী ঘরের মধ্যে সঙ্গ-বিহীন প্রাণটা যখন ব্যাকুল হইয়া উঠে তখন কল্পনার নিঃশব্দ-পদসঞ্চারে ধীরে ধীরে যে আসিয়া তাহার পাশে বসে সে বিলাস নয় আর একজন। অলস মধ্যাহ্নে বইয়ে যখন মন বসে না, শেলাইয়ের কাজও অসহ্য বোধ হয়, প্রকাণ্ড শূন্য বাড়িটা রবিকরে খাঁ খাঁ করিতে থাকে তখন সুদূর ভবিষ্যতে একদিন এই শূন্য গৃহই পূর্ণ করিয়া যে ঘর-কন্নার স্নিগ্ধ ছবিটি তাহার অন্তরে ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠিতে থাকে তাহার মধ্যে কোথাও বিলাসের জন্য এতটুকু স্থান থাকে না। অথচ যে লোকটি সমস্ত যায়গা জুড়িয়া বসে, সংসার-যাত্রার

দুর্গম-পথে সহায় বা সহযোগী হিসাবে মূল্য তাহার বিলাসের অপেক্ষা অনেক কম। সে যেমন অপটু, তেমনি নিরুপায়। বিপদের দিনে ইহার কাছে কোন সাহায্যই মিলিবে না। তবুও এই অকেজো মানুষটারই সমস্ত অকাজের বোঝা সে নিজে সারাজীবন মাথায় লইয়া চলিতেছে মনে করিতেও বিজয়ার সমস্ত দেহ মন অপরিমিত আনন্দাবেগে থর থর করিয়া কাঁপিতে থাকে। বিলাস চলিয়া গেলে বিজয়ার এই মনোভাবের আজও যে কোন ব্যতিক্রম ঘটিল তাহা নহে, কিন্তু আজ সে বিনা প্রার্থনায় বিলাসের দোষের পুনর্ব্বিচারের ভার হাতে তুলিয়া হইল, এবং ঘটনাচক্রে তাহার স্বভাবের যে পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে, বাস্তবিক স্বভাব যে তাহার অত হীন নহে, কাহারও সহিত কোন তর্ক না করিয়া সে আপনা-আপনি তাহা মানিয়া লইল। এমন কি, নিরতিশয় উদারতার সহিত ইহাও আজ সে আপনার কাছে গোপন করিল না যে, বিলাসের মত মানসিক অবস্থায় পড়িয়া জগতের অধিকাংশ লোকই হয় ত ভিন্নরূপ আচরণ দেখাইতে পারিত না। সে যে ভালবাসিয়াছে এবং ভালবাসার অপরাধই তাহাকে লাঞ্ছিত এবং দণ্ডিত করিয়াছে ইহাই বার বার স্মরণ করিয়া আজ সে করুণা-মিশ্রিত মমতার সহিত তাহাকে মার্জ্জনা করিল।

সকালে উঠিয়া শুনিল, বিলাস বহু পূর্ব্বেই লোকজন লইয়া ঘর-সাজানোর কাজে লাগিয়া গিয়াছে। তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হইয়া নিচে নামিয়া আসিয়া লজ্জিতভাবে কহিল, আমাকে ডেকে পাঠান নি কেন?

বিলাস স্নিগ্ধস্বরে বলিল, দরকার কি!

বিজয়া একটু হাসিয়া প্রসন্নমুখে জবাব দিল, আমি বুঝি এতই অকর্ম্মণ্য যে এদিকেও কিছু সাহায্য করতে পারি নে? আচ্ছা, এখন বলুন আমি কি করব?

অনেক দিনের পর বিলাস আজ হাসিল, কহিল, তুমি শুধু নজর রেখো আমাদের কাজে ভুল হচ্ছে কি না।

আচ্ছা, বলিয়া বিজয়া হাসিমুখে একটা কোচের উপর গিয়া বসিল। খানিক পরেই প্রশ্ন করিল, খাবার বন্দোবস্ত ?

বিলাস ফিরিয়া চাহিয়া বলিল, সমস্ত ঠিক হচ্চে—কোন চিন্তা নেই।

আচ্ছা, আমি কেন সেই দিকেই যাই নে ?

বেশ ত। বলিয়া বিলাস পুনরায় কাজে মন দিল।

বেলা আটটার মধ্যেই সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ হইয়া গেল। ইতিমধ্যে বিজয়া অনেকবার আনাগোনা করিয়া অনেক ছোট-খাট ব্যাপারে বিলাসের পরামর্শ লইয়া গিয়াছে—কোথাও বাধে নাই। না জানিয়া কখন্ যে সঞ্চিত বিরোধের গ্লানি উভয়ের কাটিয়া কথাবার্ত্তার পথ এমন সহজ ও সুগম হইয়া গিয়াছিল দুইজনের কেহই বোধ করি খেয়াল করে নাই।

বিজয়া হাসিয়া বলিল, আমাকে একবারে অপদার্থ মনে ক'রে বাদ দিলেন কিন্তু আমিও আপনার একটা ভুল ধরেচি তা বল্‌চি।

বিলাস একটু আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, অপদার্থ একবারও মনে করি নি, কিন্তু ভুল কি রকম ?

বিজয়া বলিল, আমরা আছি ত মোটে চার-পাঁচজন, কিন্তু খাবারের আয়োজন হয়ে পড়েচে প্রায় কুড়ি জনের তা জানেন ?

বিলাস কহিল, সে ত বটেই! বাবা তাঁর কয়েকজন বন্ধু-বান্ধবকে নিমন্ত্রণ করেছেন। তাঁরা কজন, কে কে আস্‌বেন, তা ত ঠিক জানি নে।

বিজয়া ভয়ানক বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিল, কৈ, সে ত আমাকে বলেন নি ?

বিলাস নিজেও বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, এখান থেকে কাল আমি যাবার পরে বাবা তোমাকে চিঠি লিখে জানান নি ?

না।

কিন্তু তিনি যে স্পষ্ট বল্‌লেন—বিলাস থমকিয়া গেল।

বিজয়া প্রশ্ন করিল, কি বল্‌লেন ?

বিলাস ক্ষণকাল স্থির থাকিয়া কহিল, হয় ত আমারই শোন্‌বার ভুল হয়েছে। তিনি চিঠি লিখে জানাবেন ব'লে বোধ করি ভুলে গেছেন।

বিজয়া আর কোন প্রশ্ন করিল না; কিন্তু তাহার মনের ভিতর জ্যোৎস্নার প্রসন্নতা সহসা যেন মেঘে ঢাকিয়া গেল্।

আধ ঘণ্টা পরে রাসবিহারী স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং বেলা নয়টার মধ্যেই তাঁহার নিমন্ত্রিত বন্ধুর দল একে একে দেখা দিতে লাগিলেন। ইঁহাদের সকলেই ব্রাহ্ম-সমাজের নহেন, সম্ভবতঃ তাঁহারা রাসবিহারীর সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

রাসবিহারী সকলকেই পরম সমাদরে গ্রহণ করিলেন, এবং বিজয়ার সহিত যাঁহাদের সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল না তাঁহাদের পরিচিত করাইতে গিয়া অচির-ভবিষ্যতে এই মেয়েটির সহিত নিজের ঘনিষ্ঠ-সম্বন্ধের ইঙ্গিত করিতেও ত্রুটি করিলেন না। বিজয়া অস্ফুট কণ্ঠে অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহাদিগকে আসন গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিল। এই সকল প্রচলিত ভদ্রতারক্ষার কার্য্যে সে যখন ব্যাপৃত, তখন্ অদূরে বাগানের সঙ্কীর্ণ পথে দয়ালবাবু দেখা দিলেন। কিন্তু তিনি একা নহেন, একজন অপরিচিত তরুণী আজ তাঁহার সঙ্গে। মেয়েটি সুশ্রী, বয়স বোধ করি বিজয়ার অপেক্ষা কিছু বেশি। কাছে আসিয়া দয়াল তাহাকে আপনার ভাগ্নী বলিয়া পরিচয় দিলেন। নাম নলিনী, কলিকাতার কলেজে বি-এ পড়ে। এখনো গরমের ছুটি সুরু হয় নাই বটে, কিন্তু মামির অসুখে সেবা করিবার জন্য কিছু পূর্ব্বেই দিন-দুই হইল মামার কাছে আসিয়াছে, এবং স্থির হইয়াছে গ্রীষ্মের অবকাশটা এইখানেই কাটাইয়া যাইবে।

নলিনীকে যে বিজয়া কলিকাতায় একেবারে দেখে নাই তাহা নহে, কিন্তু আলাপ ছিল না। তথাপি এতগুলি পরিচিত ও অপরিচিত পুরুষের মধ্যে আজ সেই তাহার কাছে সকলের চেয়ে অন্তরঙ্গ বলিয়া মনে হইল। বিজয়া দুই হাত বাড়াইয়া তাহাকে গ্রহণ করিয়া ঘরের মধ্যে টানিয়া আনিল, এবং পাশে বসাইয়া ভাব করিতে আরম্ভ করিয়া দিল।

উপাসনা সাড়ে নয়টার সময় সুরু করিবার কথা। তখনো কিছু বিলম্ব ছিল বলিয়া, সকলেই বাহিরের বারান্দায় দাঁড়াইয়া আলাপ করিতেছিলেন, এমন সময়ে রাসবিহারীর উচ্চকণ্ঠ ঘরের মধ্যে হইতে শোনা গেল। তিনি অত্যন্ত আদর করিয়া কাহাকে যেন বলিতেছিলেন, এসো বাবা, এসো। তোমার কত কাজ, তুমি যে সময় ক'রে আসতে পারবে এ আমি আশা করি নি।

এই সম্মানিত কাজের ব্যক্তিটি কে জানিবার জন্য বিজয়া মুখ তুলিয়া সম্মুখেই দেখিল নরেন। কিন্তু অসম্ভব বলিয়া হঠাৎ তাহার প্রত্যয় হইল না। নলিনীও একই সঙ্গে কৌতূহলবশে মুখ তুলিয়া কহিল, নরেনবাবু।

রাসবিহারী তাঁহাকে আহ্বান করিয়াছেন, এবং সে সেই নিমন্ত্রণ রাখিতে এই বাটীতে প্রবেশ করিয়াছে। ঘটনাটা এমনি অচিন্ত্যনীয় যে বিজয়ার সমস্ত চিন্তাশক্তি পর্য্যন্ত যেন বিপর্য্যস্ত হইয়া গেল। আর সে সে-দিকে মুখ তুলিয়া চাহিতে পারিল না, কিন্তু বিলাসবিহারীর সবিনয় অভ্যর্থনা স্পষ্ট শুনিতে পাইল, এবং পরক্ষণেই উভয়কে লইয়া রাসবিহারী ঘরের মধ্যস্থলে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সঙ্গে সঙ্গে অনেকেই আসিলেন। তখন বৃদ্ধ শান্ত, গম্ভীর স্বরে এই দুটি যুবককে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, তোমাদের বাপেদের সম্পর্কে তোমরা দুজনে যে ভাই হও এই কথাটাই আজ তোমাদের আমি বিশেষ ক'রে বল্‌তে চাই বিলাস। বনমালী গেলেন, জগদীশ গেছেন, আমারও ডাক

পড়েছে। ইহজগতে আমাদের যে শুধু দেহ ব্যতীত আর কিছুই ভিন্ন ছিল না এ কথা তোমরা আজকালকার ছেলেরা হয় ত বুঝ্‌বে না—বোঝা সম্ভবও নয়—আমি বোঝাতেও চাই নে। শুধু কেবল আজ নব-বৎসরের এই পুণ্য দিনটিতে তোমাদের উভয়ের কাছে অনুরোধ কর্‌তে চাই যে তোমাদের গৃহ-বিচ্ছেদের কালি দিয়ে এই বৃদ্ধের বাকি দিন কটা আর অন্ধকার ক'রে তুলো না—তাঁহার শেষ কথাটা কাঁপিয়া উঠিয়া ঠিক যেন কান্নায় রুদ্ধ হইয়া গেল। নরেন আর সহিতে পারিল না। সে অগ্রসর হইয়া গিয়া বিলাসের একটা হাত নিজের ডান হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া আবেগের সহিত কহিল, বিলাসবাবু, আমার সকল অপরাধ আপনি মাপ করুন। আমি ক্ষমা চাইচি।

প্রত্যুত্তরে বিলাস হাত ছাড়িয়া দিয়া নরেনকে সবলে আলিঙ্গন করিয়া বলিয়া উঠিল, অপরাধ আমিই করেচি নরেন। আমাকেই তুমি ক্ষমা কর।

বৃদ্ধ রাসবিহারী মুদ্রিত-নেত্রে কম্পিত মৃদুকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, হে সর্ব্বশক্তিমান পরম পিতা পরমেশ্বর! এই দয়া, এই করুণার জন্য তোমার শ্রীপাদপদ্মে আমার কোটী কোটী নমস্কার! এই বলিয়া তিনি দুই হাত জোড় করিয়া কপালে স্পর্শ করিলেন, এবং চাদরের কোণে চক্ষু মার্জ্জনা করিয়া কহিলেন, আজিকার শুভ মুহূর্ত্ত তোমাদের উভয়ের জীবনে অক্ষয় হোক্! আপনারাও আশীর্ব্বাদ করুন! এই বলিয়া তিনি বিস্ময়-বিহ্বল অভ্যাগত ভদ্রলোকদিগের মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন।

দয়াল ভিন্ন কেহই কিছু জানিতেন না, সুতরাং এই মর্ম্মস্পর্শী করুণ অনুষ্ঠানের যথার্থ তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া ইহাদের বাস্তবিকই বিস্ময়ের পরিসীমা ছিল না। রাসবিহারী চক্ষের পলকে তাহা অনুভব করিয়া তাঁহাদের প্রতি চাহিয়া স্নিগ্ধভাবে একটু হাস্য করিয়া বলিলেন, মেয়েরা যে বলে শাঁকের করাত, আস্‌তে কাটে যেতেও কাটে

আমারও হয়েছিল তাই। আমার এ-ও ছেলে, ও-ও ছেলে—বলিয়া নরেন বিলাসকে চোখের ইঙ্গিতে দেখাইয়া কহিলেন, আমার ডান হাতেও যেমন ব্যথা বাঁ হাতেও তেমনি। কিন্তু আপনাদের কৃপায় আজ আমার বড় শুভদিন, বড় আনন্দের দিন! আমি কি আর বল্‌ব!

ভিতরের ব্যাপারটা তলাইয়া না বুঝিলেও প্রত্যুত্তরে সকলেই হর্ষ-সূচক একপ্রকার অস্ফুট ধ্বনি করিলেন।

রাসবিহারী ঘাড়টা একটুখানি মাত্র হেলাইয়া উত্তরীয়-প্রান্তে পুনরায় চক্ষু মার্জ্জনা করিয়া নিকটবর্ত্তী আসনে গিয়া নিঃশব্দে উপবেশন করিলেন। সেই স্নিগ্ধ গম্ভীর মুখের প্রতি চাহিয়া উপস্থিত কাহারও অনুমান করিতে অবশিষ্ট রহিল না যে, হৃদয় তাঁহার অনির্ব্বচনীয় ভাবরাশিতে এমনি পরিপূর্ণ হইয়া গেছে যে বাক্যের আর তিলার্দ্ধ স্থান নাই। দয়াল তাঁহার পাকা দাড়ীতে হাত বুলাইতে বুলাইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, এবং ভগবৎউপাসনার প্রারম্ভে ভূমিকাচ্ছলে বলিলেন, যেখানে বিরুদ্ধ-হৃদয় সম্মিলিত হয় তথায় ভগবানের আসন পাতা হয়। সুতরাং আজ এখানে পরম পিতার আবির্ভাব সম্বন্ধে দ্বিধা করিবার কিছু নাই।

অতঃপর তিনি নূতন বৎসরের প্রথম দিনটিতে প্রায় পোনর মিনিট ধরিয়া একটি সুন্দর উপাসনা করিলেন। তাঁহার নিজের মধ্যে অকপট বিশ্বাস ও আন্তরিক ভক্তি ছিল বলিয়া যাহা কিছু কহিলেন, সমস্তই সত্য এবং মধুর হইয়া সকলের হৃদয়ে বাজিল। সকলের চক্ষু-পল্লবেই একটা সজলতার আভাস দেখা দিল; শুধু রাসবিহারীর নিমীলিত চোখ বাহিয়া দর দর ধারে অশ্রু গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। শেষ হইয়া গেলেও একই ভাবে বসিয়া রহিলেন। তিনি অচেতন, কিংবা সচেতন বহুক্ষণ পর্য্যন্ত ইহাই বুঝিতে পারা গেল না।

আর একজন, যাহার মনের কথা টের পাওয়া গেল না—সে বিজয়া।

সারাক্ষণ সে আনত-নেত্রে পাষাণ-মূর্ত্তির মত স্থির হইয়া বসিয়া রহিল। তার পরে যখন মুখ তুলিল, তখন মুখখানা শুধু পাথরের মতই অস্বাভাবিক রূপে সাদা দেখাইল।

দয়ালের ভক্তি-গদগদ ধ্বনির প্রতিধ্বনি তখন অনেকেরই হৃদয়ের মধ্যে ঝঙ্কৃত হইতেছিল, এম্‌নি সময়ে রাসবিহারী চক্ষু মেলিলেন; এবং উঠিয়া দাঁড়াইয়া প্রায় কাঁদ কাঁদ স্বরে কহিলেন, আমার সে সাধনার বল নাই, কিন্তু দয়ালের মহাকাব্য যে কত বড় সত্য আজ তাহা উপলব্ধি করিয়াছি। সম্মিলিত হৃদয়ের সন্ধিস্থলে যে সেই একমাত্র ও অদ্বিতীয় নিরাকার পরব্রহ্মের আবির্ভাব হয়, আজ তাহা অন্তরের মধ্যে প্রত্যক্ষ দেখিয়া আমার জীবন চিরদিনের জন্য ধন্য হইয়া গেল। এই বলিয়া তিনি অগ্রসর হইয়া গিয়া দয়ালকে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া কম্পিতকণ্ঠে কহিয়া উঠিলেন, দয়াল! ভাই! এ শুধু তোমারই পুণ্যে, তোমারই আশীর্ব্বাদে।

দয়ালের চোখ ছল্ ছল্ করিয়া আসিল, কিন্তু সে কোন কথা কহিতে না পারিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল।

পাশের ঘরেই জলযোগের প্রচুর আয়োজন হইয়াছিল। এখন বিলাস সেই ইঙ্গিত করিতেই রাসবিহারী তাহাকে বাধা দিয়া অভ্যাগতগণকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, আপনাদের কাছে আজ আর একটি বিষয়ে আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করি। বনমালী বেঁচে থাকলে আজ তাঁর কন্যার বিবাহের কথা তিনিই আপনাদিগকে জানাতেন, আমাকে বল্‌তে হ'তো না; কিন্তু এখন সে ভার আমার উপরেই পড়েছে। এখন আমি বর-কন্যার পিতা। আমি এই মাসেরই শেষ সপ্তাহে পূর্ণিমা-তিথিতে বিবাহের দিন স্থির করেচি—আপনারা সর্ব্বান্তঃকরণে আশীর্ব্বাদ করুন যেন শুভকর্ম্ম নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়। এই বলিয়া তিনি একজোড়া মোটা সোনার বালা পকেট হইতে বাহির করিয়া দয়ালের হাতে দিলেন।

দয়াল সেই দুটি লইয়া বিজয়ার কাছে অগ্রসর হইয়া গিয়া হাত বাড়াইয়া বলিলেন, শুভকর্ম্মের সূচনায় কায়মনোবাক্যে তোমার কল্যাণ কামনা করি মা, হাত দুটি একবার দেখি ?

কিন্তু সেই আনতমুখী, মূর্ত্তির মত আসীনা রমণীর নিকট হইতে লেশমাত্র সাড়া আসিল না। দয়াল পুনরায় তাহার প্রার্থনা নিবেদন করিলেন ; তথাপি সে তেমনি স্থির বসিয়া রহিল। নলিনী পাশেই ছিল, সে মামার অবস্থাসঙ্কট অনুভব করিয়া হাসিয়া বিজয়ার হাত দুটি তুলিয়া ধরিল, এবং দয়াল না জানিয়া একজোড়া অত্যাচারের হাতকড়ি আশীর্ব্বাদের স্বর্ণবলয় জ্ঞানে সেই মূর্চ্ছিত-প্রায় নিরুপায় নারীর অশক্ত-অবশ দুটি হাতে একে একে পরাইয়া দিলেন।

কিন্তু কেহই কিছু জানিল না। বরঞ্চ ইহাকে মধুর লজ্জা কল্পনা করিয়া স্বাভাবিক এবং সঙ্গত ভাবিয়া তাঁহারা উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন, এবং নিমিষে শুভকামনার কল-গুঞ্জনে সমস্ত ঘরটা মুখরিত হইয়া উঠিল।

খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপার সমাধা হইয়া গেলে বেলা হইতেছিল বলিয়া সকলেই একে একে বিদায় গ্রহণ করিতে লাগিলেন। এই সময়টায় কি করিয়া যে বিজয়া আত্মসম্বরণ করিয়া অতিথিদের সম্ভ্রম এবং মর্য্যাদা রক্ষা করিল তাহা অন্তর্যামী ভিন্ন আর যে লোকটির অগোচর রহিল না সে রাসবিহারী। কিন্তু তিনি আভাস মাত্র দিলেন না। জলযোগ সমাপন করিয়া একটি লবঙ্গ মুখে দিয়া হাসিমুখে কহিলেন, মা, আমি চল্‌লুম। বুড়োমানুষ রোদ উঠ্‌লে আর হাঁটতে পার্‌ব না। বলিয়া আর একপ্রস্ত আশীর্ব্বাদ করিয়া ছাতাটি মাথায় দিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া পড়িলেন।

সবাই চলিয়া গিয়াছে। শুধু বিজয়া এবং নলিনী তখনও বাহিরের বারান্দার একধারে দাঁড়াইয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছিল। বিজয়া কহিল, আপনার সঙ্গে আলাপ হয়ে কত যে সুখী হলাম তা বল্‌তে পারি নে।

এখানে এসে পর্য্যন্ত আমি একেবারে একলা প'ড়ে গেছি—এমন কেউ নেই যে দুটো কথা বলি। আপনার যখন ইচ্ছে হবে, যখন সময় পাবেন আসবেন।

নলিনী খুসী হইয়া সম্মত হইল।

তখন বিজয়া কহিল, আমি নিজেও হয় ত ও-বেলায় আপনার মামি-মাকে দেখ্‌তে যাব। কিন্তু তখনই রৌদ্রের দিকে চাহিয়া একটু ব্যস্ত হইয়াই বলিয়া উঠিল, দয়ালবাবু নিশ্চয় কাছারীতে ঢুকেছেন, ডেকে পাঠাই, বলিয়া বেহারার সন্ধানে পা বাড়াইবার উদ্যোগ করিতেই নলিনী বাধা দিয়া বলিল, তিনি ত এখন বাড়ি যাবেন না একেবারে সন্ধ্যাবেলায় ফিরবেন।

বিজয়া লজ্জিত হইয়া বলিল, এ কথা আমাকে আগে বলেন নি কেন? আমি দরওয়ান্‌কে ডেকে দিচ্চি সে আপনার—

নলিনী কহিল, না, দরওয়ানের দরকার নেই আমি নরেনবাবুর জন্যে অপেক্ষা কর্‌ছি। তিনি তাঁর মামার সঙ্গে একবার দেখা কর্‌তে গেলেন, এখুনি এসে পড়্‌বেন।

বিজয়া অতিশয় আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনার সঙ্গে কি তাঁর পরিচয় ছিল? কৈ আমি ত এ কথা জানতুম না।

নলিনী কহিল, পরিচয় কিছুই ছিল না। শুধু পরশুদিন মামার চিঠি পেয়ে ষ্টেশনে এসে দেখি তিনি দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর সঙ্গেই এখানে এসেছি।

বিজয়া বলিল, ওঃ—তাই বুঝি?

নলিনী কহিল, হাঁ। কিন্তু কি চমৎকার লোক দেখেছেন! দুদিনেই যেন কত দিনের আত্মীয় হয়ে দাঁড়িয়েছেন; এ-বেলায় আমাদের ওখানেই উনি স্নানাহার ক'রে বিকেল-বেলা কলকাতায় যাবেন স্থির হয়েছে। আমার মামিমা ত ওঁকে একেবারে ছেলের মত ভালবাসেন।

বিজয়া ঘাড় নাড়িয়া শুধু কহিল, হাঁ চমৎকার লোক।

নলিনী কহিতে লাগিল, ওঁর সঙ্গে যে কারও কখনো মনোমালিন্য ঘটতে পারে এ আমি চোখে না দেখ্‌লে হয় ত বিশ্বাস কর্‌তেই পার্‌তুম না। আমি বড় খুসি হয়েছি যে আজ বিলাসবাবুর সঙ্গে তাঁর মিল হয়ে গেল। কিন্তু কি চমৎকার লোক ওঁর বাবা। আমার মনে হয়, আমাদের সমাজে সকলেরই ওঁর মত হবার চেষ্টা করা উচিত। রাসবিহারীবাবুর আদর্শ যেদিন ব্রাহ্ম-সমাজের ঘরে ঘরে প্রতিষ্ঠিত হবে সেই দিনই বুঝ্‌ব আমাদের ব্রাহ্মধর্ম্ম সফল হ'ল, সার্থক হ'ল! কি বলেন? ঠিক নয়?

অদূরে দেখা গেল, নরেন টুপিটা হাতে লইয়া দ্রুতবেগে এই দিকে আসিতেছে। বিজয়া নলিনীর প্রশ্নের উত্তরটা এড়াইয়া গিয়া শুধু সেই দিকে তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া কহিল, ঐ যে উনি আস্‌চেন।

নরেন কাছে আসিয়া বিজয়াকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, এই যে, এরই মধ্যে দুজনের দিব্যি ভাব হয়ে গেছে। বাস্তবিক আজ বছরের প্রথম দিনটায় আমার ভারি সুপ্রভাত! সকালটা চমৎকার কাটল। দেখে আশা হচ্ছে এ বছরটা হয় ত ভালই কাটবে। কিন্তু আপনাকে অমন শুকনো দেখাচ্চে কেন বলুন ত?

বিজয়া উত্যক্ত স্বরে কহিল, একদিনের মধ্যে ও প্রশ্ন কতবার করা দরকার বলুন ত?

নরেন হাসিয়া বলিল, আরও একবার জিজ্ঞাসা করেছি? না, তা হ'লই বা। আচ্ছা, খপ্‌ ক'রে অমন রেগে যান কেন বলুন দেখি? ওটা ত আপনার ভারি দোষ। বলিয়া হাসিতে লাগিল।

বিজয়া নিজেও কোন মতে হাসি চাপিয়া ছদ্ম গাম্ভীর্য্যের সহিত জবাব দিল, ও বিষয়ে সবাই কি আপনার মত নির্দ্দোষ হ'তে পারে? তবুও দেখুন, কালিপদর মত এমনও সব নিন্দুক আছে যারা আপনার মত সাধুকেও বদ্‌-রাগী ব'লে অপবাদ দেয়।

কালিপদর নামে নরেন উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল। হাসি থামিলে কহিল, আপনি ভয়ানক অভিমানী, কিছুতেই কারও দোষ মার্জ্জনা করতে পারেন না। 'এমন সব'এর সবটা কারা শুনি? কালিপদ আর আপনি নিজে, এই ত?

বিজয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিল, আর ষ্টেশনে যারা দেখেছে তারাও।

নরেন কহিল, আর?

বিজয়া কহিল, আর যারা যারা শুনেছে তারাও।

নরেন কহিল, তা হ'লে আমার সম্বন্ধে রাজ্যশুদ্ধ লোকেরই এই মত বলুন?

বিজয়া পূর্ব্বের গাম্ভীর্য্য বজায় রাখিয়াই জবাব দিল, হাঁ। আমাদের সকলের মতই এই।

নরেন কহিল, তা হ'লে ধন্যবাদ। এইবার আপনার নিজের সম্বন্ধে সকলের মত কি সেইটে বলুন। বলিয়া হাসিতে লাগিল।

তাহার ইঙ্গিতে বিজয়ার মুখ পলকের জন্য রাঙা হইয়া উঠিল। কিন্তু পরক্ষণেই হাসিয়া কহিল, নিজের সুখ্যাতি নিজে করতে নেই—পাপ হয়। সেটা বরঞ্চ আপনি বলুন। কিন্তু এখন নয় নাওয়া-খাওয়ার পরে। বলিয়া একটু থামিয়া কহিল, কিন্তু অনেক বেলা হয়ে গেছে—এ কাজটা এখানেই সেরে নিলে ভাল হ'তো না। বলিয়া সে নলিনীর মুখের প্রতি চাহিল।

নলিনী কহিল, কিন্তু মামিমা যে অপেক্ষা ক'রে থাকবেন।

বিজয়া কহিল, আমি এখ্খুনি লোক পাঠিয়ে খবর দিচ্ছি।

নলিনী কুণ্ঠিত হইয়া উঠিল। কহিল, আমাকে যেতেই হবে। মামিম রোগামানুষ, বাড়িতে সমস্ত দুপুর-বেলাটা কেউ কাছে না থাকলে চলবে না।

কথাটা সত্য, তাই সে আর জিদ্ করিতে পারিল না; কিন্তু তাহা মুখের প্রতি চাহিয়া কি ভাবিয়া নলিনী তৎক্ষণাৎ কহিয়া উঠিল, কি

আপনি না হয় এখানেই স্নানাহার করুন নরেনবাবু, আমি গিয়ে মামিমাকে জানাব। শুধু যাবার সময় একবার তাঁকে দেখা দিয়ে যাবেন।

আর আমাকে এমনি অকৃতজ্ঞ নরাধম পেয়েছেন যে, এই রোদের মধ্যে আপনাকে একলা ছেড়ে দেব? বলিয়া নরেন সহাস্যে বিজয়ার মুখের পানে চোখ তুলিয়া কহিল, আপনার কাছে একদিন ত ভাল রকম খাওয়া পাওনা আছেই—সেদিন না হয় সকাল সকাল এসে এই খাওয়াটার শোধ তোলবার চেষ্টা করব। আচ্ছা নমস্কার। নলিনীকে কহিল, আর দেরি নয় চলুন। বলিয়া হাতের টুপিটা মাথায় তুলিয়া দিল।

নলিনী নামিয়া কাছে আসিল, কিন্তু আর একজন যে কাঠের মত দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার দুই চক্ষে যে শান-দেওয়া ছুরির আলো ঝলসিতে লাগিল, তাহা দুজনের কেহই লক্ষ্য করিল না; করিলে বোধ করি নরেন দুই-এক পা অগ্রসর হইয়াই সহসা ফিরিয়া দাঁড়াইয়া হাসিয়া বলিতে সাহস করিত না—আচ্ছা, একটা কাজ করলে হয় না? যে জিনিসটি সুরু থেকেই এত দুঃখের মূল, যার জন্যে আমার দেশময় অখ্যাতি আমাকেই কেন সেটা আজকের আনন্দের দিনে বক্‌শিস্ ক'রে দিন না? সেই দুশো টাকাটা কাল-পরশু যেদিন হয় পাঠিয়ে দেব। বলিয়া আরও একবার হাসিবার চেষ্টা করিল বটে, কিন্তু উৎসাহের অভাবে সুবিধা হইল না। বরঞ্চ ও-পক্ষ হইতে প্রত্যুত্তরে একেবারে অপ্রত্যাশিত কড়া জবাব আসিল। বিজয়া কহিল, দাম নিয়ে দেওয়াকে আমি উপহার দেওয়া বলি নে, বিক্রী করা বলি। ও-রকম উপহার দিয়ে আপনি আত্মপ্রসাদ লাভ করতে পারেন কিন্তু আমাদের শিক্ষা আর এক রকম হয়েছিল! তাই আজ আনন্দের দিনে সেটা বেচ্‌তে ইচ্ছে করি নে।

এই আঘাতের কঠোরতায় নরেন স্তম্ভিত হইয়া গেল। এম্‌নিই ত সে বিজয়ার মেজাজের প্রায়ই কোন কূল-কিনারা পায় না—তাহাতে আজ

তাহার বুকের মধ্যে যে তুঁষের আগুন জ্বলিতেছিল তাহার দাহ যখন অকস্মাৎ অকারণে বাহির হইয়া পড়িল তখন নরেন তাহাকে চিনিয়া লইতে পারিল না। সে ক্ষণকাল তাহার কঠিন মুখের পানে নিঃশব্দে চাহিয়া থাকিয়া অত্যন্ত ব্যথার সহিত বলিল, আমার একান্ত দীন অবস্থা আমি ভুলেও যাই নি, গোপন করবার চেষ্টাও করি নি যে আমাকে মনে করিয়ে দিচ্ছেন।

নলিনীকে দেখাইয়া কহিল, আমি এঁকেও আমার সমস্ত ইতিহাস বলেছি। বাবা অনেক দুঃখ-কষ্ট পেয়ে মারা গেছেন। তাঁর মৃত্যুর পরে বাড়ি-ঘর-দ্বার যা কিছু এখানে ছিল সর্ব্বস্ব দেনার দায়ে বিক্রী হয়ে গেছে, কিছুই কারো কাছে লুকোই নি। উপহার দিয়েছি এ কথা বলি নি। আচ্ছা বলুন ত এ সব আপনাকে জানাই নি?

নলিনী সলজ্জে সায় দিয়া কহিল, হাঁ।

বিজয়ার মুখ বেদনায়, লজ্জায়, ক্ষোভে বিবর্ণ হইয়া উঠিল—সে শুধু বিহ্বল আচ্ছন্নের মত একদৃষ্টে উভয়ের দিকে নীরবে চাহিয়া রহিল।

তাহার সেই অপরিসীম বেদনাকে বিমথিত করিয়া নরেন ম্লানমুখে পুনশ্চ কহিল, আমার কথায় আপনি প্রায়ই অত্যন্ত উত্যক্ত হয়ে উঠেন। হয় ত ভাবেন নিজের অবস্থাকে ডিঙিয়ে আমি নিজেকে আপনাদের সমান এবং সমকক্ষ ব'লে প্রচার কর্‌তে চাই—হ'তেও পারে সব কথায় আপনার ওজন ঠিক রাখ্‌তে পারি নে; কিন্তু সে আমার অন্যমনস্ক স্বভাবের দোষে; কিন্তু যাক্, অসম্ভ্রম যদি ক'রে থাকি আমাকে মাপ করবেন। বলিয়া মুখ ফিরাইয়া চলিতে আরম্ভ করিয়া দিল।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

সমস্ত পথটার মধ্যে দুজনের শুধু এই কথাটা হইল। নলিনী জিজ্ঞাসা করিল, কি উপহার দেবার কথা বল্‌ছিলেন ?

নরেন ক্লান্তকণ্ঠে কহিল, আর একদিন এ কথা আপনাকে বল্‌ব—কিন্তু আজ নয়।

সেই বাঁশের পুলটার কাছে আসিয়া নরেন সহসা দাঁড়াইয়া পড়িয়া কহিল, আজ আমাকে মাপ কর্‌তে হবে—আমি ফিরে চল্‌লুম। কিন্তু নলিনীকে বিস্ময়ে অভিভূতপ্রায় দেখিয়া পুনরায় বলিল, এইভাবে হঠাৎ ফিরে যাওয়ায় আমার অন্যায় যে কি পর্য্যন্ত হচ্চে সে আমি জানি। কিন্তু তবুও ক্ষমা কর্‌তে হবে—আজ আমি কোন মতে যেতে পার্‌ব না। আপনার মামিমাকে বলে দেবেন আমি আর এক দিন এসে—

তাহার সঙ্কল্পের এই অকস্মাৎ পরিবর্ত্তনে নলিনী যত আশ্চর্য্য হইয়াছিল, এখন তাহার কণ্ঠস্বর ও মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ঢের বেশি আশ্চর্য্য হইল! বোধ হয়, এই জন্যই সে এ বিষয়ে আর অধিক অনুরোধ না করিয়া তাহাকে শুধু কহিল, আপনার যে খাওয়া হ'ল না। কিন্তু আবার কবে আস্‌বেন ?

পরশু আসবার চেষ্টা কর্‌ব, বলিয়া নরেন যে পথে আসিয়াছিল সেই পথে দ্রুতপদে রেলওয়ে ষ্টেশনের উদ্দেশে প্রস্থান করিল।

মাঠ পার হইতে আর যখন দেরি নাই, এমন সময়ে দেখিল কে একটা ছেলে হাত উঁচু করিয়া তাহারই দিকে প্রাণপণে ছুটিয়া আসিতেছে। সে যে তাহার জন্য ছুটিতেছে, এবং হাত তুলিয়া তাহাকেই থামিতে ইঙ্গিত করিতেছে অনুমান করিয়া নরেন থমকিয়া দাঁড়াইল। খানিক পরেই পরেশ আসিয়া উপস্থিত হইল এবং হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, মাঠান্ ডেকে পাঠালেন তোমাকে। চল।

আমাকে ?

হিঁ—চল না।

নরেন নিশ্চল হইয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া সন্দিগ্ধ-কণ্ঠে কহিল, তুই বুঝ্‌তে পারিস্ নি রে—আমাকে নয়।

পরেশ প্রবল-বেগে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, হিঁ, তোমাকেই। তোমার মাথায় যে সাহেবের টুপি রয়েছে। চল।

নরেন আবার কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া প্রশ্ন করিল, তোর মাঠান্ কি ব'লে দিলে তোকে ?

পরেশ কহিল, মাঠান্ সেই চিলের ছাত থেকে দৌড়ে নেবে এসে বললে, পরেশ, ছুটে যা—এই সোজা গিয়ে বাবুকে ধরে আন। মাথায় সাহেবের টুপি—যা—ছুটে যা—তোকে খুব ভাল একটা লাটাই কিনে দেব।—চল না।

এতক্ষণে ইহার ব্যগ্রতার হেতু বুঝা গেল। সে লাটাইয়ের লোভে এই রৌদ্রের মধ্যে ইঞ্জিনের বেগে ছুটিয়া আসিয়াছে। সুতরাং কোন-মতেই ছাড়িয়া যাইবে না। তাহার একবার মনে হইল ছেলেটিকে নিজেই একটা লাটাইয়ের দাম দিয়া এইখান হইতে বিদায় করে। কিন্তু আজই এমন করিয়া ডাকিয়া পাঠাইবার কি কারণ, সে কৌতূহলও কিছুতেই নিবারণ করিতে পারিল না। কিন্তু যাওয়া উচিত কি না স্থির করিতে তাহার আরও কিছুক্ষণ লাগিল, এবং শেষ পর্য্যন্ত স্থিরও কিছুই হইল না; তবুও অনিশ্চিত পদ তাহার ওই দিকেই ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল। সমস্ত রাস্তাটা সে ডাকিবার কারণটাই মনে মনে হাতড়াইয়া মরিতে লাগিল, কিন্তু ডাকাটাই যে সব চেয়ে বড় কারণ সেটা আর তাহার চোখে পড়িল না। বাহিরের ঘরে পা দিতেই বিজয়া সুমুখে দাঁড়াইল। দুটি আর্দ্র উৎসুক চক্ষু তাহার মুখের উপর পাতিয়া তীক্ষ্ণকণ্ঠে কহিল, না

খেয়ে এত বেলায় চলে যাচ্চেন যে বড়? আমি মিছামিছি রাগ করি, আমিই ভয়ানক মন্দ লোক—আর নিজে?

নরেন গভীর বিস্ময়ভরে বলিল, এর মানে? কে বলেছে আপনি মন্দ লোক, কে বলেছে ওসব কথা আপনাকে?

বিজয়ার ঠোঁট কাঁপিতে লাগিল; কহিল, আপনি বলেছেন। কেন নলিনীর সাম্‌নে আমাকে অমন ক'রে অপমান কর্‌লেন? আমাকেই অপমান কর্‌লেন, আবার আমাকে শাস্তি দিতে না খেয়ে চলে যাচ্ছেন? কি করেছি আপনার আমি? বলিতে বলিতেই তাহার দুই চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া আসিল। বোধ করি, তাহাই সামলাইবার জন্য সে তৎক্ষণাৎ ও-দিকের জানালায় গিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইল। নরেন হতবুদ্ধির মত বাকশূন্য হইয়া চাহিয়া রহিল। এ অভিযোগের কোথায় কি যে জবাব আছে তাহাও যেমন খুঁজিয়া পাইল না, ইহার কারণই বা কি তাহাও ভাবিয়া পাইল না।

স্নানের জল প্রভৃতি দেওয়া হইয়াছে বেহারা জানাইয়া গেলে, বিজয়া ফিরিয়া আসিয়া শান্তভাবে কহিল, আর দেরি কর্‌বেন না, যান!

স্নান সারিয়া নরেন আহারে বসিল। বিজয়া একখানা পাখা হাতে করিয়া তাহার অদূরে আসিয়া যখন উপবেশন করিল, তখন অত্যন্ত সঙ্গোপনে তাহার সর্ব্বাঙ্গ আলোড়িত করিয়া যেন লজ্জার ঝড় বহিয়া গেল। বাতাস করিতে উদ্যত দেখিয়া নরেন সঙ্কুচিত হইয়া কহিল, আমাকে হাওয়া কর্‌বার দরকার নেই আপনি পাখাটা রেখে দিন।

বিজয়া মৃদু হাসিয়া কহিল, আপনার দরকার না থাকলেও আমার দরকার আছে। বাবা বলতেন, মেয়েমানুষকে শুধু হাতে কখনো বস্‌তে নেই।

নরেন জিজ্ঞাসা করিল, আপনার খাওয়াও ত হয় নি?

বিজয়া কহিল, না। পুরুষমানুষদের খাওয়া না হ'লে আমাদের খেতেও নেই।

নরেন খুসি হইয়া বলিল, আচ্ছা, ব্রাহ্ম হলেও ত আপনাদের আচার ব্যবহার আমাদের মতই।

বিজয়া এ কথা বলিল না যে, অনেক ব্রাহ্ম-বাড়িতেই তাহা নয়, বরঞ্চ ঠিক উল্টা। শুধু তাহার পিতাই কেবল এই সকল হিন্দু-আচার নিজের বাড়িতে বজায় রাখিয়া গিয়াছিলেন। বরঞ্চ কহিল, এতে আশ্চর্য্য হ'বার ত কিছু নেই। আমরা বিলেত থেকেও আসিনি, কাবুল থেকেও আমাদের আচার-ব্যবহার আমদানী ক'রে আন্‌তে হয় নি। এ রকম না হলেই বরং আশ্চর্য্য হবার কথা।

চাকর দ্বারের কাছে আসিয়া কহিল, মা, সরকারমশাই হিসেবের খাতা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। এখন কি যেতে ব'লে দেব?

বিজয়া ঘাড় নাড়িয়া কহিল, হাঁ, আজ আর আমার দেখবার সময় হবে না, তাঁকে কাল একবার আস্‌তে ব'লে দাও।

ভৃত্য চলিয়া গেলে নরেন বিজয়ার মুখের প্রতি চোখ তুলিয়া কহিল, এইটি আমাকে সব চেয়ে বেশি আনন্দ দেয়।

কোনটি?

চাকরদের মুখের এই ডাকটি। বলিয়া হাসিয়া কহিল, আপনি ব্রাহ্ম-মহিলাও বটে, আলোক-প্রাপ্তও বটে, এবং বিশেষ ক'রে বড়মানুষও বটে। এম্‌নি আলোক-পাওয়া অনেক বাড়িতেই আমাকে আজকাল চিকিৎসা কর্‌তে যেতে হয়। তাঁদের চাকর-বাকরেরা মেয়েদের বলে মেম-সাহেব। সত্যিকারের মেম-সাহেবেরা এঁদের যে চক্ষে দেখে তা জানেন বলেই বোধ করি মাইনে-করা চাকরদের দিয়ে মেম-সাহেব বলিয়ে নিয়ে আত্ম-মর্য্যাদা বজায় রাখেন। বলিয়া প্রকাণ্ড একটা পরিহাসের মত

হাঃ হাঃ হাঃ করিয়া অট্টহাস্যে বাড়িটা পরিপূর্ণ করিয়া দিল। বিজয়া নিজেও হাসিয়া ফেলিল। নরেনের হাসি থামিলে সে পুনরায় কহিল, বাড়ির দাসী-চাকরের মুখের মাতৃ-সম্বোধনের চেয়ে মেমসাহেব ডাকটা যেন বেশি ইজ্জতের! প্রথম দিন আমি বুঝতেই পারি নি বেহারাটা মেম বল্লে কারে? চাকরটা কি বললে জানেন? বল্‌লে, আমি অনেক সাহেব বাড়িতে চাকরি করেচি, সত্যিকারের মেম-সাহেব কি, তা খুব জানি! কিন্তু কি কর্‌ব ডাক্তারবাবু? নতুন হিন্দুস্থানী দরওয়ানটা গিন্নীকে মাইজী ব'লে ফেলেছিল ব'লে মেম-সাহেব তার এক টাকা জরিমানা ক'রে দিলেন। চাক্‌রিটা যে বজায় রইল এই তার ভাগ্যি! এম্‌নি রাগ। আচ্ছা, আপনি বোধ হয় এ রকম অনেক দেখেছেন, না?

বিজয়া হাসিয়া ঘাড় নাড়িল।

নরেন কহিল, আমাকে এইটে একদিন দেখতে হবে, এই সব মেম-সাহেবদের ছেলে-মেয়েরা মাকে মা বলে, না মেম-সাহেব ব'লে ডাকে! বলিয়া নিজের রসিকতার আনন্দে আর একবার ঘর ফাটাইয়া তুলিবার আয়োজন করিল।

বিজয়া হাসিমুখে কহিল, খেয়ে-দেয়ে সমস্ত দিন ধ'রে পরচর্চ্চা ক'রে আমোদ কর্‌বেন আমার আপত্তি নেই; কিন্তু আমাকে কি আজ খেতে দেবেন না?

নরেন লজ্জিতভাবে তাড়াতাড়ি দু-চার গ্রাস গিলিয়া লইয়াই সব ভুলিয়া গেল। কহিল, আমিও ত চার-পাঁচ বছর বিলেতে ছিলুম, কিন্তু এই দিশি-সাহেবেরা—

বিজয়া তর্জ্জনী তুলিয়া কৃত্রিম শাসন করার ভঙ্গীতে কহিল, আবার পরের নিন্দে!

আচ্ছা, আর নয়; বলিয়া সে পুনরায় আহারে মন দিয়াই কহিল, কিন্তু আর খেতে পাচ্ছি নে—

বিজয়া ব্যস্ত হইয়া কহিল, বাঃ—কিছুই ত খান নি! না, এখন উঠ্‌তে পাবেন না। আচ্ছা, না হয় পরের নিন্দে কর্‌তে কর্‌তেই অন্যমনস্ক হয়ে খান্ আমি কিছু বলব না।

নরেন হাসিতে গিয়া অকস্মাৎ অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া উঠিল। কহিল, আপনি এতেই বল্‌চেন খাওয়া হ'লো না—কিন্তু আমার কলকাতার রোজকার খাওয়া যদি দেখেন ত অবাক্ হয়ে যাবেন। দেখ্‌চেন না এই কমাসের মধ্যেই কি রকম রোগা হয়ে গেছি। আমার বাসায় বামুন ব্যাটা হয়েছে যেমন পাজি, তেমনি বদ্‌মাইস্ জুটেছে চাকরটা। সাত-সকালে রেঁধে রেখে কোথায় যায় তার ঠিকানা নেই—আমার কোন দিন ফির্‌তে হয় দুটো, কোন দিন বা চার্‌টে বেজে যায়। সেই ঠাণ্ডা কড়-কড়ে ভাত—দুধ কোন দিন বা বেরালে খেয়ে যায়, কোন দিন বা জানালা দিয়ে কাক ঢুকে সমস্ত ছড়াছড়ি ক'রে রাখে—সে দেখ্‌লেই ঘৃণা হয়। অর্দ্ধেক দিন ত একেবারেই খাওয়া হয় না।

রাগে বিজয়ার মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল। কহিল, এমন সব চাকর-বাকরদের দূর ক'রে দিতে পারেন না? নিজের বাসায়, এত টাকা মাইনে পেয়েও যদি এত কষ্ট, তবে চাকরি করাই বা কেন?

নরেন কহিল, এক হিসাবে আপনার কথা সত্যি। একদিন বাক্স থেকে কে দুশ টাকা চুরি করে নিলে, একদিন নিজেই কোথায় একশ টাকার নোট হারিয়ে ফেল্‌লুম! অন্যমনস্ক লোকের ত পদে পদেই বিপদ কি না! একটুখানি থামিয়া কহিল, তবে নাকি দুঃখ কষ্ট আমার অনেক দিন থেকেই সয়ে গেছে তাই তেমন গায়ে লাগে না। শুধু অত্যন্ত ক্ষিদের উপর খাওয়ার কষ্টটা এক একদিন যেন অসহ বোধ হয়।

বিজয়া মুখ নিচু করিয়া চুপ করিয়া রহিল। নরেন কহিতে লাগিল, বাস্তবিক চাকরি আমার ভালও লাগে না, পারিও না। অভাব আমার খুবই সামান্য—আপনার মত কোন বড়লোক দুবেলা চারটি চারটি খেতে দিত, আর নিজের কাজ নিয়ে থাকতে পারতুম ত আমি আর কিছুই চাইতুম না—কিন্তু সে রকম বড়লোক কি আর আছে? বলিয়া আর এক দফা উচ্চ হাসির ঢেউ তুলিয়া দিল। বিজয়া পূর্ব্বের মতই নত-মুখে নীরবে বসিয়া রহিল। নরেন কহিল, কিন্তু আপনার বাবা বেঁচে থাকলে, হয় ত এ সময়ে আমার অনেক উপকার হতে পারত—তিনি নিশ্চয় আমাকে এই উঞ্ছবৃত্তি থেকে রেহাই দিতেন।

বিজয়া উৎসুক-দৃষ্টিতে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি ক'রে জানলেন? তাঁকে ত আপনি চিনতেন না?

নরেন কহিল, না, আমিও তাঁকে কখনো দেখি নি, তিনিও বোধ হয় কখনো দেখেন নি। কিন্তু তবুও আমাকে খুব ভালবাসতেন। কে আমাকে টাকা দিয়ে বিলেত পাঠিয়েছিল জানেন? তিনিই। আচ্ছা, আমাদের ঋণের সম্বন্ধে আপনাকে কি কখনো তিনি কিছু ব'লে যান নি?

বিজয়া কহিল, বলাই ত সম্ভব। কিন্তু আপনি ঠিক কি ইঙ্গিত করচেন তা না বুঝলে ত জবাব দিতে পারি নে।

নরেন ক্ষণকাল মনে মনে কি চিন্তা করিয়া কহিল, থাক্ গে। এখন এ আলোচনা একেবারেই নিষ্প্রয়োজন।

বিজয়া ব্যগ্র হইয়া কহিল, না, বলুন! আমি শুনতে চাই।

নরেন আবার একটু ভাবিয়া বলিল, যা চুকে-বুকে শেষ হয়ে গেছে, তা শুনে আর কি হবে বলুন?

বিজয়া জিদ্ করিয়া কহিল, না, তা হবে না। আমি শুনতে চাই, আপনি বলুন।

তাহার আগ্রহাতিশয্য দেখিয়া নরেন হাসিল ; কহিল, বলা শুধু যে নিরর্থক তাই নয়—বল্‌তে আমার নিজেরও লজ্জা হচ্চে। হয় ত আপনার মনে হবে আমি কৌশলে আপনার সেন্টিমেণ্টে ঘা দিয়ে—

বিজয়া অধীর হইয়া কথার মাঝখানেই বলিল, আমি আর খোসামোদ কর্‌তে পারি নে আপনাকে—পায়ে পড়ি, বলুন।

খাওয়া-দাওয়ার পরে ?

না, এখ্‌খুনি—

আচ্ছা, বল্‌চি বল্‌চি। কিন্তু একটা কথা পূর্ব্বে জিজ্ঞেসা করি, আমাদের বাড়িটার বিষয়ে কোন কথা কি তিনি কখনো আপনাকে বলেন নি ?

বিজয়া অধিকতর অসহিষ্ণু হইয়া উঠিল, কিন্তু কোন উত্তর দিল না। নরেন মুচকিয়া হাসিয়া কহিল, আচ্ছা, রাগ কর্‌তে হবে না আমি বল্‌চি। যখন বিলেত যাই তখনি বাবার কাছে শুনেছিলুম আপনার বাবাই আমাকে পাঠাচ্চেন। আজ তিন দিন হ'লো দয়ালবাবু আমাকে একতাড়া চিঠি দেন। যে ঘরটায় ভাঙ্গা-চোরা কতকগুলো আস্‌বাব পড়ে আছে তারই একটা ভাঙ্গা দেরাজের মধ্যে চিঠিগুলো ছিল—বাবার জিনিষ ব'লে দয়ালবাবু আমার হাতেই দেন। পড়ে দেখলুম, খান-দুই চিঠি আপনার বাবার লেখা। শুনেছেন বোধ হয় শেষ-বয়সে বাবা দেনার জ্বালায় জুয়া খেল্‌তে সুরু করেন। বোধ করি সেই ইঙ্গিতই একটা চিঠির গোড়ায় ছিল। তার পরে নিচের দিকে এক যায়গায় তিনি উপদেশের ছলে সান্ত্বনা দিয়ে বাবাকে লিখেছেন, বাড়িটার জন্যে ভাবনা নেই—নরেন আমারও ত ছেলে, বাড়িটা তাকেই যৌতুক দিলাম।

বিজয়া মুখ তুলিয়া কহিল, তার পরে ?

নরেন কহিল, তার পরে সব অন্যান্য কথা। তবে এ পত্র বহুদিন

পূর্ব্বের লেখা। খুব সম্ভব, তাঁর এ অভিপ্রায় পরে বদ্‌লে গিয়েছিল বলেই কোন কথা আপনাকে ব'লে যাওয়া আবশ্যক মনে করেন নি।

পিতার শেষ ইচ্ছাগুলি বিজয়ার অক্ষরে অক্ষরে মনে পড়িয়া দীর্ঘশ্বাস পড়িল। কয়েক মুহূর্ত্ত স্থির থাকিয়া বলিল, তা হ'লে বাড়িটা দাবি করবেন বলুন, বলিয়া হাসিল।

নরেন নিজেও হাসিল। প্রস্তাবটা চমৎকার পরিহাস কল্পনা করিয়া কহিল, দাবি নিশ্চয় করব, এবং আপনাকেই সাক্ষী মানব। আশা করি সত্য কথাই বলবেন।

বিজয়া ঘাড় নাড়িয়া কহিল, নিশ্চয়। কিন্তু সাক্ষী মান্‌বেন কেন?

নরেন কহিল, নইলে প্রমাণ হবে কিসে? বাড়িটা যে সত্যিই আমার সে কথা ত আদালতে প্রতিষ্ঠিত করা চাই।

বিজয়া গম্ভীর হইয়া বলিল, অন্য আদালতের দরকার নেই—বাবার আদেশ আমার আদালত। ও বাড়ি আপনাকে আমি ফিরিয়ে দেব।

তাহার মুখের চেহারা এবং কণ্ঠস্বর ঠিক রহস্যের মত শোনাইল না বটে, কিন্তু সে ছাড়া যে আর কি হইতে পারে তাহাও মনে ঠাঁই দেওয়া যায় না। বিশেষতঃ বিজয়ার পরিহাসের ভঙ্গী এত নিগূঢ় যে শুধু মুখ দেখিয়া জোর করিয়া কিছু বলা অত্যন্ত কঠিন। তাই নরেন নিজেও ছদ্ম গাম্ভীর্য্যের সহিত বলিল, তা হ'লে তাঁর চিঠিটা চোখে না দেখেই বোধ হয় বাড়িটা দিয়ে দেবেন?

বিজয়া কহিল, না, চিঠি আমি দেখ্‌তে চাই। কিন্তু এই কথাই যদি তাতে থাকে, তাঁর হুকুম আমি কোন মতেই অমান্য করব না।

নরেন কহিল, তাঁর অভিপ্রায় যে শেষ পর্য্যন্ত এই ছিল তারই বা প্রমাণ কোথায়?

বিজয়া উত্তর দিল, ছিল না তারও ত প্রমাণ নেই।

নরেন কহিল, কিন্তু আমি যদি না নিই? দাবি না করি?

বিজয়া কহিল, সে আপনার ইচ্ছে। কিন্তু সে ক্ষেত্রে আপনার পিসির ছেলেরা আছেন। আমার বিশ্বাস, অনুরোধ কর্‌লে তাঁরা দাবি কর্‌তে অসম্মত হবেন না।

নরেন হাসিয়া কহিল, এ বিশ্বাস আমারও আছে। এমন কি, হলফ্ ক'রে বল্‌তেও রাজী আছি।

বিজয়া এ হাসিতে যোগ দিল না—চুপ করিয়া রহিল।

নরেন পুনরায় কহিল, অর্থাৎ আমি নিই, না নিই আপনি দেবেনই।

বিজয়া কহিল, অর্থাৎ বাবার দান করা জিনিস আমি আত্মসাৎ কর্‌ব না এই আমার প্রতিজ্ঞা।

তাহার সঙ্কল্পের দৃঢ়তা দেখিয়া নরেন মনে মনে বিস্মিত হইল, মুগ্ধ হইল। কিন্তু নিঃশব্দে কিছুক্ষণ থাকিয়া স্নিগ্ধকণ্ঠে বলিল, ও বাড়ি যখন সৎকর্ম্মে দান করেছেন তখন আমি না নিলেও আপনার আত্মসাৎ করার পাপ হবে না। তা ছাড়া, ফিরিয়ে নিয়ে কি কর্‌ব বলুন? আপনার কেউ নেই যে তারা বাস কর্‌বে। আমাকে বাইরে কোথাও না কোথাও কাজ কর্‌তেই হবে। তার চেয়ে যে ব্যবস্থা হয়েছে সেই ত সবচেয়ে ভাল হয়েছে। আরও এক কথা এই যে, বিলাসবাবুকে কোন মতেই রাজী করাতে পারবেন না।

এই শেষ কথাটায় বিজয়া মনে মনে জ্বলিয়া উঠিয়া কহিল, নিজের জিনিসে অপরকে রাজী করাবার চেষ্টা করার মত অপর্য্যাপ্ত সময় আমার নেই। কিন্তু আপনি ত আর এক কাজ কর্‌তে পারেন। বাড়ি যখন আপনার দরকার নেই, তখন তার উচিত মূল্য আমার কাছে নিন। তা হ'লে চাকরিও কর্‌তে হবে না, অথচ নিজের কাজও স্বচ্ছন্দে কর্‌তে

পারবেন। আপনি সম্মত হোন্ নরেনবাবু। এই একান্ত মিনতিপূর্ণ অনুনয়ের স্বর অকস্মাৎ শরের মত গিয়া নরেনের হৃদয়ে বিঁধিয়া তাহাকে চঞ্চল করিয়া তুলিল; এবং যদিচ বিজয়ার অবনত মুখে এই মিনতির প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত পড়িয়া লইবার সুযোগ মিলিল না, তথাপি ইহা পরিহাস নয় সত্য, ইহাও বুঝিতে বিলম্ব ঘটিল না। পিতৃ ঋণের দায়ে তাহাকে গৃহহীন করিয়া এই মেয়েটি যে সুখী নয়, বরঞ্চ হৃদয়ে ব্যথাই অনুভব করিতেছে, এবং কোন একটা উপলক্ষ সৃষ্টি করিয়া তাহার দুঃখের ভার লঘু করিয়া দিতে চায় ইহা নিশ্চয় বুঝিয়া তাহার বুক ভরিয়া উঠিল। কিন্তু তাই বলিয়া এরূপ প্রস্তাবও ত স্বীকার করা চলে না। যাহা প্রাপ্য নয়, গরীব বলিয়া তাহাই বা কিরূপে ভিক্ষা লইবে? আরও একটা বড় কথা আছে। যে সকল সাংসারিক ব্যাপার পূর্ব্বে একেবারেই সমস্যা ছিল, তাহার অনেকগুলিই এই লোকটির কাছে সহজ হইয়া গিয়াছে। সে স্পষ্ট দেখিতে পাইল বিলাসের সম্বন্ধে বিজয়া আবেগের উপর যাহাই কেন না বলুক, তাহার বাধা ঠেলিয়া শেষ পর্য্যন্ত এ সঙ্কল্প কিছুতেই কার্য্যে পরিণত করিতে পারিবে না। ইহাতে শুধু কেবল তাহার লজ্জা এবং বেদনাই বাড়িবে আর কিছু হইবে না।

কিছুক্ষণ তাহার অবনত মুখের প্রতি সস্নেহ দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া পরিহাস-তরল-কণ্ঠে বলিল, আপনার মনের কথা আমি বুঝেচি। গরীবকে কোন একটা ছলে কিছু দান করতে চান্, এই ত?

ঠিক এই কথাটাই আজই একবার হইয়া গিয়াছে। তাহারই পুনরাবৃত্তিতে বিজয়া বেদনায় ম্লান হইয়া চোখ তুলিয়া কহিল, এ কথায় আমি কত কষ্ট পাই, আপনি জানেন?

নরেন মনে মনে হাসিয়া প্রশ্ন করিল, তবে আসল কথাটা কি শুনি?

বিজয়া কহিল, সত্যি কথাই আমি বরাবর বলেচি; আপনার পাপ মন

বলেই শুধু বিশ্বাস কর্‌তে পারেন নি। আপনি গরীব হোন্, বড়লোক হোন্ আমার কি? আমি কেবল বাবার আদেশ পালন কর্‌বার জন্যেই আপনাকে ফিরিয়ে দিতে চাচ্চি।

নরেন সহসা ভয়ানক গম্ভীর হইয়া বলিল, ওর মধ্যেও একটু মিথ্যে রয়ে গেল—তা থাক্। কিন্তু খুব বড় বড় প্রতিজ্ঞা ত কর্‌চেন; কিন্তু বাবার হুকুম মত ফিরিয়ে দিতে হলে আরও কত জিনিস দিতে হয় জানেন? শুধু ওই বাড়িটাই নয়।

বিজয়া কহিল, বেশ। নিন, আপনার সমস্ত সম্পত্তি ফিরিয়ে নিন।

এইবার নরেন হাসিয়া ঘাড় নাড়িল। কহিল, খুব বড় গলায় চীৎকার করে ত আমাকে দাবি কর্‌তে বল্‌চেন। আমি না কর্‌লে আমার পিসিমার ছেলেদের দাবি কর্‌তে বল্‌বেন, ভয় দেখাচ্চেন। কিন্তু তাঁরই আদেশমত দাবি আমার কোথা পর্য্যন্ত পৌঁছুতে পারে, জানেন কি? শুধু কেবল ওই বাড়িটা আর কয়েক বিঘে জমি নয়, তার ঢের-ঢের বেশি।

বিজয়া উৎসুক হইয়া কহিল, বাবা আর কি আপনাকে দিয়েছেন?

নরেন বলিল, তাঁর সে চিঠিও আমার কাছে আছে। তাতে যৌতুক শুধু তিনি ওইটুকু দিয়েই আমাকে বিদায় করেন নি। যেখানে যা কিছু দেখ্‌চেন সমস্তই তার মধ্যে। আমি দাবি শুধু ওই বাড়িটা কর্‌তে পারি তাই নয়। এ বাড়ি, এই ঘর, ওই সমস্ত টেবিল-চেয়ার-আয়না-দেয়ালগিরি-খাট-পালঙ্ক, বাড়ির দাস-দাসী-আমলা-কর্ম্মচারী, মায় তাদের মনিবটিকে পর্য্যন্ত দাবি কর্‌তে পারি, তা জানেন কি! বাবার হুকুম, বাবার হুকুম—দেবেন এই সব?

বিজয়ার পদনখ হইতে মাথায় চুল পর্য্যন্ত শিহরিয়া উঠিল, কিন্তু সে কোন উত্তর না দিয়া অধোমুখে কাঠের মূর্ত্তির মত বসিয়া রহিল। নরেন

সগর্ব্বে ভাতের গ্রাস মুখে তুলিয়া দিয়া খোঁচা দিয়া বলিল, কেমন, দিতে পারবেন ব'লে মনে হচ্চে? বরঞ্চ একবার না হয় বিলাসবাবুর সঙ্গে নিরিবিলি পরামর্শ করবেন! বলিয়া হাঃ হাঃ হাঃ করিয়া হাসিতে লাগিল।

কিন্তু এইবার বিজয়া মুখ তুলিতেই তাহার প্রবল হাস্য সহসা যেন মার খাইয়া রুদ্ধ হইল। বিজয়ার মুখে যেন রক্তের আভাসমাত্র নাই—এমনি একটি শুষ্ক পাণ্ডুর মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া নরেন উদ্বিগ্ন শশব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, আপনি পাগল হয়ে গেলেন না কি? আমি কি সত্যি সত্যিই এই সব দাবি করতে যাচ্চি, না, করলেই পাব। বরঞ্চ আমাকে ত তা হ'লে ধরে নিয়ে পাগ্‌লা গারদে পূরে দেবে।

বিজয়া এ সকল কথা যেন শুনিতেই পাইল না। কহিল, কই দেখি বাবার চিঠি।

নরেন আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, বেশ, আমি কি পকেটে ক'রে নিয়ে বেড়াচ্চি না কি। আর সে দেখেই বা লাভ কি আপনার?

তা হোক্। দরওয়ানের হাতে চিঠি দুটো আজই দেবেন। সে আপনার সঙ্গে কলকাতায় যাবে।

এত তাড়া?

হাঁ।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

নিদ্রাবিহীন রজনীর পরিপূর্ণ ক্লান্তি লইয়া বিজয়া সকালে নিচের বসিবার ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিল, জমিদারী সেরেস্তার খেরো-বাঁধান খাতাগুলি টেবিলের উপর থাকে থাকে সাজানো রহিয়াছে; এবং বৃদ্ধ গোমস্তা অদূরে দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতেছে। সে সবিনয়ে কহিল, মা, এগুলো আজ ফিরে চাই-ই।

তাহাকে ঘণ্টা-দুই পরে ঘুরিয়া আসিতে অনুরোধ করিয়া বিজয়া উপরের খাতাটা তুলিয়া লইয়া জানালা-সংলগ্ন কোচের উপর গিয়া উপবেশন করিল। তাহার মনোযোগ দিবার শক্তিই ছিল না—উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি বারংবার হিসাবের অঙ্ক ছাড়িয়া জানালার বাহিরে এখানে-ওখানে পলায়ন করিতেছিল। হঠাৎ দৃষ্টি পড়িল, বাগানের ধারে একটা গাছতলায় দাঁড়াইয়া বৃদ্ধ রাসবিহারী পরেশকে কি সকল প্রশ্ন করিতেছেন। আঙুল তুলিয়া কখনও নিচের ঘর, কখনও বা ছাদের উপর নির্দ্দেশ করিতেছেন। দুজনের কাহারও একটা কথাও না শুনিয়া বিজয়া চক্ষের নিমিষে বৃদ্ধের ক্রূর ইঙ্গিতের মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিয়া লইল।

খানিক পরে তিনি ছেলেটাকে ছাড়িয়া দিয়া কাছারী-ঘরের দিকে চলিয়া গেলেন। পরেশ বাড়ির দিকে আসিতেছিল বিজয়া জানালা দিয়া হাত নাড়িয়া তাহাকে কাছে ডাকিয়া প্রশ্ন করিল, তোকে কি জিজ্ঞেসা করছিলেন রে?

পরেশ কহিল, আচ্ছা মাঠান্, সরকারমশায়ের কাছে টাকা নিয়ে আমি ঘুড়ি-নাটাই কিনতে চলে গেনু না? ডাক্তারবাবুর ভাত খাবার বেলা কি আমি বাড়ি ছিনু মাঠান্?

বিজয়া কহিল, না।

পরেশ কহিল, তবে? বড়বাবু বলে, কি কথা হয়েছিল বল্ ব্যাটা, নইলে সেপাই দিয়ে তোকে বেঁধে জল-বিছুটি দেওয়াব। আমি বন্নু, নতুন দরোয়ান তোমারে মিথ্যে মিথ্যে নাগিয়েচে। মাঠান্ বললে, পরেশ, ছুটে গিয়ে ডাক্তারবাবুকে ডেকে আন্ তোকে ভাল নাটাই কিনে দেব—তাই না ছুটে গেনু? কিন্তু বড়বাবুকে ব'লো না মাঠান্। তোমাকে বল্‌তে তিনি মানা ক'রে দেছে।

জানাইবে না বলিয়া ভরসা দিয়া বিজয়া পরেশকে বিদায় করিল, এবং

স্বস্থানে ফিরিয়া আসিয়া পুনরায় খাতা খুলিয়া বসিল; কিন্তু এবার তাহার দৃষ্টির সম্মুখে খাতার লেখা একেবারে লেপিয়া মুছিয়া একাকার হইয়া গেল। শুধু রাত্রি-জাগরণে নয়, অসহ্য ক্রোধে আরক্ত চক্ষু দুটি আগুনের শিখার মত জ্বলিতে লাগিল। অনতিকাল পরেই রাসবিহারী দ্বারের বাহিরে লাঠির শব্দ করিয়া মৃদুমন্দ গতিতে প্রবেশ করিলেন; এবং বিজয়ার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে অল্প একটুখানি কাসিয়া চেয়ার টানিয়া উপবেশন করিলেন।

বিজয়া খাতা হইতে মুখ তুলিয়া কহিল, আসুন। আজ এত সকাল যে?

রাসবিহারী তৎক্ষণাৎ সে প্রশ্নের উত্তর না দিয়া অত্যন্ত উদ্বেগের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার চোখ দুটি যে ভয়ানক রাঙা দেখাচ্চে মা। ঠাণ্ডা-টাণ্ডা লাগে নি ত?

বিজয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না।

রাসবিহারী তাহা কানে না তুলিয়া উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। বলিলেন, না বল্‌লে ত শুন্‌বো না মা। হয় রাত্রে ভাল ঘুম হয় নি, নয় কোন রকম কিছু—

না, আমার কিছুই হয় নি।

কিন্তু ও-রকম চোখ লাল হবার কারণ ত একটা কিছু—

বিজয়া আর প্রতিবাদ না করিয়া কাজে মন দিল দেখিয়া রাসবিহারী থামিয়া গেলেন। একটু মৌন থাকিয়া কহিলেন, রোদের ভয়েই সকালে আসতে হ'ল মা। দলিল-পত্রগুলো একবার দেখতে হবে—শুন্‌চি নাকি চৌধুরীরা ঘোষপাড়ার সীমানা নিয়ে একটা মামলা রুজু করবে।

জমিদারী-সংক্রান্ত অত্যাবশ্যক দলিলগুলি বনমালী নিজের কাছেই রাখিতেন। একে ত এ সকলের সচরাচর প্রয়োজন হয় না, তাহাতে অন্যত্র ক্ষোয়া যাইবার সম্ভাবনা আছে বলিয়া তিনি কোন দিন কাছ-ছাড়া করেন নাই। কলিকাতা হইতে বাড়ি আসিবার সময় বিজয়া এগুলি সঙ্গে

আনিয়াছিল, এবং নিজের শোবার ঘরের লোহার আলমারীতে বন্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। বিজয়া মুখ তুলিয়া কহিল, তাঁরা মাম্‌লা করবেন কে বল্‌লে?

রাসবিহারী বিজ্ঞভাবে অল্প হাস্য করিয়া কহিলেন, কেউ বলে নি মা, আমি বাতাসে খবর পাই। তা না হ'লে কি এত বড় জমিদারীটা এতদিন চালাতে পারতাম।

বিজয়া জিজ্ঞাসা করিল, তারা কতটা দাবি করছেন?

রাসবিহারী মনে মনে হিসাব করিয়া বলিলেন, তা হবে বৈ কি—খুব কম হ'লেও সেটা বিঘে-দুই হবে।

বিজয়া তাচ্ছিল্যের সহিত কহিল, এই! তা হ'লে তারাই নিন। এটুকু যায়গা নিয়ে মাম্‌লা-মোকদ্দমার দরকার নেই।

রাসবিহারী অত্যধিক বিস্ময়ের ভান করিয়া ক্ষোভের সহিত কহিলেন, এ রকম কথা তোমার মত মেয়ের মুখে আমি আশা করি নি মা। আজ বিনা বাধায় যদি দুবিঘে ছেড়ে দিই কাল যে আবার দুশ বিঘে ছেড়ে দিতে হবে না তাই বা কে বল্‌লে?

কিন্তু আশ্চর্য্য, এত বড় তিরস্কারেও বিজয়া বিচলিত হইল না। সে সহজভাবে প্রত্যুত্তর করিল, কিন্তু সত্যিই ত আর দুশ বিঘে আমাদের ছাড়তে হচ্চে না। আমি বলি, সামান্য কারণে মাম্‌লা-মোকদ্দমার দরকার নেই।

রাসবিহারী মর্ম্মাহত হইলেন। বারংবার মাথা নাড়িয়া কহিলেন, কিছুতেই হতে পারে না মা, কিছুতেই হতে পারে না। তোমার বাবা যখন আমার উপর সমস্ত নির্ভর ক'রে গেছেন, এবং যতক্ষণ আমি বেঁচে আছি বিনা প্রতিবাদে দুবিঘে কেন, দুআঙুল যায়গা ছেড়ে দিলেও ঘোর অধর্ম্ম হবে। তা ছাড়া আরও অনেক কারণ আছে যার জন্যে পুরানো

দলিলগুলো একবার ভাল ক'রে দেখা দরকার। একবার কষ্ট ক'রে ওঠো মা, বাক্সটা উপর থেকে আনিয়ে দাও।

বিজয়া উঠিবার কোন লক্ষণ প্রকাশ করিল না। বরঞ্চ জিজ্ঞাসা করিল, আরও কারণ আছে!

রাসবিহারী বলিলেন, হাঁ।

বিজয়া কহিল, কি কারণ?

রাসবিহারী মনে মনে অত্যন্ত বিরক্ত হইলেও আত্মসম্বরণ করিয়া জবাব দিলেন, কারণ ত একটা নয়—মুখে মুখে তার কি কৈফিয়ৎ তোমাকে দেব মা?

এই সময় সরকারমশায় তাঁহার খাতাপত্রের জন্য আস্তে আস্তে ঘরে ঢুকিতেই, বিজয়া লজ্জিতভাবে তাড়াতাড়ি কহিল, এ বেলায় আর হয়ে উঠ্‌ল না, ওবেলা এসে নিয়ে যাবেন।

যে আজ্ঞে, বলিয়া সরকার ফিরিতেছিল—বিজয়া ডাকিয়া বলিল, একটা কাজ আছে কিন্তু। কাছারির ওই নূতন দরওয়ানটা কত দিন বাহাল হয়েছে জানেন?

সরকার কহিল, মাস-তিনেক হবে বোধ হয়।

বিজয়া কহিল, তা যতই হোক, ওকে আর দরকার নেই। এখনো এ মাসের প্রায় কুড়ি দিন বাকি, এই কটা দিনের মাইনে বেশি দিয়ে আজই ওকে জবাব দেবেন।

সরকার বিস্ময়াপন্ন হইয়া চাহিয়া রহিল। ইচ্ছাটা তাহার অপরাধের কথা জিজ্ঞাসা করে, কিন্তু সাহস করিল না।

বিজয়া তাহা বুঝিয়াই কহিল, না, দোষের জন্যে নয়, তবে লোকটাকে আমার ভাল লাগে না ব'লে ছাড়িয়ে দিচ্চি। কিন্তু মাইনেটা পুরো মাসের দেবেন।

রাসবিহারীর মুখ পলকের জন্য রাঙ্গা হইয়া উঠিয়াছিল; কিন্তু পলকের মধ্যেই আপনাকে সামলাইয়া লইয়া হাসিয়া কহিলেন, তা হ'লে বিনা দোষে কারো অন্ন মারাটা কি ভাল মা?

বিজয়া তাহার জবাব না দিয়া চুপ করিয়া রহিল দেখিয়া সরকার ভরসা পাইয়া কহিতে গেল—তা হ'লে তাকে—

হাঁ, বিদায় ক'রে দেবেন—আজই। বলিয়া বিজয়া খাতায় মন দিল। সরকার তবুও কিছু একটা প্রত্যাশা করিয়া খানিকক্ষণ অপেক্ষা করিয়া চলিয়া গেলে রাসবিহারী মিনিট-পাঁচেক স্তব্ধভাবেথাকিয়া তাঁহার প্রার্থনার পুনরাবৃত্তি করিয়া কহিলেন,একটু কষ্ট স্বীকার করে না উঠলেই যে নয় মা। পুরানো দলিলগুলো একবার আগাগোড়া বেশ ক'রে পড়া যে চাই-ই।

বিজয়া মুখ না তুলিয়াই কহিল, কেন!

রাসবিহারী গম্ভীর হইয়া কহিলেন, বল্‌লাম বিশেষ কারণ আছে। তবুও বারবার এক কথা বল্‌বার ত আমার সময় নেই বিজয়া।

বিজয়া তাহার খাতার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়াই আস্তে আস্তে কহিল, তা বলেছেন সত্যি; কিন্তু কারণ ত একটাও দেখান নি।

না দেখালে কি তুমি উঠ্‌বে না! বলিয়া কয়েক মুহূর্ত্ত অপেক্ষা করিয়া এবার তিনি ধৈর্য্য হারাইয়া ফেলিলেন, কহিলেন, তার মানে তুমি আমাকে বিশ্বাস কর না?

বিজয়া নিরুত্তর অধোমুখে কাজ করিতে লাগিল—কোন উত্তর দিল না। তাহার এই নীরবতার অর্থ এত সুস্পষ্ট, এত তীক্ষ্ণ যে ক্রোধে রাসবিহারীর মুখ কালো হইয়া উঠিল। তিনি হাতের লাঠিটা মেজেতে ঠুকিয়া বলিলেন, কিসের জন্যে আমাকে তুমি এত বড় অপমান কর্‌তে সাহস কর বিজয়া? কিসের জন্যে তুমি আমাকে অবিশ্বাস কর শুনি?

বিজয়া শান্তকণ্ঠে কহিল, আমাকেও ত আপনি বিশ্বাস করেন না!

আমার পয়সায় আমারি উপর গোয়েন্দা নিযুক্ত কর্‌লে মনের ভাব কি হয় আপনি নিশ্চয় বুঝতে পারেন, এবং তার পর আমার সম্পত্তির মূল দলিল-পত্র হস্তগত করার তাৎপর্য্য যদি আমি আর কিছু ব'লে সন্দেহ করি সে কি অস্বাভাবিক? না সে আপনাকে অপমান করা?

রাসবিহারী একেবারে নির্ব্বাক, স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। তাঁহার এত বড় পাকা চাল কলিকাতায় বিলাসিতার মধ্যে যত্ন-আদরে প্রতিপালিত একটা অনভিজ্ঞ বালিকার কাছে ধরা পড়িতে পারে এ সম্ভাবনা তাঁহার পাকা মাথায় স্থান পায় নাই; এবং ইহাই সে মুখের উপর অসঙ্কোচে নালিশ করিবে—সে ত স্বপ্নের অগোচর।

রাসবিহারী অনেকক্ষণ বিমূঢ়ের মত বসিয়া থাকিয়া আর একবার যুদ্ধের জন্য কোমর বাঁধিয়া দাঁড়াইলেন; এবং এই প্রকৃতির লোকের যাহা চরম অস্ত্র তাহাই তূণীর হইতে বাহির করিয়া এই অসহায় বালিকার প্রতি নির্ম্মমভাবে নিক্ষেপ করিলেন। কহিলেন, বনমালীর মুখ রাখবার জন্যেই এ কাজ করেছি। বন্ধুর কর্ত্তব্য বলেই তোমার চলাফেরার প্রতি আমাকে নজর রাখ্‌তে হয়েচে। একটা অজানা অচেনা হতভাগাকে মাঠের মধ্যে থেকে ধ'রে এনে যে কাল সমস্ত বেলাটা কাটালে:তার মানে কি আমি বুঝতে পারি নে? শুধু কি তাই? সেদিন দুপুর রাত্রি পর্য্যন্ত তার সঙ্গে হাসি-তামাসা গল্প করেও তোমার যথেষ্ট হ'লো না, সে রাত্রে কল্‌কাতায় ফির্‌তে পার্‌লে না। ছল ক'রে তাকে এইখানেই থাক্‌তে হ'লো। এতে তোমার লজ্জা হয় না বটে, কিন্তু আমাদের যে ঘরে-বাইরে মুখ পুড়ে গেল! সমাজে কারও সাম্‌নে মাথা তোল্‌বার যে আর জো রইল না?

কথাটা এত বড় মর্ম্মান্তিক না হইলে হয় ত বিজয়া অপমানে ক্রোধে সঙ্গে সঙ্গেই চীৎকার করিয়া প্রতিবাদ করিত, কিন্তু এ আঘাত যেন তাহাকে অসাড় করিয়া ফেলিল।

রাসবিহারী আড়-চোখে চাহিয়া তাঁহার ব্রহ্মাস্ত্রের প্রচণ্ড মহিমা বিজয়ার রক্তহীন মুখের উপর নিরীক্ষণ করিয়া অত্যন্ত পরিতৃপ্তির সহিত ক্ষণকাল চুপ করিয়া রহিলেন; তারপরে বলিলেন, তবে এগুলো কি ভাল মা, এ সকল নিবারণ করার চেষ্টা করা আমার কাজ নয়?

বিজয়া স্তব্ধ হইয়া আছে দেখিয়া তিনি পুনরায় জোর দিয়া কহিলেন, না, চুপ ক'রে থাক্‌লে হবে না বিজয়া—তোমাকে জবাব দিতে হবে।

তবুও বিজয়া কথা কহিল না, তখন তিনি হাতের লাঠিটা পুনরায় মেজেতে ঠুকিয়া তাড়া দিয়া কহিলেন, না, চুপ ক'রে থাক্‌লে চলবে না। এ সকল গুরুতর ব্যাপার—জবাব দেওয়া চাই।

এতক্ষণে বিজয়া মুখ তুলিয়া চাহিল। তাহার পাংশু ওষ্ঠাধর একবার একটু কাঁপিয়া উঠিল; তারপর ধীরে ধীরে কহিল, ব্যাপার যত গুরুতর হোক্, মিথ্যে কথার আমি কি উত্তর আপনাকে দিতে পারি?

রাসবিহারী তেজের সঙ্গে প্রশ্ন করিলেন, তা হ'লে একে তুমি মিথ্যে কথা ব'লে উড়োতে চাও নাকি?

বিজয়া আবার একটুখানি মৌন থাকিয়া তেমনি মৃদুকণ্ঠে প্রত্যুত্তর দিল—আমি উড়োতে কিছুই চাই নে কাকাবাবু। শুধু এ যে মিথ্যে তাই আপনাকে বল্‌তে চাই; এবং মিথ্যে ব'লে একে আপনি যে নিজেই সকলের চেয়ে বেশি জানেন তাও এই সঙ্গে আপনাকে জানাতে চাই।

রাসবিহারী একেবারে থতমত খাইয়া গেলেন। তিনি প্রথমটার জন্য প্রস্তুত ছিলেন বটে, কিন্তু শেষটার জন্য আদৌ ছিলেন না। কোন অবস্থাতেই যে বিজয়া তাঁহাকে মিথ্যাবাদী এবং দুর্নাম প্রচারকারী বলিয়া তাঁহারি মুখের উপর অভিযোগ করিতে পারে এ তাঁহার কল্পনারও অতীত। তাঁর নিজের কথা আর মুখে যোগাইল না—শুধু বিজয়ার কথাটাই কলের পুতুলের মত আবৃত্তি করিলেন—মিথ্যে কথা ব'লে আমি নিজেই সকলের চেয়ে বেশি জানি?

বিজয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, আপনি গুরুজন—আপনার সঙ্গে এ নিয়ে তর্ক-বিতর্ক কর্‌বার আমার প্রবৃত্তি হয় না। দলিল-পত্র এখন থাক্; মাম্‌লা-মোকদ্দমার আবশ্যক বুঝলে তখন আপনাকে ডেকে পাঠাব, বলিয়া পাশের দরজা দিয়া ভিতরে চলিয়া গেল।

চতুৰ্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ

বিজয়ার সর্ব্বাগ্রে মনে হইয়াছিল, কাল প্রভাতেই সে যেমন করিয়া হোক কলিকাতায় পলাইয়া এই ব্যাধের ফাঁদ হইতে আত্মরক্ষা করিবে। কিন্তু উত্তেজনার প্রথম ধাক্কাটা যখন কাটিয়া গেল, তখন দেখিতে পাইল তাহাতে জালের ফাঁসি যে শুধু বেশি করিয়া চাপিয়া বসিবে তাই নয়, অপবাদের ধুঁয়া সঙ্গে সঙ্গে বহিয়া সেখানকার আকাশ পর্য্যন্ত কলুষিত করিতে বাকি রাখিবে না। তখন কলিকাতার সমাজেই বা সে মুখ দেখাইবে কেমন করিয়া? অথচ এখানেও সে ঘরের বাহির হইতে পারিল না। যদিও নিশ্চয় বুঝিতেছিল রাসবিহারী তাহাকে পরিত্যাগ করিবার জন্য নয়, বরঞ্চ গ্রহণ করিবার অভিপ্রায়েই এই দুর্নামের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, এবং একান্ত নিরাশ না হওয়া পর্য্যন্ত কিছুতেই বাহিরে এ মিথ্যা প্রচার করিবেন না, তবুও দিন-দুই পরে কাছারির গোমস্তা যখন হিসাব সই করাইতে বিজয়ার দর্শন প্রার্থনা করিল তখন সে অসুস্থতার ছুতা করিয়া চাকরকে দিয়া খাতা-পত্র উপরে চাহিয়া আনাইল। আজ নিজের কর্ম্মচারীকেও দেখা দিতে তাহার লজ্জা করিতে লাগিল, পাছে কোন ছিদ্র দিয়া এ কথা তাহার কানে গিয়া থাকে, এবং তাহার চক্ষেও অবজ্ঞা ও উপহাসের দৃষ্টি লুকাইয়া থাকে।

একটা জিনিষ সে যেমন ভয় করিতেছিল তেমনি প্রাণ দিয়া কামনা করিতেছিল—তাহার পিতার পত্র লইয়া নরেন নিজেই উপস্থিত হইবে।

কিন্তু দিন পাঁচ-ছয় পরে সে সমস্যার মীমাংসা হইয়া গেল পিয়নের হাত দিয়া। চিঠি আসিল বটে, কিন্তু সে ডাকে। নরেন নিজে আসিল না। কেন যে সে আসিল না তাহা অনুমান করিতে তাহার মুহূর্ত্ত বিলম্ব হইল না। সে ঠিক এই আশঙ্কাই করিতেছিল পাছে রাসবিহারী কোন ছলে এ কথা নরেনের কর্ণগোচর করিয়া তাহার এ বাটীর পথ রুদ্ধ করিয়া দেন। চিঠি হাতে করিয়া বিজয়া ভাবিতে লাগিল। কিন্তু এত সহজেই যদি এ দিকের পথ তাহার রুদ্ধ হইয়া যায়, এমনি অনায়াসে সেও যদি এই মিথ্যা কলঙ্কের ডালি তাহারি মাথায় তুলিয়া দিয়া সভয়ে সরিয়া দাঁড়ায় তাহা হইলে এ দুর্নামের বোঝা—তা সে যত বড় মিথ্যাই হোক—সে বহিয়া বেড়াইবে কোন অবলম্বনে? তখন এই মিথ্যা ভারই যে পরম সত্যের মত তাহাকে ধূলিসাৎ করিয়া দিবে!

এম্‌নি অভিভূতের মত স্থির হইয়া বসিয়া সে যে কত কি চিন্তা করিতে লাগিল তাহার শেষ নাই। তাহার পরে বহুক্ষণ পরে সে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং এইবার তাহার পরলোকগত পিতৃদেবের হাতের লেখা কাগজ দুটি মাথায় চাপিয়া ধরিয়া ঝর ঝর করিয়া কাঁদিতে লাগিল। বার বার করিয়া চোখ মুছিয়া চিঠি দুটি পড়িতে গেল, বার বার অশ্রুজলে দৃষ্টি ঝাপ্সা হইয়া গেল। অবশেষে অনেক বিলম্বে অনেক যত্নে যখন পড়া শেষ করিল তখন পিতার আন্তরিক বাসনা তাহার কাছে আর অবিদিত রহিল না। এক সময়ে তিনি যে শুধু তাহারি জন্য নরেনকে মানুষ করিয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন এ সত্য একেবারে স্ফটিকের ন্যায় স্বচ্ছ হইয়া গেল; এবং এ কথা আর যাহারি অগোচরে থাকুক, রাসবিহারীর যে ছিল না, তাহাও বুঝিতে অবশিষ্ট রহিল না।

আরও পাঁচ-ছয় দিন কাটিয়া গেলে, একদিন সকালে বিজয়া ঘুম ভাঙিয়া উঠিয়া দেখিল, বাড়িতে রাজ-মজুর লাগিয়াছে। তাহারা ভারা

বাঁধিয়া সমস্ত বাড়িটা চূণকাম করিবার উদ্যোগ করিতেছে। কারণ ভাবিতে গিয়া তাহার অকস্মাৎ সর্ব্বাঙ্গ শিথিল করিয়া মনে পড়িল আগামী পূর্ণিমা তিথির আর মাত্র সাতদিন বাকি।

সারাদিন সতেজে কাজ চলিতে লাগিল; অথচ সে একজন কাহাকেও ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না ইহা কাহার আদেশে হইতেছে কিংবা কেন এ বিষয়ে তাহার মতামত জানা হইল না!

বিকাল-বেলায় আজ অনেক দিন পরে বিজয়া কানাই সিংকে সঙ্গে লইয়া নদীর তীরে বেড়াইতে বাহির হইয়াছিল। হঠাৎ দয়াল আসিয়া উপস্থিত হইলেন; কহিলেন, আমি আজ তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্চি মা!

বিজয়া আশ্চর্য্য হইয়া কারণ জিজ্ঞাসা করায় কহিলেন, আর ত দেরি নেই; নিমন্ত্রণ পত্র ছাপাতে হবে, তোমার বন্ধু-বান্ধবদের সমাদরের সঙ্গে আন্‌বার চেষ্টা করতে হবে—তাই তাঁদের সব নাম ধাম জান্‌তে পার্‌লে—

বিজয়া শক্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, নিমন্ত্রণ পত্র বোধ হয় আমার নামেই ছাপান হবে?

এ বিবাহ যে সুখের নয় দয়াল তাহা মনে মনে জানিতেন। সঙ্কুচিত হইয়া কহিলেন, না মা, তোমার নামে কেন? রাসবিহারীবাবু বর-কন্যা উভয়েরই যখন অভিভাবক, তখন তাঁর নামেই নিমন্ত্রণ করা হবে স্থির হয়েছে।

বিজয়া কহিল, স্থির কি তিনিই করেছেন?

দয়াল ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, হাঁ, তিনিই করেছেন বৈ কি।

বিজয়া কহিল, তবে এও তিনিই স্থির করুন। আমার বন্ধু-বান্ধব কেউ নেই।

দয়াল ইহার উত্তর দিতে পারিলেন না। চলিতে চলিতে কথা হইতেছিল। বিজয়া সহসা প্রশ্ন করিয়া বসিল, যে-চিঠিগুলো আপনি নরেনবাবুকে দিয়েছিলেন সে কি আপনি পড়েছিলেন?

দয়াল বলিলেন, না মা, পরের চিঠি আমি পড়ব কেন। নরেনের পিতার নামে দেখেই আমি বুঝেছিলাম এ যখন তাঁর জিনিষ, তখন তাঁর ছেলের হাতেই দেওয়া উচিত। একবার মনে হয়েছিল বটে, তোমাকে জিজ্ঞেসা করব—কিন্তু কোন দোষ হয়েছে কি মা!

বৃদ্ধকে লজ্জা পাইতে দেখিয়া বিজয়া স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিল, তাঁর বাবার জিনিষ তাঁকে দিয়েছেন এ ত ঠিকই করেছেন। আচ্ছা, তিনি কি এ সম্বন্ধে আপনাকে কিছু বলেন নি?

দয়াল বলিলেন, না, কোন কথাই না। কিন্তু কিছু জানবার থাকলে তাঁকে জিজ্ঞাসা ক'রে আমি কালই তোমাকে বল্‌তে পারি।

বিজয়া বিস্মিত হইয়া কহিল, কালই বল্‌তে পার্‌বেন কেমন ক'রে?

দয়াল কহিলেন, তা বোধ হয় পারি। আজকাল তিনি প্রত্যহই আমাদের ওখানে আসেন কিনা।

বিজয়া শঙ্কিত হইয়া কহিল, আপনার স্ত্রীর অসুখ আবার বেড়েচে, কৈ সে কথা ত আপনি আমাকে বলেন নি!

দয়াল একটু হাসিয়া বলিলেন, না, এখন তিনি বেশ ভালই আছেন। নরেনের চিকিৎসা আর ভগবানের দয়া। বলিয়া তিনি হাত জোড় করিয়া উদ্দেশে প্রণাম করিলেন।

বিজয়ার বিস্ময়ের অবধি রহিল না। সে দয়ালের মুখের দিকে ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া প্রশ্ন করিল, তবে কেন তাঁকে প্রত্যহ আসতে হয়?

দয়াল প্রসন্ন-মুখে কহিতে লাগিলেন, আবশ্যক না থাকলেও জন্মভূমির মায়া কি সহজে কাটে মা! তা ছাড়া, আজকাল নরেনের কাজ-কর্ম্ম কম, সেখানে বন্ধু-বান্ধবও বিশেষ কেউ নেই—তাই সন্ধ্যে-বেলাটা এখানেই কাটিয়ে যান। বিশেষ, আমার স্ত্রী ত তাঁকে একেবারে ছেলের মতোই ভালবাসেন। ভালবাসার ছেলেও বটে। কিন্তু কথায় কথায় যদি

এতদূরেই এসে পড়্‌লে মা, একবার চল না কেন তোমার এ বাড়িতে?

চলুন, বলিয়া বিজয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিতে লাগিল।

দয়াল বলিতে লাগিলেন, আমি ত এমন নির্ম্মল, এমন স্বভাবতঃ ভদ্রলোক আমার এতটা বয়সে এখনো দেখ্‌তে পাই নি। নলিনীর ইচ্ছে সে বি-এ পাশ ক'রে ডাক্তারি পড়ে। এ বিষয়ে তাকে কত উৎসাহ কত সাহায্য যে করেন তার সীমা নেই।

বিজয়া চমকিয়া উঠিল। কলিকাতা হইতে প্রত্যহ এতদূর আসিয়া সন্ধ্যা অতিবাহিত করিবার এই সন্দেহটাই এতক্ষণ তাহার বুকের ভিতরে বিষের মত ফেনাইয়া উঠিতেছিল। দয়াল ফিরিয়া চাহিয়া স্নেহার্দ্রকণ্ঠে কহিলেন, তবে আর গিয়ে কাজ নেই মা—তুমি শ্রান্ত হয়ে পড়েচ।

বিজয়া কহিল, না, চলুন।

তাহার গতির মৃদুতা লক্ষ্য করিয়াই দয়াল শ্রান্তির কথা তুলিয়াছিলেন; কিন্তু তাহার মুখের চেহারা দেখিতে পাইলে এ কথা তিনি মুখে আনিতেও পারিতেন না।

তখন প্রতি পদক্ষেপে যে কঠিন ধরণী বিজয়ার পদতল হইতে সরিয়া যাইতেছিল, এ কথা অনুমান করা দয়ালের পক্ষে অসম্ভব। তাই তিনি পুনরায় নিজের মনেই বলিতে লাগিলেন, নরেনের সাহায্যে এর মধ্যেই নলিনী অনেকগুলো বই শেষ ক'রে ফেলেচে। লেখা-পড়ায় দুজনারই বড় অনুরাগ।

অনেকক্ষণ নিঃশব্দে চলার পরে, বিজয়া প্রাণপণ চেষ্টায় আপনাকে সংযত করিয়া লইয়া ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কি আর কিছু সন্দেহ করেন না।

দয়াল বিশেষ কোনরূপ বিস্ময় প্রকাশ করিলেন না! সহজভাবে জিজ্ঞাসা করছিলেন, কিসের সন্দেহ মা?

এ প্রশ্নের জবাব বিজয়া তৎক্ষণাৎ দিতে পারিল না। তাহার বুক যেন ভাঙিয়া যাইতে লাগিল। শেষে বলিল, আমার মনে হয় নলিনীর সম্বন্ধে তাঁর মনের ভাব স্পষ্ট ক'রে স্বীকার করা উচিত।

দয়াল সায় দিয়া কহিলেন, ঠিক কথা। কিন্তু তার ত এখনো সময় যায় নি মা। বরঞ্চ আমার মনে হয় দুজনের পরিচয় আরও একটু ঘনিষ্ঠ না হওয়া পর্য্যন্ত সহসা কিছু না বলাই উচিত।

বিজয়া বুঝিল, এ প্রশ্ন অপরের মনেও উদয় হইয়াছে। ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া কহিল, কিন্তু নলিনীর পক্ষে ত ক্ষতিকর হ'তে পারে। তাঁর মন স্থির করতে হয় ত সময় লাগবে, কিন্তু ইতিমধ্যে নলিনীর—

সঙ্কোচ ও বেদনায় কথা আর তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল না। কিন্তু দয়াল বোধ করি সমস্যার এই দিক্‌টা তেমন চিন্তা করিয়া দেখেন নাই। সন্দিগ্ধস্বরে বলিলেন, সত্যি কথা। কিন্তু আমার স্ত্রীর কাছে যতদূর শুনেছি, তাতে—কিন্তু তোমাকে ত বলেছি নরেনকে আমরা খুব বিশ্বাস করি। তাঁর দ্বারা যে কারও কোন ক্ষতি হ'তে পারে, তিনিও যে ভুলেও কারও প্রতি অন্যায় করতে পারেন এ ত আমি ভাবতে পারি নে।

তিনি ভাবিতে নাই পারুন, কিন্তু তবুও ঠিক সেই সময়েই অন্যায় যে কোথায় এবং কত দূর পর্য্যন্ত পৌঁছিতেছিল সে শুধু অন্তর্যামীই জানিতেছিলেন।

উভয়ে যখন দয়ালের বসিবার ঘরে প্রবেশ করিলেন তখন সন্ধ্যার ছায়া ঘনাইয়া আসিয়াছে। একটা টেবিলের দুদিকে দুখানা চেয়ারে বসিয়া নরেন ও নলিনী। সম্মুখে খোলা বই। অক্ষর অস্পষ্ট হইয়া উঠায় পড়া ছাড়িয়া তখন ধীরে ধীরে আলোচনা সুরু হইয়াছিল। নলিনী এই দিকে চাহিয়া বসিয়াছিল, সে-ই বিজয়াকে প্রথমে দেখিতে পাইয়া

কলকণ্ঠে সংবর্দ্ধনা করিল। কিন্তু বিজয়ার মুখ বেদনায় যে বিবর্ণ হইয়া গেল—তাহা সন্ধ্যার ম্লান আলোকে তাহার চোখে পড়িল না। নরেন তাড়াতাড়ি চৌকি ছাড়িয়া উঠিয়া নমস্কার করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ভাল আছেন?

বিজয়া নমস্কারও ফিরাইয়া দিল না, প্রশ্নেরও উত্তর দিল না। যেন দেখিতেই পায় নাই এম্‌নি ভাবে তাহার প্রতি সম্পূর্ণ পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইয়া নলিনীকে কহিল, কৈ আপনি ত আর একদিনও গেলেন না?

নরেন সুমুখে আসিয়া হাসিমুখে কহিল, আর আমাকে বুঝি চিন্‌তেও পার্‌লেন না?

বিজয়া শান্ত অবজ্ঞার সহিত জবাব দিল, চিন্‌তে পার্‌লেই চেনা দরকার না কি!

নলিনীকে কহিল, চলুন আপনার মামিমার সঙ্গে আলাপ ক'রে আসি। বলিয়া পলকমাত্র এ দিকে আর একবার দৃষ্টিপাত করিয়া তাহাকে এক প্রকার ঠেলিয়া লইয়া চলিয়া গেল। নলিনী সিঁড়ির কয়েক ধাপ উপর হইতে ডাকিয়া কহিল, কিন্তু চা না খেয়ে পালাবেন না নরেনবাবু।

নরেন ইহারও জবাব দিতে পারিল না—বিস্ময়ে, অপমানে একেবারে কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, বৃদ্ধ দয়াল তাহার এই অপ্রত্যাশিত লজ্জার অংশ লইবার জন্য বিরস-মুখে সেইখানেই নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। কিন্তু তবুও কেমন করিয়া যেন তাঁহার কেবলি সন্দেহ হইতে লাগিল যাহা বাহিরে প্রকাশ পাইল ইহা ঠিক সেই বস্তুই নয়—এই আকারণ অবমাননার অন্তরালে দৃষ্টির আড়ালে যাহা রহিয়া গেল তাহা আর যাহাই হোক উপেক্ষা অবহেলা নয়।

কিছু পরে চায়ের জন্য উপরে ডাক পড়িলে আজ নরেন দয়ালের

অনুরোধ এড়াইয়া নিচেই রহিয়া গেল। কিন্তু তাহাকে একাকী ফেলিয়া দয়াল উপরে যাইতে পারিতেছেন না দেখিয়া তৎক্ষণাৎ সহাস্যে কহিল, আমি ঘরের লোক, আমার কথা ভাববেন না দয়ালবাবু। কিন্তু আপনার মান্য অতিথিটির সম্মান রাখা আবশ্যক। আপনি শীঘ্র যান।

দয়াল দুঃখিত এবং লজ্জিতভাবে উপরে যাইবার উপক্রম করিয়া কহিলেন, তা হ'লে তুমি কি একটু বস্‌বে?

ভৃত্য আলো দিয়া গিয়াছিল। নরেন খোলা বইটা কাছে টানিয়া লইয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিল, আজ্ঞে হাঁ, বস্‌ব বৈ কি!

প্রায় আধঘণ্টা পরে আবার তিন জনে নিচে নামিয়া আসিলে নরেন বই রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। আজ না থাকিয়া চলিয়া গেলেই বোধ করি ইহারা আরাম অনুভব করিতেন, কারণ এই তাহার একাকী অপেক্ষা করাটাই সকলকে একসঙ্গে যেন লজ্জা ও কুণ্ঠার কশাঘাত করিল।

নলিনী সলজ্জ মৃদুকণ্ঠে কহিল, আপনার চা নিচে আনতে বলে দিয়েচে—এলো বলে নরেনবাবু!

কিন্তু বিজয়া তাহাকে কোন প্রকার সম্ভাষণ না করিয়া, এমন কি দৃক্‌পাত পর্য্যন্ত না করিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল। কানাই সিং দ্বারের কাছে বসিয়াছিল, লাঠি হাতে করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। বিজয়া বাহিরে আসিয়া দেখিল, আকাশে মেঘের আভাস পর্য্যন্ত নাই—নবমীর চাঁদ ঠিক সুমুখেই স্থির হইয়া আছে। তাহার মনে হইতে লাগিল পদতলের তৃণরাজি হইতে আরম্ভ করিয়া কাছে দূরে যাহা কিছু দেখা যায়—আকাশ প্রান্তর, গ্রামান্তরের বনরেখা, নদী, জল সমস্তই এই নিঃশব্দ জ্যোৎস্নায় দাঁড়াইয়া ঝিম্ ঝিম্ করিতেছে। কাহারও সহিত কাহারও সম্বন্ধ নাই—পরিচয় নাই—কে যেন তাহাদের ঘুমের মধ্যে স্বতন্ত্র জগৎ হইতে ছিঁড়িয়া আনিয়া যেখানে সেখানে ফেলিয়া গিয়াছে—এখন তন্দ্রা ভাঙিয়া তাহারা

পরস্পরের অজানা মুখের প্রতি অবাক হইয়া তাকাইয়া আছে। চলিতে চলিতে তাহার চোখ দিয়া অবিরল জল পড়িতে লাগিল এবং মুছিতে মুছিতে বার বার বলিতে লাগিল, আমি আর পারি না, আমি আর পারি না।

বাড়ি আসিতেই খবর পাইল রাসবিহারী কি জন্য সন্ধ্যা হইতে বাহিরের ঘরে অপেক্ষা করিয়া আছেন। শুনিতেই তাহার চিত্ত তিক্ত হইয়া উঠিল, এবং কোন কথা না কহিয়া পাশের সিঁড়ি দিয়া উপরে নিজের ঘরে চলিয়া গেল। কিন্তু ইহাও তাহার অবিদিত ছিল না যে শত বিলম্বেও এই পরম সহিষ্ণু লোকটির ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিবে না। তিনি প্রতীক্ষা করিয়া যখন আছেন, তখন রাত্রি যত বেশি হোক সাক্ষাৎ না করিয়া কোন মতেই নড়িবেন না।

অনতিকাল মধ্যেই দ্বারের উপর দাঁড়াইয়া পরেশ জানাইয়া দিল বড়বাবু আসিতেছেন, এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার চটিজুতার ও লাঠির শব্দ যুগপৎ শুনিতে পাওয়া গেল।

বিজয়া কহিল, আসুন।

ঘরে প্রবেশ করিয়া রাসবিহারী চৌকিতে উপবেশন করিয়া বলিলেন, আমি তাই এতক্ষণ এদের বল্‌ছিলাম যে এতগুলো চাকর-বাকরের মধ্যে এ হুঁস্‌ কারও হলো না যে বাড়ি থেকে ছুটো লণ্ঠন নিয়ে যায়! দয়ালেরও এ ভয় হওয়া উচিত ছিল যে মাঠের মধ্যে শুধু জ্যোৎস্নার আলোয় নির্ভর না করে সঙ্গে একটা আলো দেওয়া প্রয়োজন! তাই ভাবি ভগবান! এ সংসারে আত্মীয়-পরে কি প্রভেদটাই তুমি ক'রে রেখেচ! বলিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস মোচন করিলেন। কিন্তু বিজয়া কিছুই কহিল না। তখন রাসবিহারী একবার কাসিয়া, একটু ইতস্ততঃ করিয়া পকেট হইতে একখানা কাগজ বাহির করিয়া বলিলেন, যা কর্‌বার সবই আমি ক'রে রেখেচি; শুধু তোমার নামটা একটু লিখে দিতে হবে মা,

এটা আবার কাল্‌কেই পাঠিয়ে দেওয়া চাই। বলিয়া কাগজখানা বিজয়ার হাতে গুঁজিয়া দিলেন। বিজয়া দৃষ্টিপাতমাত্রই বুঝিল ইহা তাহাদের ব্রাহ্মবিবাহ আইনমতে রেজেষ্ট্রি করিবার আবশ্যক দলিল। ছাপা এবং হাতের লেখা আগাগোড়া দুই-তিনবার করিয়া পাঠ করিয়া অবশেষে সে মুখ তুলিল। বেশি সময় যায় নাই, কিন্তু এইটুকু সময়ের মধ্যেই তাহার মনের মধ্যে এক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিল। তাহার এতক্ষণের এতবড় বেদনা অকস্মাৎ কি একপ্রকার কঠিন ঔদাসীন্য ও নিদারুণ বিতৃষ্ণায় রূপান্তরিত হইয়া দেখা দিল। তাহার মনে হইল জগতের সমস্ত পুরুষ একছাঁচে ঢালা। রাসবিহারী, দয়াল, বিলাস, নরেন—আসলে কাহারো সঙ্গে কাহারো প্রভেদ নাই। শুধু বুদ্ধি ও অবস্থার তারতম্যে যা কিছু প্রভেদ বাহিরে প্রকাশ পায়—এইমাত্র; নহিলে নিজের সুখ ও সুবিধার কাছে নীচতার, কৃতঘ্নতায়, নির্ম্মম নিষ্ঠুরতায় নারীর পক্ষে ইহারা সকলেই সমান। আজ দয়ালের আচরণটাই তাহাকে সব চেয়ে বেশি বাজিয়াছিল। কারণ কেমন করিয়া যেন তাহার অসংশয়ে বিশ্বাস জন্মিয়াছে, তাহাদের হৃদয়ের একাগ্র কামনার জিনিসটি ইনি জানিতেন। অথচ এই দয়ালের জন্য সে কি না করিয়াছে! সমস্ত হৃদয় দিয়া শ্রদ্ধা করিয়াছে, ভালবাসিয়াছে, একান্ত আপনার ভাবিয়াছে। কিন্তু নিজের ভাগিনেয়ীর কল্যাণের পার্শ্বে সমস্ত জানিয়া শুনিয়াও, তিনি এই শ্রদ্ধা স্নেহের কোন মর্য্যাদাই রাখিলেন না। তাঁহার চোখের নিচেই যখন দিনের পর দিন এক অনাত্মীয়া রমণীর মর্ম্মান্তিক দুঃখের পথ প্রস্তুত হইতেছিল তখন কতটুকু দ্বিধা, কতটুকু করুণা তাঁহার মনে জাগিয়াছিল! তবে রাসবিহারীর সহিত মূলতঃ তাঁহার পার্থক্য কোন্ খানে এবং কতটুকু? আর নরেনের কথাটা সে গোড়া হইতেই চিন্তার বাহিরে ঠেলিয়া রাখিয়াছিল, এখনও তাহাকে বিচার করার ভান

করিল না। শুধু এই কথাটাই এখন সে আপনাকে আপনি বারংবার বলিতে লাগিল, যদি সকলেই সমান, তবে বিলাসের বিরুদ্ধেই বা তাহার বিদ্বেষ কিসের? বরঞ্চ সে-ই ত সব চেয়ে নির্দ্দোষ? সে-ই ত অপরাধ করিয়াছে সর্ব্বাপেক্ষা কম! বস্তুতঃ তাহারই ত শুধু বাক্যে এবং ব্যবহারে সামঞ্জস্য দেখা গেল। তাহার যা কিছু অপরাধ সে ত শুধু তাহারই জন্য। একটু স্থির থাকিয়া বিজয়া আপনাকে আপনি পুনরায় বুঝাইল যে বিলাসের ভালবাসা সত্য এবং সজীব বলিয়াই সে নীরবে সহিতে পারে নাই, বিরুদ্ধ শক্তিকে সর্ব্বাঙ্গে হাতিয়ার বাঁধিয়া বাধা দিতে রুখিয়া দাঁড়াইয়াছে। যাও বলিতেই শস্তা ভদ্রতা বাঁচাইয়া অভিমানভরে চলিয়া যায় নাই! এই যদি অপরাধ, তবে শাস্তি দিবার অধিকার আর যাহারই থাক, তাহার নাই! আরও একটা ব্যাপার মনে পড়িল, সে এই কঠিন বাস্তব সংসার। সে দিক্ দিয়া চিন্তা করিলে এই বিলাসের যোগ্যতাই ত সকলের চেয়ে বড় দেখা যায়! সেই অপদার্থ নরেনের তুলনায় তাহাকে ত কোন মতেই উপেক্ষার পাত্র বলা সাজে না।

কিন্তু রাসবিহারী তাহার গম্ভীর, নির্ব্বাক্ মুখের প্রতি চাহিয়া অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন। কহিলেন, তা হ'লে মা—এ ঘরে কালি-কলম আছে, না নিচে থেকে আন্‌তে বলে দেব?

বিজয়া চমকিয়া চাহিল। অতীতের কুৎসিত, কদাকার স্মৃতির উপরে তাহার চিন্তার ডোর ধীরে ধীরে একখানি সূক্ষ্ম জাল বুনিতে আরম্ভ করিয়াছিল, এই স্বার্থান্ধ অন্ধের নিষ্ঠুর ব্যগ্রতা ছুরির মত পড়িয়া তাহাকে নিমেষে ছিন্নভিন্ন করিয়া আগাগোড়া অনাবৃত করিয়া দিল; এবং পরক্ষণেই বিজয়া একেবারে মরিয়ার মত নির্দ্দয় হইয়া কহিল, আচ্ছা জিজ্ঞাসা করি কাকাবাবু আপনার কি এই মত যে, পাপ যত বড়ই হোক্, টাকার তলায় সমস্ত চাপা পড়ে যায়?

রাসবিহারী প্রশ্নের তাৎপর্য্য ঠিক ধরিতে না পারিয়া থতমত খাইয়া শুধু কহিলেন, কেন, কেন মা?

বিজয়া অবিচলিত দৃঢ়স্বরে বলিল, নইলে আমার অতবড় পাপটাকেও উপেক্ষা ক'রে কি আপনি আমাকে গ্রহণ করতে চাইতেন?

রাসবিহারী লজ্জায় ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। হতবুদ্ধির মত বলিলেন, সে ত মিথ্যে কথা। অতিবড় শত্রুও ত তোমাকে ও অপবাদ দিতে পারে না মা!

বিজয়া কহিল, শত্রু হয় ত পারে না। কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি বিলাসবাবু কি আমাকে শ্রদ্ধার চোখে দেখতে পার্‌বেন?

রাসবিহারী কহিলেন, শ্রদ্ধার চোখে দেখতে পার্‌বে না? তোমাকে? বিলাস? আচ্ছা, বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিলেন, বিলাস! বিলাস!

বিলাস নিকটে কোথাও বোধ করি প্রতীক্ষা করিতেছিল ভিতরে আসিয়া দাঁড়াইল। রাসবিহারী বলিয়া উঠিলেন, শোন কথা বিলাস। আমার বিজয়া মা বলচেন তুমি কি তাঁকে শ্রদ্ধার চোখে দেখতে পারবে? শোন একবার—

কিন্তু বিলাস সহসা কোন উত্তরই দিতে পারিল না—প্রশ্নটা যেন সে বুঝিতেই পারিল না, এম্‌নি ভাবে শুধু চাহিয়া রহিল।

বিজয়া কহিল, সেদিন কাকাবাবু বাড়ির চাকর-বাকরদের জিজ্ঞাসা করে আমাকে এসে বলেছিলেন যে, আমি অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত নিভৃতে নরেনবাবুর সঙ্গে আমোদ-আহ্লাদ করেও তৃপ্ত হই নি; অবশেষে তিনি ট্রেন না পাবার অছিলায় সে রাত্রিটা এইখানে কাটিয়েই সকাল-বেলা চলে গিয়েছিলেন। এই অবস্থায়—

কথাটা রাসবিহারীর উচ্চ-কণ্ঠে চাপা পড়িয়া গেল। তিনি বার বার বলিতে লাগিলেন, কখ্‌খনো না! কখখনো না! এ যে অসম্ভব! এ যে ঘোর মিথ্যা—এ যে একেবারেই—ইত্যাদি ইত্যাদি।

বিলাসের মুখ কালো হইয়া উঠিল। সে কহিল, না, আমি শুনি নি।

রাসবিহারী আবার চেঁচাইতে লাগিলেন, কেমন করে শুনবে বিলাস—এ যে ভয়ানক মিথ্যে! এ যে দারুণ—তাই আমি দরওয়ান ব্যাটাকে—তুমি দেখো দিকি, পরেশ ছোঁড়াটাকে আমি কি রকম শাস্তি দিই! আমি—

বিলাস কহিল, পৃথিবী-শুদ্ধ লোকে যদি এ কথার সাক্ষ্য দিত, তবুও বিশ্বাস কর্‌তাম না।

বিজয়া কঠিন হইয়া প্রশ্ন করিল, কেন কর্‌তেন না? সে কি আমার বিষয়ের জন্যে?

রাসবিহারী এই কথার সূত্র ধরিয়া পুনরায় বকিতে সুরু করিয়াছিলেন; কিন্তু ছেলের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সহসা থামিয়া গেলেন।

বিলাসের দুই চক্ষু প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল, কিন্তু তাহার কণ্ঠস্বরে লেশমাত্র উচ্ছ্বাস বা উগ্রতা প্রকাশ পাইল না। শুধু শান্ত, স্থির-স্বরে জবাব দিল, না। তোমার বিষয়ের উপর আমাদের লেশ মাত্র লোভ নেই।

সমস্ত কক্ষটা নিস্তব্ধ হইয়া রহিল; এবং এই নীরবতার ভিতর দিয়াই এতক্ষণে একই সঙ্গে সকলের যেন সমস্ত ব্যাপারটার কদর্য্য শ্রীহীনতা চোখে পড়িয়া গেল। এ যেন হাটের মধ্যে একটা বেচা-কেনার পণ্য লইয়া দুই পক্ষে তীব্র কঠোর দরদস্তর চলিতেছিল। যাহাতে লজ্জা, সরম, শ্রী, শোভার কিছুমাত্র অবকাশ ছিল না—শুধু দুটো মানুষ একটা উলঙ্গ স্বার্থের দুই দিকে দৃঢ়-মুষ্টিতে চাপিয়া ধরিয়া পরস্পরের কাছে ছিনাইয়া লইবার জন্যে প্রাণপণে টানা-হেঁচড়া করিতেছিল।

রাসবিহারী তাঁহার বহু ক্লেশার্জ্জিত পরিণত বয়সের প্রশান্ত গাম্ভীর্য্য বিসর্জ্জন দিয়া যে ভাবে একটা ইতরের মত গণ্ডগোল চেঁচামেচি করিতেছিলেন, বিলাসের ভাষা ও সংযমের সম্মুখে সে ত্রুটি তাঁহাকেও যেমন বাজিল, বিজয়াও নিজের একান্ত লজ্জাহীন প্রগল্‌ভতার জন্যে মর্ম্মে মরিয়া

গেল। বিপদ যত গুরুতরই হোক, কোন ভদ্রমহিলাই যে এতদূর আত্ম-বিস্মৃত হইয়া আপনার চরিত্রকে মীমাংসার বিষয়ীভূত করিয়া পুরুষের সহিত এমন করিয়া মর্য্যাদাহীন বাদ-বিতণ্ডায় প্রবৃত্ত হইতে পারে, ক্ষণকালের জন্য এ যেন একটা অসম্ভব ব্যাপার বলিয়া তাহার বোধ হইল। মনে হইল দাম্পত্য-জীবনের যত কিছু মাধুর্য্য, যত কিছু পবিত্রতা আছে, সমস্তই যেন তাহার জন্য একেবারে উদ্ঘাটিত হইয়া ধূলায় লুটাইয়া পড়িল।

ঘরের নিবিড় নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া বিলাসই আবার কথা কহিল। বলিল, বিজয়া, বাবা যাই করুন, যাই বলুন, আমরা তাঁকে বুঝ্‌তে পারি না পারি—কিন্তু এই কথাটা আমাদের কোন মতে বিস্মৃত হওয়া উচিত নয়—যিনি ব্রহ্ম-পদে আত্ম-সমর্পণ করেছেন, তিনি কখনো অন্যায় কর্‌তে পারেন না। আমি বল্‌চি তোমাকে, তোমাকে ছাড়া তোমার বিষয়-সম্পত্তির প্রতি আমাদের লেশমাত্র স্পৃহা নাই।

বিজয়া তাহার পাংশু মুখ ও মলিন চোখ দুটি বিলাসের মুখের উপর ক্ষণকাল স্থাপিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, সত্যি বল্‌চেন?

বিলাস অগ্রসর হইয়া আসিয়া বিজয়ার ডান হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া কহিল, আমার মধ্যে যদি কোন সত্য থাকে বিজয়া, আজ তা হ'লে আমি তোমাদের কাছে সত্য কথাই বল্‌চি!

শুধু মুহূর্ত্তকাল উভয়ে এইভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া বিজয়া আস্তে আস্তে নিজের হাতখানি মুক্ত করিয়া লইয়া টেবিলের কাছে আসিয়া কলম তুলিয়া লইল। পলকের জন্য হয় ত একবার দ্বিধা করিল, হয় ত করিল না—কিছুই নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না—কিন্তু পরক্ষণেই বড় বড় অক্ষরে নিজের নাম সই করিয়া দিয়া কাগজখানি রাসবিহারীর হাতে আনিয়া দিয়া কহিল, এই নিন।

রাসবিহারী দলিলখানি ভাঁজ করিয়া পকেটে রাখিলেন, এবং উঠিয়া

দাঁড়াইয়া বনমালীর শোকে অনেক অশ্রু ব্যয় করিয়া, এবং নিরাকার পরব্রহ্মের অসীম করুণার বিস্তর গুণগান করিয়া, রাত্রি হইতেছে বলিয়া প্রস্থান করিলেন।

পিতৃদেব চলিয়া গেলে, বিলাস আর একবার গম্ভীর এবং কাষ্ঠের মত শক্ত হইয়া দাঁড়াইয়া বলিল, আমি জানি, আমাকে তুমি ভালবাস না। কিন্তু সাধারণ লোকের মত আমিও যদি সেই ভালোবাসাকেই সকলের ঊর্দ্ধে স্থান দিতাম, তা হ'লে আজ মুক্ত-কণ্ঠে বলে যেতাম—বিজয়া! তুমি যাকে ভালবেসেচ, তাকেই বরণ কর! আমার মধ্যে সে শক্তি, সে উদারতা, সে ত্যাগ আছে! বাবার কাছে আমি আজীবন মিথ্যা শিক্ষা পেয়ে আসি নি!

মুহূর্ত্তকাল স্তব্ধ থাকিয়া পুনশ্চ কহিতে লাগিল, কিন্তু একটা সকাম রূপ-তৃষ্ণা যাকে ভালবাসা ব'লে মানুষ ভুল করে, সেই কি ব্রাহ্ম-কুমার-কুমারীর বিবাহের চরম লক্ষ্য? না, তা কিছুতেই নয়, কিছুতেই হ'তে পারে না! এর বিরাট উদ্দেশ্য সত্য! মুক্তি! পরব্রহ্ম-পদে যুগ্ম-আত্মার একান্ত আত্ম-সমর্পণ! আমি বল্‌চি তোমাকে, একদিন আমার কাছে এ সত্য তুমি বুঝবেই বুঝবে! এই নরেন যখন আসে নি, তখনকার কথাগুলা একবার স্মরণ করে দেখ বিজয়া!

কি একটা বলিবার জন্য বিজয়া মুখ তুলিল, কিন্তু তাহার ওষ্ঠাধর কাঁপিয়া উঠিয়া প্রবল বাষ্পোচ্ছ্বাসে বাক্‌রোধ হইয়া গেল—মুখ দিয়া কোন কথাই বাহির হইল না। সে শুধু কেবল হাত দুটি কপালে তুলিয়া একটা নমস্কার করিয়াই পাশের দরজা দিয়া দ্রুতবেগে পলায়ন করিল।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

নিদারুণ সংশয়ের বেড়া-আগুনের মধ্যে বিজয়ার চিত্ত যে কতদূর পীড়িত এবং উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা আপনাকে চূড়ান্তভাবে সমর্পণ করিয়া না দেওয়া পর্য্যন্ত সে ঠিক মত বুঝিতে পারে নাই। আজ সকালে ঘুম ভাঙিয়াই বুঝিল, তাহার মন খুব শান্ত হইয়া গিয়াছে। কারণ মনের মধ্যে চাঞ্চল্যের আভাসটুকুও খুঁজিয়া পাইল না। বাহিরে চাহিতে মনে হইল, সমস্তটা আকাশ যেন শ্রাবণ-প্রভাতের মত ধূসর মেঘের ভারে পৃথিবীর উপর হুম্‌ড়ি খাইয়া পড়িয়াছে। এমন দিনে শয্যা ত্যাগ করা না-করা তাহার সমান বলিয়া বোধ হইল, এবং কেন যে অন্যান্য দিন সকালে ঘুম ভাঙিতে সামান্য বেলা হইলেও অন্তঃকরণ ব্যথিত লজ্জিত হইয়া উঠিত—মনে হইত, অনেক সময় নষ্ট হইয়া গিয়াছে, আজ তাহা ভাবিয়াই পাইল না। তাহার এমন কি কাজ আছে যে, দু-একঘণ্টা বিছানায় পড়িয়া থাকিলে চলে না! বাটিতে দাসদাসী ভরা, বৃহৎ জমিদারী সুশৃঙ্খলায় চলিতেছে, তাহার সমস্ত ভবিষ্যৎ জীবন যদি এম্‌নি আরামে, এম্‌নি শান্তিতে কাটিয়া যায় ত তার চেয়ে আর ভাল জিনিষ কি আছে? জানালা দিয়া চাহিয়া দেখিল, গাছতলার সবুজ রঙটা পর্য্যন্ত আজ কি এক রকম বদ্‌লাইয়া গিয়া, তাহার পাতাগুলা পর্য্যন্ত সব স্থির গম্ভীর হইয়া উঠিয়াছে। কলহ-বিবাদ, তর্ক-বিতর্ক অশান্তি-উপদ্রব বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কোথাও আর কিছু নাই—একটা রাত্রির মধ্যেই সমস্ত যেন একেবারে মুনি ঋষির তপোবন হইয়া গিয়াছে।

হৃদয়-জোড়া এই চরম অবসাদকে শান্তি কল্পনা করিয়া বিজয়া পক্ষাঘাত-গ্রস্তের মত হয় ত আরও বহুক্ষণ বিছানায় পড়িয়া থাকিতে পারিত; কিন্তু পরেশের মা আসিয়া দ্বার-প্রান্ত হইতে শান্তিভঙ্গ করিয়া দিল। যে লোক

প্রত্যূষেই শয্যা ত্যাগ করে, তাহার পক্ষে এতখানি বেলায়, সে উৎকণ্ঠিত-চিত্তে বারংবার ডাকাডাকি করিয়া কবাট খুলিয়া তবে ছাড়িল।

হাত-মুখ ধুইয়া কাপড় ছাড়িয়া প্রস্তুত হইয়া, বিজয়া নিচে নামিতেছিল; শুনিল বাহিরে রাসবিহারী আজ স্বয়ং আসিয়া জন-মজুরদের কার্য্যের তত্ত্বাবধান করিতেছেন। মাত্র দুটি দিন আর বাকি, এইটুকু সময়ে সমস্ত বাড়িটাকে মাজিয়া-ঘষিয়া একেবারে নূতন করিয়া তুলিতে হইবে।

বিজয়া একটু পূর্ব্বেই ভাবিয়াছিল, গতরাত্রে যে দুরূহ সমস্যার শেষ এবং চরম নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে, কোনও কারণে কাহারও দ্বারা যাহার অন্যথা ঘটিতে পারে না, তাহার ন্যায়-অন্যায়, ভাল-মন্দ লইয়া আর সে মনে মনেও কখনো বিতর্ক করিবে না। তাহা মঙ্গলময়ের ইচ্ছায় মঙ্গলের জন্যেই হইয়াছে, এ বিশ্বাসে সন্দেহের ছায়াটুকুও আর পড়িতে দিবে না। কিন্তু সহসা দেখিতে পাইল, তাহা সম্ভব নয়। রাসবিহারী নিচে আছেন নামিলেই মুখোমুখী সাক্ষাৎ হইয়া যাইবে, ইহা মনে করিতেই তাহার সর্ব্বাঙ্গ বিমুখ হইয়া আপনিই সিঁড়ি হইতে ফিরিয়া আসিল। বহুক্ষণ ধরিয়া বারান্দায় পায়চারি করিয়াও যখন সময় কাটিতে চাহিল না, তখন অকস্মাৎ তাহার বাল্যবন্ধুদের কথা মনে পড়িল। বহুকাল কাহারও সহিত দেখা-সাক্ষাৎ নাই, চিঠি-পত্রও বন্ধ ছিল, আজ তাহাদিগকেই স্মরণ করিয়া সে কয়েকখানা পত্র লিখিবার জন্য তাহার পড়িবার ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল। মনের মধ্যে তাহার কত না বেদনা সঞ্চিত হইয়াছিল। চিঠির মধ্যে দিয়া তাহাদিগকেই মুক্তি দিতে গিয়া সে দেখিতে দেখিতে একবারে মগ্ন হইয়া গেল। কেমন করিয়া যে সময় কাটিল, কত যে অশ্রু ঝরিয়া পড়িল, তাহার কিছুই খেয়াল ছিল না। এমনি সময়ে পরেশের মা দ্বারের কাছে আসিয়া কহিল, বেলা যে একটা বেজে গেল দিদিমণি, খাবে না?

ঘড়ির প্রতি চাহিয়া পুনশ্চ লেখায় মনঃসংযোগ করিতে যাইতেছিল,

পরেশের মা সলজ্জ মৃদুকণ্ঠে কহিল, ও মা, ডাক্তারবাবু আস্‌চেন যে! বলিয়াই তাড়াতাড়ি সরিয়া গেল। বিজয়া চমকিয়া মুখ ফিরাইয়া দেখিল, ঠিক সোজা বারান্দার অপর প্রান্তে পরেশের পিছনে নরেন আসিতেছে।

ইতিপূর্ব্বে আরও কয়েকবার সে উপরে আসিলেও নিজের ইচ্ছায় এমন বিনা সংবাদে উঠিয়া আসিতে পারে, ইহা বিজয়া ভাবিতেও পারিত না। তাহার মুখ শুষ্ক, বড় বড় রুক্ষ চুল এলো-মেলো; কিন্তু সে ঘরে পা দিয়াই যখন বলিয়া উঠিল, সেদিন আমাকে চিন্‌তে চান্ নি কেন, বলুন ত? বলিয়া একটা চৌকি অধিকার করিয়া বসিল, তখন তাহার মুখে, তাহার কণ্ঠস্বরে, তাহার সর্ব্বদেহে হৃদয়-ভারাক্রান্ত ক্লান্তি এমন করিয়াই আত্ম-প্রকাশ করিল যে, বিজয়া জবাব দিবে কি, দুর্ব্বিসহ বেদনায় একেবারে চমকিয়া গেল। উৎকণ্ঠিত ব্যগ্রতায় উঠিয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনার কি হয়েছে নরেনবাবু? কোন অসুখ করে নি ত?

নরেন ঘাড় নাড়িয়া কহিল, না, সেরে গেছে। হয়েও ছিল সামান্য একটু জ্বর, কিন্তু তাতেই হঠাৎ এমন দুর্ব্বল ক'রে ফেলেছিল যে, আগে আস্‌তে পারি নি—কিন্তু সেদিন দোষটা কি করেছিলাম, আজ বলুন ত?

পরেশ দাঁড়াইয়া ছিল; বিজয়া তাহাকে কহিল, তোর মাকে শীগ্‌গির কিছু খাবার আন্‌তে বল্ গে যা পরেশ। নরেনকে কহিল, সকাল থেকে কিছু খাওয়া হয় নি বোধ করি?

না; কিন্তু তার জন্যে আমি ব্যস্ত হই নি।

কিন্তু আমি ব্যস্ত হয়েচি, বলিয়া বিজয়া পরেশের পিছু পিছু নিজেও নিচে চলিয়া গেল।

খানিক পরে সে খাবারের থালার উপর একবাটী গরম দুধ লইয়া নিজেই উপস্থিত হইল এবং নিঃশব্দে অতিথির সম্মুখে ধরিয়া দিল। আহারে মন দিয়া নরেন সহাস্যে কহিল, আপনি একটি অদ্ভুত লোক। পরের

বাড়িতে চিন্‌তেও চান্ না, এবং নিজের বাড়িতে এত বেশি চেনেন যে, সে এক আশ্চর্য্য ব্যাপার। সে দিনের কাণ্ড দেখে ভাবলুম, খবর দিলে হয় ত দেখাই করবেন না, তাই বিনা সংবাদেই পরেশের সঙ্গে এসে আপনাকে ধরেছি। এখন দেখ্‌ছি, তাতে ঠকি নি।

বিজয়া কোন কথাই কহিল না। নরেন নিজেও একটু মৌন থাকিয়া বলিতে লাগিল, এই সামান্য জ্বর, কিন্তু এত নির্জ্জীব ক'রে ফেলেছে যে আমি আপনিই আশ্চর্য্য হয়ে গেছি। আপনাদের সঙ্গে আবার শীঘ্র দেখা হবার সম্ভাবনা থাক্‌লে আজ হয় ত আস্‌তাম না। এই পথটা আসতে আমার সত্যিই ভারি কষ্ট হয়েছে।

বিজয়া তেমনি নিঃশব্দে রহিল; বোধ করি সে কথাটা ঠিক বুঝিতেও পারিল না। নরেন দুধের বাটিটা নিঃশেষ করিয়া রাখিয়া দিয়া কহিল, আপনারা বোধ করি শোনেন নি যে, আমি এখানকার চাকরী ছেড়ে দিয়েছি। আমার আজকে তাড়াতাড়ি আস্‌বার এও একটা বড় কারণ, বলিয়া পকেট হইতে একখানা লাল রঙের চিঠির কাগজ বাহির করিয়া কহিল, আপনার বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্র আমি পেয়েছি। কিন্তু দেখে যাবার সৌভাগ্য আমার হবে না। সেই দিন সকালেই আমাদের জাহাজ করাচি থেকে ছাড়্‌বে।

বিজয়া ভীত হইয়া বলিল, করাচি থেকে! আপনি কোথায় যাচ্ছেন!

নরেন কহিল, সাউথ আফ্রিকায়। পশ্চিমেও একটা যোগাড় হয়েছিল বটে, কিন্তু চাক্‌রী যখন কর্‌তেই হবে, তখন বড় দেখে করাই ভাল। আমার পক্ষে পাঞ্জাবও যা, কেপ-কলোনিও ত তাই। কি বলেন? হয় ত আমাদের আর কখনও দেখাই হবে না।

শেষের কথাগুলা বোধ করি বিজয়ার কানেও গেল না। সে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন-কণ্ঠে প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করিতে লাগিল, নলিনী কি রাজী হয়েছেন?

হলেও বা আপনি এত শীঘ্র কি ক'রে যেতে পারেন, আমি ত বুঝ্তে পারি নে? তাঁকে সমস্ত খুলে বলেছেন কি? আর এত দূরেই বা তিনি কেমন ক'রে মত দিলেন?

নরেন হাসি মুখে বলিল, দাঁড়ান, দাঁড়ান! এখনও কাউকে সমস্ত কথা বলা হয় নি বটে; কিন্তু—

কথাটা শেষ করিতে দিবার ধৈর্য্যও বিজয়ার রহিল না। সে মাঝখানেই একেবারে আগুন হইয়া বলিয়া উঠিল, সে কোন্মতেই হ'তে পারে না। আপনারা কি আমাদের বাক্স-বিছানার সমান মনে করেন যে, ইচ্ছে থাক্ না থাক, দড়ি দিয়ে বেঁধে গাড়ীতে তুলে দিলেই সঙ্গে যেতে হবে? সে কিছুতেই হবে না। তাঁর অমতে কোন মতেই তাঁকে তত দূরে নিয়ে যেতে পার্বেন না।

নরেনের মুখ মলিন হইয়া গেল। বিহ্বলের ন্যায় কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে থাকিয়া বলিল, ব্যাপারটা কি আমাকে বুঝিয়ে বলুন ত? এখানে আস্বার পূর্ব্বেই দয়ালবাবুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল; তিনিও শুনে, হঠাৎ চম্‌কে উঠে, এই রকম কি একটা আপত্তি তুল্লেন, আমি বুঝতেই পার্লুম না। এত লোকের মধ্যে নলিনীর মতামতের উপরেই বা আমার যাওয়া না-যাওয়া কেন নির্ভর করে, আর তিনিই বা কিসের জন্যে বাধা দেবেন—এ সব যে ক্রমেই হেঁয়ালি হয়ে উঠেছে। কথাটা কি আমাকে খুলে বলুন দেখি?

বিজয়া স্থির-দৃষ্টিতে ক্ষণকাল তাঁহার মুখের প্রতি চাহিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে কহিল, তাঁর সঙ্গে একটা বিবাহের প্রস্তাব কি আপনি করেন নি?

নরেন একেবারে যেন আকাশ হইতে পড়িল। কহিল, না, কোন দিন নয়!

বিজয়ার মুখের উপর সহসা এক ঝলক রক্ত ছুটিয়া আসিয়া সমস্ত মুখ আরক্ত করিয়া দিল। কিন্তু চক্ষের পলকে আপনাকে সংবরণ করিয়া

কহিল, না করলেও কি করা উচিত ছিল না? আপনার মনোভাব ত কারও কাছে গোপন নেই!

নরেন অনেকক্ষণ স্তম্ভিতের মত বসিয়া থাকিয়া বলিল, এ অনিষ্ট কার দ্বারা হয়েছে, আমি তাই শুধু ভাবছি। তাঁর নিজের দ্বারা কদাচ ঘটে নি কেন না; তিনি প্রথম থেকেই জেনেছিলেন—এ অসম্ভব। কিন্তু—

বিজয়া জিজ্ঞাসা করিল, অসম্ভব কেন?

নরেন কহিল, সে থাক্! তবে একটা কারণ এই যে, আমি হিন্দু এবং তিনি ব্রাহ্মসমাজের। তা ছাড়া, আমাদের জাতও এক নয়।

বিজয়া মলিন হইয়া কহিল, আপনি কি জাত মানেন?

নরেন কহিল, মানি বই কি। হিন্দুসমাজে যে জাতিভেদ আছে একের সঙ্গে অপরের বিবাহ হয় না—এ কি আপনিও মানেন না?

বিজয়া কহিল, মানি, কিন্তু ভাল ব'লে মানি নে। আপনি শিক্ষিত হয়ে একে ভাল ব'লে মানেন কি করে?

নরেন হাসিতে লাগিল। কহিল, ডাক্তারের বুদ্ধিটা সাধারণতঃ একটু ঘোলাটে ধরণের হয়। বিশেষ ক'রে, আমার মত যারা মাইক্রস্কোপের মধ্যে দিয়ে জীবাণুর মত তুচ্ছ জিনিস নিয়েই কাল কাটায়। তাই এ ক্ষেত্রে আমাকে না হয় মাপ করেই নিন্ না।

বিজয়া বুঝিল, নরেন জাতিভেদের ভাল-মন্দর প্রশ্নটা কৌশলে এড়াইয়া গেল, তাই হৃষ্ট-মুখে কহিল, আচ্ছা, অন্য জাতের কথা থাক। কিন্তু জাত যেখানে এক, সেখানেও কি শুধু আলাদা ধর্ম্ম-মতের জন্যই বিবাহ অসম্ভব বল্‌তে চান? আপনি কিসের হিন্দু? আপনি ত একঘরে। আপনার কাছেও কি কোন ব্রাহ্মকুমারী বিবাহযোগ্যা নয় মনে করেন? এত অহঙ্কার আপনার কিসের জন্যে? আর এই যদি সত্যিকার মত, তবে সে কথা গোড়াতেই ব'লে দেন নি কেন?

বলিতে বলিতেই তাহার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া গেল, এবং তাহাই লুকাইবার জন্য সে তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইয়া লইল। কিন্তু নরেনের দৃষ্টিকে একেবারে ফাঁকি দিতে পারিল না। সে কিছু আশ্চর্য্য হইয়াই কহিল, কিন্তু এখন যা বল্‌চেন, এ ত আমার মত নয়।

বিজয়া মুখ না ফিরিয়াই অবরুদ্ধ-কণ্ঠে বলিল, নিশ্চয় এই আপনার সত্যিকার মত।

নরেন কহিল, না। আমাকে পরীক্ষা কর্‌লে টের পেতেন, এ আমার সত্যিকার কেন, মিথ্যেকার মতও নয়। তা ছাড়া নলিনীর কথা নিয়ে আপনি মিথ্যে কেন কষ্ট পাচ্ছেন? আমি জানি তাঁর মন কোথায় বাঁধা আছে; এবং আমিও যে কেন পৃথিবীর আর এক প্রান্তে পালাচ্ছি, সে তিনিও ঠিক বুঝবেন। সুতরাং আমার যাওয়া নিয়ে আপনি নিরর্থক উদ্বিগ্ন হবেন না।

বিজয়া বিদ্যুদ্বেগে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, তাঁর অমত না হলেই আপনি যেখানে খুসি যেতে পারেন, মনে করেন?

নরেনের বুকের মধ্যে কথাগুলা তড়িৎ-রেখার ন্যায় শিহরিয়া উঠিল; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টিও গিয়া টেবিলের উপর সেই লাল রঙের নিমন্ত্রণ-পত্রের উপর পড়িল। সে এক মুহূর্ত্ত স্থির থাকিয়া আস্তে আস্তে বলিল, সে ঠিক, আমি আপনার অমতেও কিছু কর্‌তে পারি নে। কিন্তু আপনি ত আমার সমস্ত কথাই জানেন। আমার জীবনের সাধও আপনার অজ্ঞাত নেই। বিদেশে সে সাধ হয় ত এক দিন পূর্ণ হতেও পারে; কিন্তু এ দেশে এত বড় নিষ্কর্ম্মা দীন-দরিদ্রের থাকা না থাকায় কিছুই ক্ষতি-বৃদ্ধি হবে না। আমাকে যেতে বাধা দেবেন না।

বিজয়া আনত-মুখে ক্ষণকাল নির্ব্বাক থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিল, আপনি দীন-দরিদ্র ত নয়। আপনার সমস্তই আছে, ইচ্ছে কর্‌লেই ত সমস্ত ফিরে নিতে পারেন।

নরেন কহিল, ইচ্ছে কর্‌লেই পারি নে বটে, কিন্তু আপনি যে দিতে চেয়েছিলেন, সে আমার মনে আছে, এবং চিরদিন মনে থাক্‌বে। কিন্তু দেখুন, নেবারও একটা অধিকার থাকা চাই—সে অধিকার আমার নেই।

বিজয়া তেম্‌নি অধোমুখে থাকিয়াই প্রত্যুত্তর করিল, আছে বৈ কি! বিষয় আমার নয়, বাবার। নইলে সেদিন তাঁর যথাসর্ব্বস্ব দাবির কথা আপনি পরিহাসচ্ছলেও মুখে আন্‌তে পার্‌তেন না! আমি হ'লে কিন্তু ঐখানেই থামতুম না। তিনি যা দিয়ে গেছেন, সমস্ত জোর ক'রে দখল কর্‌তুম, তার এক তিল ছেড়ে দিতুম না।

নরেন কোন কথা কহিল না। বিজয়াও আর কিছু না বলিয়া নত-নেত্রে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। মিনিট-দুই এম্‌নি নীরবে কাটিবার পরে অকস্মাৎ একটা গভীর দীর্ঘশ্বাসের শব্দে চকিত হইয়া বিজয়া মুখ তুলিতেই দেখিতে পাইল, নরেনের সমস্ত চেহারাটা যেন কি এক রকম হইয়া গিয়াছে। দুজনের চোখোচোখি হইবামাত্রই সে হঠাৎ বলিয়া উঠিল, নলিনী ঠিকই বুঝেছিল বিজয়া, কিন্তু আমি বিশ্বাস করি নি। আমার মত একটা অকেজো অপদার্থ লোককেও যে কারও কোন প্রয়োজন হ'তে পারে, এ আমি অসম্ভব ব'লে হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু সত্যিই যদি এই অসঙ্গত খেয়াল তোমার হয়েছিল, শুধু একবার হুকুম কর নি কেন? আমার পক্ষে এর স্বপ্ন দেখাও যে পাগ্‌লামি বিজয়া!

আজ এতদিন পরে তাহার মুখে নিজের নাম শুনিয়া বিজয়ার আপাদ-মস্তক কাঁপিয়া উঠিল; সে মুখের উপর সজোরে আঁচল চাপিয়া ধরিয়া উচ্ছ্বসিত রোদন সংবরণ করিতে লাগিল।

নরেন পিছনে পদশব্দ শুনিয়া মুখ ফিরাইয়া দেখিল, দয়াল ঘরে প্রবেশ করিতেছেন।

দয়াল দ্বারের উপরে দাঁড়াইয়া এক মুহূর্ত্ত নিঃশব্দে উভয়ের প্রতি দৃষ্টি-

পাত করিলেন ; তার পর ধীরে ধীরে বিজয়ার কাছে গিয়া তাহার সোফার একান্তে বসিয়া মাথার উপর ডান হাতটা রাখিয়া স্নিগ্ধ-কণ্ঠে ডাকিলেন, মা!

সে তাঁহার আগমন অনুভব করিয়াছিল, এবং প্রাণপণে এই লজ্জা-কর ক্রন্দন রোধ করিবার চেষ্টা করিতেছিল ; কিন্তু এই করুণ সুরে মাতৃ-সম্বোধনের ফল একেবারে বিপরীত হইল। কি জানি তাহার মৃত পিতাকে মনে পড়িয়াই ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল কি না—সে চক্ষের পলকে বৃদ্ধের দুই জানুর উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া ক্রোড়ের মধ্যে মুখ গুঁজিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

দয়ালের চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল। এ সংসারে একমাত্র তিনিই শুধু এই মর্ম্মান্তিক রোদনের আগাগোড়া ইতিহাসটা জানিতেন। মাথার উপর ধীরে ধীরে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিতে লাগিলেন, শুধু আমার দোষেই এই ভয়ানক অন্যায় হ'ল মা—শুধু আমি এই দুর্ঘটনা ঘটালুম। নলিনীর সঙ্গে এতক্ষণ আমার এই কথাই হচ্ছিল—সে সমস্তই জান্‌ত। কিন্তু কে জান্‌ত, নরেন মনে মনে কেবল তোমাকেই—কিন্তু নির্ব্বোধ আমি সমস্ত ভুল বুঝে তোমাকে উল্টো খবর দিয়ে, শুধু এই দুঃখ ঘরে ডেকে আন্‌লাম! এখন বুঝি আর কোন প্রতীকার—

দেওয়ালের ঘড়িতে তিনটা বাজিয়া গেল। তিনজনেই স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। তাঁহার ক্রোড়ের মধ্যে বিজয়ার দুর্জ্জয় দুঃখের বেগ ক্রমশঃ প্রশমিত হইয়া আসিতেছে অনুভব করিয়া, দয়াল অনেকক্ষণ পরে আস্তে আস্তে তাহার পিঠের উপর হাত চাপড়াইতে চাপড়াইতে বলিলেন, এর কি আর কোন উপায় হ'তে পারে না মা?

বিজয়া তেমনি মুখ লুকাইয়া রাখিয়াই ভগ্ন-কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, না—না, মরণ ছাড়া আর আমার কোন পথ নেই।

দয়াল কহিতে গেলেন, ছি মা, কিন্তু—

বিজয়া প্রবলবেগে মাথা নাড়িতে নাড়িতে কহিল, না—না এর মধ্যে আর কোন কিন্তু নেই। আমি কথা দিয়েছি—বেঁচে থাকতে সে আমি ভাঙতে পারব না দয়ালবাবু! মর্‌তে না পারলে আমি— বলিতে বলিতেই আবার তাহার কণ্ঠ-রোধ হইয়া গেল। দয়ালের গলা দিয়াও আর কথা বাহির হইল না। তিনি নীরবে ধীরে ধীরে তাহার চুলের মধ্যে হাত বুলাইতে লাগিলেন।

পরেশের মা বাহির হইতে ছেলেকে দিয়া বলাইল, মাঠান্‌, বেলা তিনটে বেজে গেল যে!

সংবাদ শুনিয়া দয়াল অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন; এবং স্নানাহারের জন্য নির্ব্বন্ধের সহিত পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিয়া তাহার মুখখানি তুলিয়া ধরিবার যত্ন করিতে লাগিলেন।

পরেশ পুনরায় কহিল, তোমার জন্যে যে কেউ খেতে পার্‌ছি নে মাঠান।

তখন চোখ মুছিয়া উঠিয়া বসিল, এবং কাহারও প্রতি দৃষ্টিপাতমাত্র না করিয়া ধীর-পদে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

দয়াল কহিলেন, নরেন, তোমারও ত এখনো নাওয়া খাওয়া হয় নি?

নরেন অন্যমনস্ক হইয়া কি ভাবিতেছিল, মুখ তুলিয়া কহিল, না।

তবে আমার সঙ্গে বাড়ি চল।

চলুন, বলিয়া সে দ্বিরুক্তি না করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং দয়ালের সঙ্গে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ

সেইদিন সন্ধ্যা-বেলায় আসন্ন বিবাহোৎসব উপলক্ষে কয়েকটা প্রয়োজনীয় কথাবার্ত্তার পরে পিতা-পুত্র রাসবিহারী ও বিলাসবিহারী প্রস্থান করিল, বিজয়া তাহার পড়িবার ঘরে প্রবেশ করিয়া আশ্চর্য্য হইয়া

গেল। দয়াল এম্‌নি তন্ময় হইয়া বসিয়াছিলেন যে কাহারও আগমন লক্ষ্য করিলেন না, তিনি কখন আসিয়াছেন, কতক্ষণ বসিয়া আছেন, বিজয়া জানিত না। কিন্তু তাঁহার সেই তদ্গতভাব দেখিয়া ধ্যান ভাঙিয়া কৌতূহল নিবৃত্তি করিতে তাহার প্রবৃত্তি হইল না; সে যেমন আসিয়াছিল, তেমনি নিঃশব্দে চলিয়া গেল। কিন্তু প্রায় ঘণ্টা-খানেক পরে ফিরিয়া আসিয়াও যখন দেখিতে পাইল, তিনি একই ভাবে বসিয়া আছেন, তখন ধীরে ধীরে সম্মুখে আসিয়া দাড়াইল।

দয়াল চকিত হইয়া কহিলেন, তোমার জন্যেই অপেক্ষা কর্‌ছি মা।

বিজয়া স্নিগ্ধ-কণ্ঠে বলিল, তা হ'লে ডাকেন নি কেন?

দয়াল কহিলেন, তোমরা কথা কইছিলে বলে আর বিরক্ত করি নি। কাল দুপুর-বেলা আমার ওখানে তোমার নিমন্ত্রণ রইল মা। না মা, না, সে কিছুতেই হবে না। পাছে 'না' বলে বিদায় কর, সেই ভয়ে এই পথ হেঁটে আবার নিজে এসেছি। কিন্তু দুপুর রোদে হেঁটে যেতে পার্‌বে না ব'লে দিচ্ছি; আমি পাল্‌কি-বেহারা ঠিক ক'রে রেখেছি, তারা এসে তোমাকে ঠিক সময়ে নিয়ে যাবে।

বৃদ্ধের সকরুণ কথায় বিজয়ার চোখ ছল্ ছল্ করিয়া আসিল; কহিল, একটা চিঠি লিখে পাঠালেও আমি 'না' বলতুম না। কেন অনর্থক আবার নিজে হেঁটে এলেন?

দয়াল উঠিয়া আসিয়া বিজয়ার একটা হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিলেন, মনে থাকে যেন, বুড়ো ছেলেকে কথা দিচ্ছ মা। না গেলে আবার আমাকে ছুটে আস্‌তে হবে—কোন মতেই ছাড়ব না।

বিজয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিল, আচ্ছা।

কিন্তু এই আগ্রহাতিশয্যে সে মনে মনে বিস্মিত হইল। একে ত ইতিপূর্ব্বে কোনদিনই তিনি নিমন্ত্রণ করেন নাই। তাহাতে সান্ধ্য-

ভোজনের পরিবর্ত্তে এই মধ্যাহ্ন-ভোজনের ব্যবস্থা, এবং প্রতিশ্রুতি-পালনের জন্য এইরূপ বারংবার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ, কেমন যেন ঠিক সহজ এবং সাধারণ নয় বলিয়াই তাহার সন্দেহ হইল। আজ দুপুর-বেলাও যে এই অকারণ নিমন্ত্রণের সঙ্কল্প তাঁহার মনের মধ্যে ছিল না, তাহা নিশ্চিত; অথচ ইহারই মধ্যে যান-বাহনের বন্দোবস্ত পর্য্যন্ত করিয়া আসিতে তিনি অবহেলা করেন নাই।

মনের অস্বস্তি গোপন করিয়া বিজয়া ঈষৎ হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কারণটা কি, শুন্‌তে পাই নে?

দয়াল লেশমাত্র ইতস্ততঃ না করিয়া উত্তর দিলেন, না মা, সেটি তোমাকে পূর্ব্বাহ্ণে জানাতে পারব না।

বিজয়া কহিল, তা না বলেন, নিমন্ত্রিতদের নাম বলুন?

দয়াল কহিলেন, তুমি ত সবাইকে চিন্‌বে না মা। তাঁরা আমার ঐ পাড়ার বন্ধু। যাঁদের চিন্‌বে, তাঁদের একজনের নাম রাসবিহারী অপরের নাম নরেন।

দয়াল চলিয়া গেলে বিজয়া বহুক্ষণ পর্য্যন্ত স্থির হইয়া বসিয়া মনে মনে ইহার হেতু অনুসন্ধান করিতে লাগিল; কিন্তু যতই ভাবিতে লাগিল, কি একটা অশুভ সংশয়ে মনের অন্ধকার নিরন্তর বাড়িয়াই চলিতে লাগিল।

কিন্তু পরদিন বেলা আড়াইটা পর্য্যন্ত যখন পালকি আসিয়া পৌছিল না, বিজয়া প্রস্তুত হইয়া অপেক্ষা করিয়া রহিল, তখন একদিকে যেমন বিস্ময়ের অবধি রহিল না, অপর দিকে তেমনি একটা আরাম বোধ করিতে লাগিল। পরেশের মা সঙ্গে যাইবে, এইরূপ একটা কথা ছিল। সে বোধ করি এইবার লইয়া দশবার আসিয়া কিছু খাইবার জন্য বিজয়াকে পীড়াপীড়ি করিল, এবং বুড়া দয়ালের ভীমরথী হইয়াছে কিনা, এবং নিমন্ত্রণের কথা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছে কি না, জিজ্ঞাসা করিল।

অথচ লোক পাঠাইয়া সংবাদ লইতেও বিজয়ার সঙ্কোচ বোধ হইতেছিল, কারণ সত্যই যদি কোন অচিন্ত্যনীয় কারণে তিনি নিমন্ত্রণ করিবার কথা বিস্মৃত হইয়া থাকেন ত তাঁহাকে অপরিসীম লজ্জায় ফেলা হইবে! এই অভূতপূর্ব্ব অবস্থাসঙ্কটের মধ্যে তাহার দ্বিধাগ্রস্ত মন কি করিবে, কিছুই যখন নিশ্চয় করিতে পারিতেছে না, এমন সময় পরেশ হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া খবর দিল পাল্‌কি আসিতেছে।

বিজয়া যখন যাত্রা করিল, তখন বেলা প্রায় অপরাহ্ণ। রাসবিহারী তাঁহার জন-মজুর লইয়া অতিশয় ব্যস্ত, তাড়াতাড়ি পাল্‌কির পার্শ্বে আসিয়া সহাস্যে বলিলেন, দয়ালের হঠাৎ এমন লোক খাওয়ানো ধূম পড়ে গেল কেন, সে ত জানি নে। সন্ধ্যার পরে আমাকেও যেতে হবে, বিশেষ ক'রে বলে গেছেন। কিন্তু পাল্‌কি পাঠাতে রাত্রি কর্‌লে, যেতে পার্‌বো না, সে কিন্তু ব'লে দিয়ো মা।

দয়ালের বাটীর দ্বারের উপর আম্র-পল্লবের সারি দেওয়া, উভয় পার্শ্বে জলপূর্ণ কলস—বিজয়া বিস্মিত হইল। ভিতরে পা দিতেই—দয়াল গ্রামস্থ জন-কয়েক ভদ্রলোকের সহিত আলাপ করিতেছিলেন—ছুটিয়া আসিয়া মা বলিয়া তাহার হাত ধরিলেন।

সিঁড়িতে উঠিতে উঠিতে বিজয়া রুষ্ট অভিমানের সুরে কহিল, ক্ষিদেয় আমার প্রাণ বেরিয়ে গেল, এই বুঝি আপনার মধ্যাহ্ন ভোজনের নেমন্তন্ন?

দয়াল স্নিগ্ধস্বরে বলিলেন, আজ যে তোমাদের খেতে নেই মা। নরেন ত নির্জ্জীব হয়ে শুয়েই পড়েছে। আজ একটা দিনের জন্যে অন্ততঃ কানা ভট্‌চায্যিমশায়ের শাসন মান্‌তেই হবে।

দ্বিতলের সম্মুখের হলে বিবাহের সমস্ত আয়োজন প্রস্তুত রহিয়াছে। এগুলো কি, ঠিক না বুঝিয়াও, বিজয়ার নিভৃত অন্তর কাঁপিয়া উঠিল—সে মুখ ফুটিয়া জিজ্ঞাসা করিতে পর্য্যন্ত সাহস করিল না।

দয়াল অত্যন্ত সহজভাবে বুঝাইয়া বলিলেন, সন্ধ্যার পরেই—আজ যে তোমার বিবাহ বিজয়া! ভাগ্যক্রমে দিন-ক্ষণ সমস্ত পাওয়া গেছে—না গেলেও আজই দিতে হ'ত, কিছুতেই অন্যথা করা যেত না; তা যাক্ সমস্তই ঠিকঠাক মিলে গেছে। তাই কানা ভট্‌চায্যিমশাই হেসে বল্‌লেন, এ যেন তোমাদের জন্যই পাঁজিতে আজকের দিনটি সৃষ্টি হয়েছিল।

বিজয়ার মুখ ফ্যাকাশে হইয়া গেল। কহিল, আপনি কি আমার হিন্দু-বিবাহ দেবেন?

দয়াল কহিলেন, হিন্দু-বিবাহ কি বিবাহ নয় মা? কিন্তু সাম্প্রদায়িক মত মানুষকে এম্‌নি বোকা করে আনে যে কাল সমস্ত বেলাটা ভেবে ভেবেও এই তুচ্ছ কথাটার কোন কূলকিনারা খুঁজে পাই নি, কিন্তু নলিনী আমাকে একটি মুহূর্ত্তে বুঝিয়ে দিলে। বল্‌লে, মামা, তাঁর বাবা তাঁকে যাঁর হাতে দিয়ে গেছেন, তোমরা তাঁর হাতেই তাঁকে দাও; নইলে ব্রাহ্ম বিবাহের ছল ক'রে যদি অপাত্রে দান কর, ত অধর্ম্মের সীমা থাকবে না। আর মনের মিলনই সত্যিকার বিবাহ। নইলে বিয়ের মন্তর বাঙলা হবে কি সংস্কৃত হবে, ভট্‌চায্যিমশাই পড়াবেন কিম্বা আচায্যিমশাই পড়াবেন তাতে কি আসে যায় মামা? এতবড় জটিল সমস্যাটা যেন একেবারে জল হয়ে গেল বিজয়া। মনে মনে বল্‌লুম, ভগবান! তোমার ত কিছু অগোচর নেই! এদের বিবাহ আমি যে কোন মতেই দিই না, তোমার কাছে যে অপরাধী হব না, সে নিশ্চয় জানি। তবুও বল্‌লুম, কিন্তু একটা কথা আছে যে নলিনী! বিজয়া যে তাঁদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন! তাঁরা যে তারই উপর নির্ভর ক'রে নিশ্চিন্ত হয়ে আছেন। এ সত্য ভাঙবে কি ক'রে?

নলিনী বল্‌লে, মামা, তুমি ত জান, বিজয়ার অন্তর্যামী কখনো সায় দেন নি। তাঁর চেয়ে কি বিজয়ার বলাটাই বড় হ'ল? তাঁর হৃদয়ের সত্যকে লঙ্ঘন ক'রে কি তার মুখের কথাটাকেই বড় ক'রে তুল্‌তে হবে?

আমি আশ্চর্য্য হয়ে বল্‌লুম, তুই এ সব শিখ্‌লি কোথায় মা ?

নলিনী বল্‌লে, আমি নরেনবাবুর কাছেই শিখেছি। তিনি বার বার বলেন, সত্যের স্থান বুকের মধ্যে মুখের মধ্যে নয়। কেবল মুখ দিয়ে বার হয়েছে বলেই কোন জিনিস কখনো সত্য হয়ে উঠে না। তবুও তাকেই যারা সকলের অগ্রে, সকলের উর্দ্ধে স্থাপন কর্‌তে চায় তারা সত্যকে ভাল-বাসে বলেই করে না, তারা সত্যভাষণের দম্ভকেই ভালবাসে ব'লে করে।

একটুখানি চুপ করিয়া বলিলেন, তুমি নরেনকে জান না মা, সে যে তোমাকে কত ভালবাসে, তাও হয় ত ঠিক জান না। সে এমন ছেলে যে, অসত্যের বোঝা তোমার মাথায় তুলে দিয়ে তোমাকে গ্রহণ কর্‌তে কিছুতে রাজী হ'তো না। একবার আগাগোড়া তার কাজগুলো মনে ক'রে দেখ দিকি বিজয়া।

বিজয়া কিছুই কহিল না। নিঃশব্দ নতমুখে কাঠের মত দাঁড়াইয়া রহিল।

নলিনী ভিতরে কাজে ব্যস্ত ছিল। খবর পাইয়া ছুটিয়া আসিয়া বিজয়াকে জড়াইয়া ধরিল। কানে কানে কহিল, তোমাকে সাজাবার ভার আজ নরেনবাবু আমাকে দিয়েছেন। চল। বলিয়া তাহাকে এক-প্রকার জোর করিয়া টানিয়া লইয়া গেল।

ঘণ্টা-দুই পরে তাহাকে ফুল ও চন্দনে সজ্জিত করিয়া নলিনী বধূর আসনে বসাইয়া সম্মুখের বড় জানালাটা খুলিয়া দিতেই, তাহার লজ্জিত মুখের উপর দক্ষিণের বাতাস এবং আকাশের জ্যোৎস্না যেন একই কালে তাহার স্বর্গগত মাতা-পিতার আশীর্ব্বাদের মত আসিয়া পড়িল।

যিনি সম্প্রদান করিতে বসিলেন, শোনা গেল, তিনি কোন্ এক সুদূর-সম্পর্কে বিজয়ার পিসি। একচক্ষু ভট্টাচার্য্যমশায় মন্ত্র পড়াইতে বসিয়া দাবি করিলেন, দুই-তিন পুরুষ পূর্ব্বে তাঁরাই ছিলেন জমিদার বাটীর কুল পুরোহিত।

বিবাহ-অনুষ্ঠান সমাধা হইয়া গিয়াছে—বর-বধূকে তুলিবার আয়োজন

হইতেছে, এমন সময়ে রাসবিহারী আসিয়া বিবাহ-সভায় উপস্থিত হইলেন। দয়াল উঠিয়া দাঁড়াইয়া সসম্মানে অভ্যর্থনা করিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিলেন, এস ভাই, এস। শুভকর্ম্ম নির্বিঘ্নে শেষ হ'য়ে গিয়েছে—আজকের দিনে আর মনের মধ্যে কোন গ্লানি রেখো না ভাই—এদের তুমি আশীর্ব্বাদ কর।

রাসবিহারী ক্ষণকাল স্তব্ধভাবে থাকিয়া সহজ গলায় কহিলেন, বনমালীর মেয়ের বিবাহটা কি শেষে হিঁদু মতেই দিলে দয়াল? আমাকে একটু জানালে ত এর প্রয়োজন হ'তো না।

দয়াল থতমত খাইয়া কহিল, সমস্ত বিবাহই ত এক ভাই।

রাসবিহারী কঠোর স্বরে কহিলেন, না। কিন্তু বনমালীর মেয়ে কি তার বাপের গ্রাম থেকে আজীবন নির্ব্বাসন-দুঃখও একবার ভেবে দেখ্‌লে না।

নলিনী পাশেই দাঁড়াইয়া ছিল—সে কহিল, তাঁর মেয়ে তার স্বর্গীয় পিতার সত্যিকার আজ্ঞাটাই পালন করেছে, অনুষ্ঠানের কথা ভাব্‌বার সময় পায় নি। আপনি নিজেও ত বনমালীবাবুর যথার্থ ইচ্ছাটা জান্‌তেন। তাতে ত ত্রুটি হয় নি।

রাসবিহারী এই দুর্ম্মুখ মেয়েটার প্রতি একটা ক্রূর দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া শুধু বলিলেন, হুঁ। বলিয়া ফিরিতে উদ্যত হইতেছেন—নলিনী আবদারের সুরে কহিল, বাঃ—আপনি বুঝি বিয়ে-বাড়ি থেকে শুধু শুধু চ'লে যাবেন? সে হবে না, আপনাকে খেয়ে যেতে হবে! আমি মামাকে দিয়ে কত কষ্ট ক'রে আপনাকে নেমন্তন্ন ক'রে আনিয়েছি।

রাসবিহারী কথা কহিলেন না, শুধু আর একটা অগ্নিদৃষ্টি তাহার প্রতি নিক্ষেপ করিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেলেন।

সম্পূর্ণ

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর পক্ষে
প্রকাশক ও মুদ্রাকর—শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য, ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্‌,
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬